CC-0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবালানন্দ গল্পমালিকা

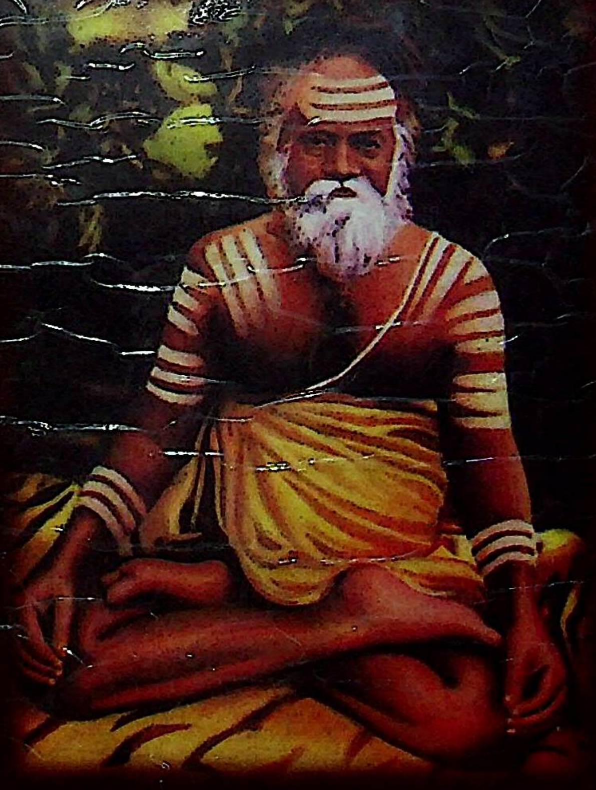

গোরা মুখোপাধ্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

3.3

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবালানন্দ গল্পমালিকা

সঙ্কলক

গোরা মুখোপাধ্যায়

প্রাচী পাব্‌লিকেশনস্‌

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Sri Balananda Galpamalika
Sankalok *by* : *Gora Mukhapadhya, Rs. 100.00*

প্রথম প্রকাশ ঃ
প্রথম প্রাচী সংস্করণ
গুরুপূর্ণিমা ২০০২
তৃতীয় সংস্করণ ঃ গুরুপূর্ণিমা ২০০৮

প্রকাশক ঃ
জয়দীপ রায় চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি, ন্যাশনাল প্রেস, বাকসাড়া, হাওড়া-৭১১১১০
দূরভাষ ঃ ৯৩৩৯১০৮০২৪

প্রচ্ছদ ঃ
অজয় ঘোষ

মূল্য ঃ ১০০ টাকা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শৈব্যা বুকস্ এণ্ড লেজার
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭৩
ও
প্রদ্যুৎ সাহা
৭/এইচ, কামারডাঙ্গা রোড
কলকাতা - ৪৬

মুদ্রণ ঃ
মহালক্ষ্মী অফসেট
১০/৪, শ্রীমাণি পাড়া লেন, কলকাতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাক্‌-কথন

"ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদের সব গভীর তত্ত্ব যেদিন থেকে পুরাণ ইতিহাসের খাত বেয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত জনমানসের মধ্যে ছড়িয়ে গেল ও তাদের চিত্তক্ষেত্রকে শ্যামল সজীব উর্বর করে তুলল, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অগণিত সাধু-মহাজন সেই ধারাটিরই অনুবর্তন করে চলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এর সর্বাধুনিক দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ। কিন্তু এসব গল্পকাহিনীর উৎস কোথায়? আমার ধারণা সাধুসন্তদের মুখে মুখে এইসব কাহিনী ফিরত ও তাঁরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন বলে এগুলি অনায়াসে ছড়িয়ে যেত। তাই এর কোনো লেখক বা উদ্ভাবক খুঁজে পাওয়া যাবে না বা এই গল্পটি এই সাধুরই নিজস্ব বলে চিহ্নতও করা যাবে না। গবেষণা করলে কোনো পুরাণাদিতে কোথাও এদের কোনোটির আদিরূপ হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, আবার কোনো কাহিনীর কোনো হদিশই হয়তো কোথাও মিলবে না।" *

আবহমান কাল থেকে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণশীল সাধু-সন্ন্যাসীর মুখে মুখে এই জাতীয় গল্পগুলি যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। সহজ সরল গল্পের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের কাছে বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব পৌঁছে দেওয়াই শুধু নয়, সৎভাবে জীবনযাপনের নানা উপায়ের কথাও যেমন এইসব গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায়ও অনেক গল্পের উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ শৈশবেই জন্মভূমি উজ্জয়িনী ত্যাগ করে অমৃতপথের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং সুদূর গঙ্গোনাথে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের চরণপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই যে তিনি পর্যটনে বেরুলেন, তারপর থেকে বৃদ্ধ বয়সে বৈদ্যনাথ-দেওঘরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সেই অনলস পর্যটন থেমে থাকেনি। বার বার তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম এমন কোন তীর্থ নেই যেখানে তিনি যাননি। বহুবর্ষব্যাপী এই পর্যটনের সময় অসংখ্য সাধু-

* ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়—'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ১৮।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সজ্জনের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন এবং এইভাবে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত এই বিচিত্র গল্পধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর শতাধিক বর্ষব্যাপী জীবনে শিষ্য ও ভক্তদের কাছে এইসব গল্পের সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে গিয়েছেন। জনমানসে প্রবাহিত এই গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে তিনি নিজে যা-কিছু দেখেছেন সেইসব কাহিনীও তিনি বর্ণনা করেছেন ভক্তদের কাছে এবং প্রতিটি ঘটনার মধ্যে থেকেই লোকশিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করে উপদেশচ্ছলে তা অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। জীবন থেকে নেওয়া এইসব কাহিনীও তাই এত হৃদ্য, এত উপাদেয় হয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করত। আজও তা পাঠকদের তেমনি মুগ্ধ করে এবং জীবনের পাথেয় জোগাবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। এখানে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত একশোটি গল্প সংকলন করে দেওয়া হল এবং প্রত্যেকটি গল্পের শিক্ষামূলক তাৎপর্যও সংক্ষেপে যুক্ত করা হল।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আমাদের জীবনের সমস্ত মৌল সমস্যার উপর এইসব গল্পমালার মধ্য দিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে আমাদের কিভাবে আচরণ করা উচিত তারও অভ্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, আমরা ভাগ্য সম্বন্ধে সব সময়ই অনুযোগ-অভিযোগ করে থাকি অথচ ভাগ্যকে আমরা কেউই এড়াতেও পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি? দেখা যাবে কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষ যতই ভাগ্যকে বা দৈবদুর্বিপাককে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করুক, পাকে-প্রকারে তাকে সেই বিপাকে পড়তেই হয়। অনেক সময় এড়াবার চেষ্টাই ঘটনাচক্রে আমাদের সেই বিপাকের মধ্যেই আরও দ্রুত অনিবার্যভাবে যেন নিয়ে গিয়ে ফেলে। আমাদের কর্মবিধান যিনি রচনা করেছেন, তাঁর উপর যদি বিশ্বাস রাখতে পারি এবং তিনি মঙ্গলময় এই নিশ্চিত ধারণা যদি আঁকড়ে থাকতে পারি তাহলে জীবনে কখনও পথ হারাতে হয় না, হতাশ হতে হয় না। তিনি যখন যেখানে যেমন নিয়ে গিয়ে ফেলেন যে-কোন পরিস্থিতিতেই তাই তখন দিশেহারা হয়ে যাই না।

বারংবার তাই আমাদের সেই ঈশ্বর-বিশ্বাস এনে দেবার জন্যই এই গল্পমালিকার অবতারণা করতেন তিনি। যাতে অনায়াসে আমাদের মনের মধ্যে এই কথাগুলি একেবারে গেঁথে যায়। অনেক সময় সাধন-ভজন করতে করতে মানুষের নৈরাশ্য এসে যায়, তখন তাঁর সেই নট-নটীর কাহিনী আমাদের মনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়ে দেয় যে আমরা যেন তালভঙ্গ না করি, শেষ অবধি তাল বাজিয়ে যাই কারণ আমরা বুঝতে না পারলেও সিদ্ধি হয় তো আমাদের আসন্ন, সে-সময় সাধন থেকে বিরত হওয়ার মতো মুর্খতা আর নেই, আর একটু ধৈর্য ধরে তালটি যাতে না কাটে সেইভাবে সাধন করে যেতে হয়।

তেমনি দোষ-গুণে মেশানো এই জগতে আমরা যদি দোষ না দেখে কেবল গুণকেই আহরণ করতে সচেষ্ট হই, তাহলে জীবন মধুময় হয়ে যায়। পাহাড়ে নিজের প্রিয় শিষ্য পূর্ণানন্দকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি কিভাবে বিষাক্ত গাছের ফুলের উপর বসেও মৌমাছিকে মধু আহরণ করতে দেখে এই শিক্ষা লাভ করেন যে বিষের মধ্যেও মধু আছে এবং সর্বদা এই মধু আহরণেই নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হয়, তা গল্প ক'রে শোনাতেন এবং কেবই 'মধু-মক্ষিকা বন্ যাও।'

জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাই এই সব গল্পের ভিত্তি এবং সেই কারণেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত, জীবনবিচ্ছিন্ন নয়, নিছক কল্পনাপ্রসূত মনভুলানো গল্প নয়। বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তত্ত্বকথা বলতে বলতে অবলীলাক্রমে চলে যেতেন এই গল্পে, তত্ত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হিসাবে যেন তুলে ধরতেন জীবন থেকে তার প্রতিচ্ছবি। সেই হিসাবেই এগুলি এত হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য হয়ে উঠত। তিনি অবশ্য বলতেন ভাঙা হিন্দীতে, যেগুলি অবিকল তেমনিভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন তাঁরই কৃপাধন্যা শিষ্যা স্বর্গতা সরলাবালা মিত্র তাঁর 'কথা-প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে। এখানে সহজ বাংলায় সেগুলি নতুন ক'রে ঢেলে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন শিরোনামে, বাঙালী পাঠকদের অনায়াসবোধ্য করে তুলতে। আশাকরি এর ফলে অনেক নূতন করে আস্বাদ করতে পারবেন ব্রহ্মচারী মহারাজ কী অমৃত পরিবেশন করে গিয়েছেন উপদেশচ্ছলে এই অপরূপ গল্পমালায়।

এই সঙ্কলনের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বিশেষ প্রীতি হয়ে এর প্রকাশে তাঁর সানন্দ অনুমোদন জানিয়ে কৃতার্থ করেছেন। যে-আশ্রমে বসে দিনের পর দিন সদ্‌গুরু শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ অজস্র ধারায় এইসব গল্পমালিকার মাধ্যমে তাঁর উপদেশামৃত বর্ষণ করে গিয়েছেন, নিজের প্রথম গৃহী শিষ্য স্বর্গত রামচরণ বসুর নামাঙ্কিত তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যনাথ-দেওঘরের সেই রামনিবাস ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিভবানন্দ ব্রহ্মচারী এই অমূল্য গ্রন্থটির প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিখিল লোককল্যাণের এক মহান্ কর্তব্য পালন করলেন বলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকলেই তাঁর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। এঁদের সকলের উপর শ্রীভগবানের ও ব্রহ্মচারী মহারাজের মঙ্গলাশিষ নিয়ত বর্ষিত হোক্—এই প্রার্থনা।

গ্রন্থটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র 'ধ্যান-কুটীর' এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী দেবীর সেবায় ব্যয়িত হবে, এই আশায় সর্বস্বত্ব দেওঘর আশ্রমকে অর্পণ করলাম।

গোরা মুখোপাধ্যায়

কলকাতা
অক্ষয়-তৃতীয়া, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ
২৭/৪/৯০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচীপত্র

ভ্রমর ও গোবরে পোকা	১১
গুপ্তধনের সংকেত	১৩
শিষ্যের পরীক্ষা	১৫
শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ	১৭
রাজা মহারাজার কথা	১৮
মুক্তির পথ	১৯
জনক রাজার গুরু লাভ	২১
ভগবান ভক্তের অধীন	২৩
কিছু চেয়ো না, সব পাবে	২৬
যা চাও তা এখানেই পাবে	৩০
ব্যাসদেব, তাঁর দাস ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর	৩২
কিছুই সঙ্গে যাবে না	৩৪
সব ঠাকুরের, ঠাকুরটি আমার	৩৬
উল্‌টে যাও	৩৭
ধৈর্য ধরো, তালভঙ্গ যেন না হয়	৩৮
ভাগবতের পণ্ডিত	৪১
মারো মারো মারো	৪২
ভিখিরীর জমিদারি	৪৩
এপার-ওপার	৪৪
কুয়োর জল	৪৬
গর্ভাবস্থায় সংস্কার	৪৭
পূর্বজন্মের সংস্কার, না সঙ্গদোষ	৪৮
ভিখিরী-বাদশা ত্রিমটলিঙ্গ	৫১
অলক্ষ্মীর মর্যাদা	৫২
দ্বৈত ও অদ্বৈত	৫৫
রানীর প্রেম	৫৬
কে বড়? অন্ধ, না পঙ্গু	৫৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানীর অন্বেষণে	❑	৫৯
শুভস্য শীঘ্রম্	❑	৬১
রাবণ রাজার সংকল্প	❑	৬২
পাপের ভাগী	❑	৬৪
বিনা তারের টেলিগ্রাফ	❑	৬৫
যাকে দেবার, মালিকই দেন	❑	৬৬
বড়ো ব্যাঙ্কের পুঁজি	❑	৬৮
বণিকের পুত্রশোক	❑	৭০
সাধুর ফাঁসি	❑	৭২
রাজা জনমেজয়ের কুষ্ঠরোগ	❑	৭৫
কালের ছোবল	❑	৭৮
শবরীর উপাখ্যান	❑	৮২
নির্জনে পায়রা বধ	❑	৮৩
সবচেয়ে খারাপ জিনিস কী	❑	৮৪
নামেতে নামী মেলে	❑	৮৬
টিট্টিভ পাখির সমুদ্র শোষণ	❑	৮৯
লাল পাথর	❑	৯২
সাধুর পায়েস খাওয়া	❑	৯৩
নিষ্কাম ভক্তের সর্বস্ব হরণ	❑	৯৫
নিষ্কাম ভক্তের সর্বস্ব লাভ	❑	৯৭
সোনার কৌটো	❑	৯৮
ঈশ্বর মঙ্গলময়	❑	১০২
দুঃখের সার্থকতা	❑	১০৪
মহৎ লোকের স্বভাব	❑	১০৭
দুই বর এক বউ	❑	১০৮
নাছোড়বান্দা চাকর	❑	১০৯
মোহান্ধের মোহমুক্তি	❑	১১১
বিশ্বামিত্রের দম্ভ	❑	১১৬
চোরের রূপান্তর	❑	১১৮
অন্তিম চিন্তা	❑	১২১
মায়ার ফাঁদ	❑	১২৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হিসেবী সেপাই	❑	১২৮
যুক্তিতে মুক্তি	❑	১২৯
সাপ ও গরুড়	❑	১৩০
সেরা পছন্দ	❑	১৩১
সার কথা	❑	১৩২
অষ্টাবক্র ও ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর	❑	১৩৪
যবের বীজ	❑	১৩৭
বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ	❑	১৩৮
ভগবান দেন কোথা থেকে	❑	১৪০
সবচেয়ে মিষ্টি কোন্ জিনিস	❑	১৪২
কেন শোক?	❑	১৪৩
উপদেশের বিভিন্নতা	❑	১৪৬
সদ্গুরুর মাহাত্ম্য	❑	১৪৯
দুই পুতুল	❑	১৫০
নিষ্কাম ভক্তের নিঃশঙ্কতা	❑	১৫২
সুখ ও দুঃখের সহাবস্থান	❑	১৫৪
সংসারীর ভগবৎচিন্তা	❑	১৫৬
ব্যর্থ গুরুর সার্থক শিষ্য	❑	১৫৮
শিঙাপন্থী সাধু	❑	১৬০
ফোঁস করবে, কামড়াবে না	❑	১৬১
লোভের মুখে ছাই	❑	১৬২
লোভ জব্দ ত্যাগীর কাছে	❑	১৬৪
বন্দী সিংহ	❑	১৬৫
বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু	❑	১৬৮
কপাল ভাঙলে সব যায়	❑	১৭১
গ্রহের ফের	❑	১৭২
সাধু মহাত্মার কুষ্ঠব্যাধি	❑	১৭৩
জেলের বৈরাগ্য	❑	১৭৬
দাগী মণি	❑	১৭৭
সাধুসঙ্গে জীবনরক্ষা	❑	১৭৯
প্রাপ্তির তারতম্য	❑	১৮১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাজার দ্বীপান্তর	☐	১৮৩
ঘড়ার আত্মকথা	☐	১৮৪
ভক্তের বোঝা ভগবান ব'ন	☐	১৮৬
বাসা পাকড়াও	☐	১৯০
দান-প্রতিদান	☐	১৯১
বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ কথিত নিজ জীবনের কাহিনী ঃ		
পুতুল পূজো	☐	১৯৭
দুই মহারাজ—বালানন্দ ও যতীন্দ্রমোহন	☐	১৯৮
দুষ্টু ছেলে	☐	২০১
মধুকর হয়ে যাও	☐	২০৩
দেবতার অভিশাপ	☐	২০৪
বালানন্দজীর ইষ্টদর্শন	☐	২০৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভ্রমর ও গোবরে পোকা

ভ্রমর ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়, আর গোবরে পোকা পড়ে থাকে গোবরের মধ্যে। তবু একদিন দুজনে দেখা হয়ে গেল। গোবরে পোকার ইচ্ছে হল ভ্রমরের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব পাতাবে। তাই ভ্রমরকে ডেকে সে বলল ঃ "ভাই, তোমারও রং কালো, আমারও রং কালো। এসো ভাই তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব পাতাই।" ভ্রমর বলল ঃ "বেশ তো, এ তো ভালো কথা। কিন্তু ভাই, তুমি দিনরাত এই গোবরের মধ্যে, এই দুর্গন্ধের মধ্যে পড়ে থাকো কেন? এ কী আশ্চর্যের কথা! তোমারও তো পাখা আছে। এসো না আমরা দুই বন্ধু আকাশে উড়ে বেড়াই।" বন্ধুর কথা শুনে গোবরে পোকা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। তখন দুই বন্ধু মহা আনন্দে পাখা মেলে দিল।

বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমর একটি পদ্মের উপর এসে বসল। সেই পদ্মের সুগন্ধে গোবরে পোকা এমনই মশগুল হয়ে গেল যে তার আর পদ্মফুলকে ছেড়ে চলে যেতে মন চাইল না। সে তখন একেবারে পদ্মের কোরকের মধ্যে ঢুকে গেল। ভ্রমর তো বেশিক্ষণ একটি ফুলের উপর বসে থাকে না, তাই একটু পরেই সে আবার উড়ে চলে গেল। এমন সময় সূর্যদেব অস্ত গেলেন, পদ্মের দলগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল, আর গোবরে পোকাও সেইসঙ্গে পদ্মফুলের ভিতরে বন্দী হয়ে রইল।

পরদিন সকালবেলা এক ব্রাহ্মণ এলেন সেই সরোবরের তীরে। চমৎকার একটি পদ্মফুল ফুটে রয়েছে দেখে তিনি ভাবলেন ভগবান মহাদেবের পুজোয় ফুলটি নিবেদন করবেন। এই ভেবে ফুলটি তুলে নিয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন এবং পুজোয় বসে পদ্মটিকে তিনি মহাদেবের মাথায় স্থাপন করলেন। পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে বন্দী গোবরে পোকারও মহাদেবের মাথায় স্থান জুটে গেল। পরদিন সকালবেলা মহাদেবের সব নির্মাল্য ব্রাহ্মণ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এলেন। গঙ্গার স্রোতে সেগুলো ভেসে যেতে লাগল। পদ্মের সঙ্গে গোবরে পোকাও ভেসে চলল গঙ্গার জলে।

এদিকে ভ্রমর বন্ধুকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখতে পেল যে তার বন্ধু গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলেছে। ভ্রমর তখনই বন্ধুর কাছে নেমে এসে বলল : "বন্ধু, করো কী? শিগ্‌গীর উড়তে শুরু করো নইলে যে মারা পড়বে।" গোবরে পোকা তখন বন্ধুকে বলল : "ভাই, এখন আমাকে মরতেই দাও।" এই বলে সে ভ্রমরকে একটি দোঁহা শোনাল :

সঙ্গৎ গুণ অনেক ফল, শির মহেশকো বৈঠ।
হে মিত্র! মোয় জায় দে গঙ্গাজীকো পেট।।

এই দোঁহার মাধ্যমেই গোবরে পোকা তখন যেন বন্ধুর উদ্দেশে শেষ বিদায়বাণী জানিয়ে বলে গেল : "বন্ধু, সৎসঙ্গতে কত ফল মেলে দেখো। আমি তো সামান্য গোবরে পোকা, কিন্তু তোমার মতো মহতের সঙ্গ লাভ করে আজ আমি কী পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হলাম। স্বয়ং মহাদেবের মাথায় আমি স্থান পেয়েছি। তারপর যে-গঙ্গা সকল কলুষ নাশ করেন, সেই মুক্তিদায়িনী মা গঙ্গার কোলে এখন আমি আশ্রয় লাভ করেছি। ধন্য হয়েছে আমার জীবন। এ তোমারই সঙ্গগুণে আমার সামনে মুক্তির প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হয়েছে। আমি আজ সেই পথেই চললাম।"

☆ ☆ ☆

সৎসঙ্গের এমনই অসীম প্রভাব যে তা মাটির তুচ্ছ কীটকে পর্যন্ত দেবাদিদেব শংকরের মাথায় উঠিয়ে দেয় এবং সেই মহেশ্বরের মৌলি নিঃসৃত গঙ্গার ধারাতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে মুক্তি এনে দেয়। ভূচরকে তাই খেচরের সঙ্গে যোগসাধন করতে হবে। যাঁরা আকাশচারী, উর্দ্ধগমনকারী মধুসংগ্রাহক, সেই সব উচ্চচিন্তাশীল সৎপুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে শাস্ত্র তাই বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। দুর্গন্ধ ময়লামাটি ছেড়ে গোবরে পোকার মতো সংসারী জীব ভ্রমরের মতো দিব্য সুমিষ্ট সারসংগ্রহকারী মহাজনের সঙ্গ ও সাহচর্যে হৃদয় পদ্মের সন্ধান পায় এবং তার সৌরভে এমনই মজে যায় যে আর তা ছেড়ে উঠতে চায় না। সৎসঙ্গের প্রভাবে এইভাবেই মানুষ একদিন ভগবানের আশ্রয় লাভ করে এবং তার করুণার ধারায় ভেসে গিয়ে মুক্তিলাভে ধন্য হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুপ্তধনের সংকেত

অবস্থাপন্ন ঘরের এক ছেলে কুপথে গিয়ে বাপ-ঠাকুর্দার অগাধ সম্পত্তি সব নষ্ট করে দিল। শেষে তার খাবার জোটানো দায় হল, দেনার দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল আর পাওনাদারদের গঞ্জনা ও অত্যাচারে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বাঁচবার কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। এখন কী করবে, কেমন করে এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবে এই হল তার একমাত্র চিন্তা। তখন সে জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে লাগল ঃ "ভাই, কী করে আমি উদ্ধার পাব তোমরা বলে দাও।" নানান জনে নানারকম উপদেশ দিতে লাগল। কেউ বলল রোজগার করো, কেউ বলল ব্যাবসা করো, কেউ ঈশ্বরকে ডাকতে বলল, কেউ বা যোগ-ধ্যানের পরামর্শ দিল। কিন্তু কোন কথাটাই তার মনে ধরল না। একদিন তার মনে হল আমার বাপ-ঠাকুর্দা তো মস্ত ধনী ছিলেন, একবার তাঁদের খাতা-পত্রগুলো ভালো করে দেখতে হবে। খাতায় যদি দেখা যায় কারুর কাছে কিছু পাওনা আছে তাহলে সেই টাকাটা আদায় করে কিছুদিন খাওয়া-পরার কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

খাতাপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে সে দেখতে পেল এক জায়গায় লেখা রয়েছে ঃ "অমুক জায়গায় এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই শিবমন্দিরের চূড়ায় বহু ধন-রত্ন গাঁথা আছে। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিবা দ্বিপ্রহরে সেখানে খুঁড়লে সেই গুপ্তধন পাবে।" নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সে মন্দিরের চূড়া ভেঙে ফেলল। কোথায় কী? ধন-রত্নের চিহ্নমাত্র সেখানে মিলল না, যুবক ভাবতে লাগল বাপ-ঠাকুর্দা কি তবে মিথ্যাবাদী, নইলে খাতায় কেন লিখে রেখেছে মন্দিরের চূড়ায় ধন রত্ন আছে? গুপ্তধন তো মিললই না, অনর্থক মন্দিরটাও সে ভেঙে নষ্ট করল। এইসব ভাবতে ভাবতে দারুণ হতাশায় তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় এক সাধু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। যুবককে কাঁদতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বাছা, তুমি কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুবক বলল ঃ "সাধুবাবা, আমার বাপঠাকুর্দার খাতায় লেখা আছে যে এই মন্দিরের চূড়ায় গুপ্তধন গাঁথা আছে। তাই দেখে আমি মন্দিরের চূঁড়া ভাঙলাম, কিন্তু ধন-রত্ন কিছুই পেলাম না। বাবা, আমি বড়ো গরীব, অনেক দেনা করেছি, পাওনাদারদের লাথি-ঝাঁটা আর সহ্য করতে পারছিনে। কিসে আমার উদ্ধার হবে আপনি বলে দিন।"

সাধু বললেন ঃ "বাছা, তুমি কেঁদো না, গুপ্তধন তুমি ঠিকই পাবে। এখন তুমি তার সন্ধান পাওনি, তবে পরে সেই ধনলাভের কৌশল আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। যাই হোক, যা হবার তা হয়েছে। এখন তুমি এক কাজ করো দেখি। আমি তোমাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে যাচ্ছি। এই টাকায় মন্দিরের চূড়া যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি ভাবে তুমি গেঁথে তোলো। সময় হলে আবার আমার দেখা পাবে।" এই বলে সাধু চলে গেলেন।

বছর ঘুরে গেল। কার্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে দ্বিপ্রহরের সময় সাধু আবার এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। যুবককে দেখে তিনি বললেন ঃ "আচ্ছা বলো তো খাতায় ঠিক কি লেখা আছে? যুবক বলল ঃ খাতায় লেখা আছে 'শিবমন্দিরের চূড়ায় বহু ধন-রত্ন গাঁথা আছে। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিবা দ্বিপ্রহরে সেখানে খুঁড়লে সেই গুপ্তধন পাবে।" সাধু তখন হাসতে হাসতে বললেন ঃ "বৎস, খাতায় সবকিছু ঠিকই লেখা আছে। মাটিতে মন্দিরের চূড়ার ছায়া যেখানটায় পড়ছে, এখন সেই জায়গাটা তুমি খোঁড়ো দেখি।" সেখানকার মাটি খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্তধনের সন্ধান মিলে গেল।

☆ ☆ ☆

ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিরাই হলেন আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা। আমাদেরই কল্যাণের জন্য শাস্ত্ররূপী গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁরা আত্মধনের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেই শাস্ত্রের মর্ম বোঝা সহজসাধ্য নয়। একমাত্র সাধু-মহাত্মারাই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তাহলে আমাদের সদ্‌গুরু মিলে যায়। গুরু সেই শাস্ত্রের বাক্যই বলবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই শাস্ত্রবাক্যের মর্ম উপলব্ধির কৌশলটিও বলে দেবেন। শাস্ত্র হল সমুদ্র, গুরু হলেন সূর্য। সমুদ্রের জল নোনা বলে তা পান করা যায় না। সূর্য সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে নেয়, তারপর সেই জল যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরতে থাকে, তখনই তা সুস্বাদু হয় এবং তা পান করলে লোকের তৃষ্ণা মেটে। ঠিক তেমনিভাবে একমাত্র শ্রীগুরুর মুখ নিঃসৃত শাস্ত্রবাণীই ভক্তকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। শাস্ত্রও তাই 'গুরুবক্ত্র' বা শ্রীগুরুর মুখ থেকে উপদেশ শোনার জন্যে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন এমনই গুরুবাক্যের মহিমা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিষ্যের পরীক্ষা

এক গুরুর অনেক শিষ্য। গুরুর চিন্তা হল এত যে শিষ্য করলাম, এদের পাপ আর পুণ্যের বোঝা তো আমাকেই বহন করতে হবে। তাহলে তো আমার দুর্দশার অন্ত থাকবে না। তখন এক মহাত্মাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "প্রভু আমার এই যে এত শিষ্য-সামন্ত রয়েছে, এদের সকলের পাপ-পূণ্যের ভার কি আমার উপরেই পড়বে?" প্রশ্ন শুনে মহাপুরুষ হেসে বললেন : "ঠাকুরমশাই, এত যে শিষ্য বলছেন, এরা সবাই কি আপনার শিষ্য? তা হতেই পারে না। এই শিষ্যদের মধ্যে প্রকৃত শিষ্য আপনি এক আধজনের বেশি পাবেন না। আপনি আপনার শিষ্যদের পরীক্ষা করে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন প্রকৃত শিষ্য কে। তাদেরই পাপ আর পুণ্যের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে।"

একদিন গুরু শিষ্যদের বললেন : "আমার পায়ে এক ভয়ংকর বিষাক্ত ফোড়া হয়েছে, যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।" এই বলে গুরু বাপরে মারে বলে চীৎকার শুরু করে দিলেন। তাই দেখে শিষ্যরা অধীর হয়ে বলতে লাগল : "গুরুদেব, আপনি বলুন কিসে আপনার এই দারুণ ফোড়া সারবে, আমরা সাধ্যমত তার চেষ্টা করব।" গুরু বললেন : "এ বিষাক্ত ফোড়া তো সারবার নয়, তবে কেউ যদি মুখ দিয়ে ফোড়াটা চুষে নিতে পারে তাহলেই এটা সারবে। কিন্তু যে চুষবে তার মৃত্যু অবধারিত।"

একথা শুনেই তো শিষ্যদের মুখ শুকিয়ে গেল। তখন কেউ বলল : "বাবা, ঘরে আমার ছোটছাটো ছেলেমেয়ে রয়েছে, আমি মরলে ওরা না খেতে পেয়ে মরবে।" কেউ বলল : "আমার স্ত্রী রয়েছে, তাকে কে দেখবে?" কেউবা বলল : "আমি মরে গেলে আমার বুড়ো মায়ের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কে করবে?"

গুরু তাঁর গরু চরাবার জন্যে এক রাখালকে রেখেছিলেন। গুরুর অসুখের কথা শুনে রাখাল কাঁদতে কাঁদতে সকলকে কেবল বলতে লাগল : "আমাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একবার গুরুদেবের কাছে যেতে দাও।" শিষ্যরা তাকে ধমক দিয়ে উঠল। "আরে, তুই কি পাগল হলি নাকি। দেখছিস না গুরুদেব অসুস্থ, আর তুই কিনা তাঁর কাছে যেতে চাস? কী করবি তুই ওখানে গিয়ে? ওসব এখন হবে টবে না। দূর হ এখান থেকে।" রাখাল আর কী করে, কাঁদতে কাঁদতে দূর থেকেই 'গুরুদেব গুরুদেব' বলে চীৎকার করতে লাগল। গুরু তখন তাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কী হয়েছে রে? তুই কাঁদছিস কেন?" রাখাল বলল ঃ "আপনার এত কষ্ট আমি সইতে পারছিনে। আপনি অনুমতি দিন। ঐ ফোড়া আমি চুষব।" গুরু বললেন ঃ "না না, সে কি কথা! ঐ ফোড়া চুষলে তুই যে মরে যাবি।" রাখাল কোনো কথা শুনবে না, সে বলল ঃ "আপনার জন্যে প্রাণ দেওয়া যে পরম সৌভাগ্য গুরুদেব। আমার প্রাণ যায় যাক তাতে ক্ষতি নেই, আপনি তো ভালো হয়ে যাবেন।" এই বলে রাখাল ফোড়ার উপর থেকে কাপড় সরাতে গেল। গুরু তাতে বাধা দিয়ে বললেন ঃ "কাপড় সরাবার দরকার নেই, তুই কাপড়ের উপরেই কামড়ে ফোড়া চুষে নে।" গুরুর কথামতো রাখাল তাই করল আর ফোড়া চুষতে চুষতে বলল ঃ "গুরুদেব আপনার ফোড়ার পুঁজ কী মিষ্টি।" গুরু বললেন ঃ "আরে ঐটাই তো বিষ, তুই যে এখনি মরবি।"

আসলে গুরুর তো ফোড়া হয়নি, শিষ্যদের পরীক্ষা করবার জন্য পায়ে একটা পাকা আম তিনি বেঁধে রেখেছিলেন। রাখাল ঐ আমটিই চুষে খেয়ে নিল। গুরু তখন বুঝতে পারলেন যে রাখালই হল তাঁর একমাত্র প্রকৃত শিষ্য। শুধু এরই পাপ-পুণ্যের ভার তাঁকে বহন করতে হবে। আর এইযে সব বড়ো বড়ো মানুষ তাঁর শিষ্য বলে বড়াই করে, এরা শুধু নামেই তাঁর শিষ্য, প্রকৃত শিষ্য নয়।

☆ ☆ ☆

মন্ত্র অনেকেই নেয়, কিন্তু মন্ত্র নিলেই শিষ্য হওয়া যায় না। প্রকৃত শিষ্য সদ্‌গুরুকে দেবতার আসনে বসায়, তাঁর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করে, তাঁর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, এমনকি তাঁর জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাই বলা হয় ঃ 'গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক।' প্রকৃত শিষ্য বড়োই দুর্লভ, যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দেয় গুরুর চরণে, তাঁরই সেবায় দেহ-মন-প্রাণ সবকিছু উৎসর্গ করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ

এক ব্যবসায়ী অনেক লোহা কিনে রেখেছিল, কিন্তু লোহার দাম হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় সে তা বিক্রি করতে পারল না। ঠিক সেই সময় কোনো কাজে তাকে একবার বিদেশ যেতে হল। যাবার আগে সে তার সমস্ত লোহা এক বন্ধুর কাছে রেখে দিয়ে বলল ঃ "ভাই, এগুলো এখন তোমার কাছে থাক, আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব।"

ব্যবসায়ী যখন বিদেশে, সেই সময় লোহার দাম খুব বেড়ে গেল আর সেই বন্ধুটি সুযোগ বুঝে সব লোহা বিক্রি করে দিল। বিদেশ থেকে ফিরে এসে ব্যবসায়ী যখন বন্ধুর কাছ থেকে লোহা ফেরত চাইল তখন্ বন্ধু তাকে বলল ঃ "ভাই, সে লোহা তো নেই, সব ঘুণে খেয়ে ফেলেছে।" বন্ধুর কারসাজি বুঝতে ব্যবসায়ীর আর বাকি রইল না, সে তখন রাজার কাছে গিয়ে বন্ধুর নামে নালিশ করল। রাজা বন্ধুকে ডাকিয়ে বলল ঃ "তুমি এর লোহা ফেরত দিচ্ছ না কেন?" বন্ধু বলল ঃ "রাজা, এর লোহা আমার কাছেই ছিল, কিন্তু কী করব বলুন, সমস্ত লোহা ঘুণে খেয়ে ফেলেছে।" সে দেশের রাজা ছিল ভিল, বুদ্ধি ছিল তার ভোঁতা। ঘুণে লোহা খেয়েছে এটা সে সহজেই বিশ্বাস করে নিল। তাই রাজার বিচারে বন্ধুর কোন শাস্তি হল না।

এদিকে ব্যবসায়ী তার বন্ধুকে শায়েস্তা করবার উপায় খুঁজতে লাগল। একদিন সে দেখতে পেল বন্ধুর বাড়ির দরজার সামনে তার পাঁচ বছরের ছেলে খেলা করছে। সে তখন ছেলেটিকে ধরে এনে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখল যাতে কেউ তার খোঁজ না পায়। এদিকে বন্ধুর বাড়িতে তখন হইচই পড়ে গিয়েছে, ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ধুর সন্দেহ হল ব্যবসায়ীই তার ছেলেকে কোথাও আটকে রেখেছে। সে তখন রাজার কাছে ব্যবসায়ীর নামে নালিশ জানাল।

ব্যবসায়ীর ডাক পড়ল রাজার দরবারে। রাজা জিজ্ঞাসা করল ঃ "এর ছেলেকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ?" ব্যবসায়ী বলল ঃ "না রাজা, আমি কেন তাকে লুকিয়ে রাখব? তবে আমি দেখেছি একটা চিল ছোঁ মেরে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল।" এই কথা শুনে রাজা বলল ঃ "তা কী করে হয়? চিল আবার ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে নাকি?" তখন ব্যবসায়ী বললঃ "কেন পারবে না? ঘুণ যদি লোহা খেতে পারে তাহলে চিলও ছেলে নিয়ে যেতে পারবে।" এই বলে ব্যবসায়ী রাজাকে একটা দোঁহা শোনাল ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্যায়সে কি ত্যায়সে শুনরে রাজা ভিল।
লোহাকে ঘুণ খা গিয়া, লেড়কা লে গিয়া চিল।।

☆ ☆ ☆

ভালো মানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে কত অসৎ প্রকৃতির লোক যে সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের কাজই হল অকারণে মানুষের ক্ষতি করা। এইসব লোককে যেকোনো প্রকারে দমন করতে না পারলে জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। কিন্তু শঠের সঙ্গে শঠতা না করলে অনেক সময় তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। দাবিয়ে না রাখলে তার সাহস যেমন বেড়ে যায়, তার শঠতাও তেমনি দিন দিন বাড়তে থাকে। সংসারে থাকতে গেলে তাই শঠের সঙ্গে শঠতা করায় কোনো দোষ নেই। তাই বলা হয়েছে ঃ 'ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ'—মায়াবী অর্থাৎ ছল, কপটতা, জোচ্চুরি যাদের স্বভাব, সেইসব শঠের প্রতি যারা শঠতা না করে, তাদের প্রতি ব্যবহারে নিজেরাও মায়াবী না হয়, সেইসব মূঢ়ধী, বোকার দল জীবনে কেবল পরাভবই লাভ করে অর্থাৎ হেরে যায়, সব খুইয়ে বসে।

রাজা মহারাজার কথা

রাজা চলেছেন গঙ্গাস্নানে। আগে আগে চলেছে হাতি, ঘোড়া, সেপাই-সান্ত্রীর দল। রাস্তায় এত ভিড় জমেছে যে পথ চলাই দায়। সেই পথের মাঝে এক সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বাঘছালের উপর বসেছিলেন। এমন সময় রাজার সেপাইরা তাঁর সামনে এসে হাঁকডাক শুরু করে দিল ঃ "ওহে সাধু, ওঠো এখান থেকে। দেখছ না রাজামশাই আসছেন?" সাধু কোনো উত্তর দিলেন না, যেমন ছিলেন তেমনি চুপ করে বসে রইলেন। সেপাইরা তখন রাজার কাছে গিয়ে বলল ঃ "হুজুর, এক সাধু পথের মাঝখানে বসে রয়েছে, কিছুতেই নড়ছে না। ওর জন্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারছিনে।

রাজা তখন নিজেই সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে তুমি?" সাধুও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন ঃ "তুমি কে? রাজা বললেন "আমি রাজা।" সাধু বললেন ঃ আমি মহারাজা।" শুনে রাজা বললেন ঃ "তুমি মহারাজা! তোমার ধন-দৌলত কোথায়?" সাধু জবাব দিলেন ঃ 'অভাব থাকলে তো ধন-দৌলত দরকার। আমার কোনো অভাব নেই, ধন-দৌলত নিয়ে আমি কী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করব?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তো মহারাজা, তাহলে তোমার সৈন্য-সামন্ত কোথায়?" সাধু বললেন ঃ "আরে, আমার শত্রু কোথায় যে সৈন্য-সামন্ত রাখব? যার শত্রুই নেই তার আবার সৈন্য-সামন্তে দরকার কী?" রাজা আবার বললেন ঃ "তুমি বলছ তুমি মহারাজা, আমাকে বলো তো তোমার রাজ্যটা কোথায়?" এবার সাধু উত্তর দিলেন ঃ "আমার রাজত্ব দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে। আরে রাজা, তুমি তো কেবল একটা দেশেরই রাজা। আর আমি যেখানেই যাই না কেন, সেখানেই আমার রাজত্ব। তাইতো বলছি, তুমি যদি রাজা তো আমি হলাম মহারাজা।"

☆ ☆ ☆

এখানে দেখানো হয়েছে রাজার ঐশ্বর্য বাইরের সঞ্চয়ে, আর মহারাজা বা সাধুর ঐশ্বর্য অন্তরের ত্যাগে। রাজার সব সময় শত্রুর ভয়, সাধুর সর্বত্র অভয়। রাজার রাজত্ব নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ, সাধুর রাজত্ব সীমাহীন, বিশ্বজোড়া। কবীর তাই বলেছেন রাজাকে উদ্দেশ করে ঃ 'তোমার ঘরে আছে লাখ লাখ ঘোড়া-হাতি, লোক-লস্কর, ধন-জন, আর আমার ঘরে রয়েছেন একমাত্র মুরারি, শুধুই এক ভগবান। আমার সে-ধনকে আগুনেও পোড়ায় না, হাওয়াতেও ওড়ায় না, অক্ষয় সে ধন। আর তোমার ধন-সম্পদ সবই যে ক্ষয়শীল, সবই তো শুধু দুদিনের।'

মুক্তির পথ

দুই অন্ধ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল ঃ "দেখো ভাই, আমরা অন্ধ, বড়ো কষ্ট আমাদের। এখানে তো আমাদের খাবার জুটছে না, চলো না আমরা শহরে যাই, সেখানে গেলে হয়তো খাওয়ার কষ্ট ঘুচবে।" এই ভেবে তারা একজন লোককে বলল ঃ "ভাই, আমরা শহরে যাব, তুমি আমাদের শহরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দেবে?" লোকটি তখন সেই দুই অন্ধকে শহরে পৌঁছে দিয়ে এল।

কিন্তু শহরে এসে তাদের দুর্দশা আরও বেড়ে গেল। এক তারা অন্ধ, চোখে কিছুই দেখে না। এধার থেকে গাড়ি আসে, ওধার থেকে মানুষ এসে গায়ে পড়ে, এখানে ঠোক্কর খায়, ওখানে ঠোক্কর খায়। বড়ো মুশকিলেই পড়ে গেল তারা। তাদের দুঃখের আর অন্ত রইল না। এইভাবে নাজেহাল হবার পর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তারা শহর থেকে বেড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঃ "ভাই, এই শহর থেকে কীভাবে বেরুনো যায় বলতে পারো?" কেউ বলে ওদিকে যাও, কেউ বলে সেদিকে যাও। ওরা তো অন্ধ, ওদিক সেদিক কিছুই বুঝতে পারল না।

এমন সময় তাদের সঙ্গে এক মহাত্মার দেখা হয়ে গেল। তারা কাঁদতে কাঁদতে সেই মহাত্মাকে বলল ঃ "বাবা, আমরা এই শহরের মধ্যে এসে পড়েছি, এখন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, কিন্তু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিনে। আপনি যদি বেরুবার রাস্তা দেখিয়ে দেন তাহলে আমরা শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।" মহাত্মা তাদের বললেন ঃ "বেশ, রাস্তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। দেখো, সেই পথ ধরে চলতে পারো কিনা। এইযে শহরের মধ্যে তোমরা এসে পড়েছ, এর চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেই প্রাচীরের গায়ে বাইরে বেরুবার একটিমাত্র দরজা আছে। তোমরা তো অন্ধ, ঐ দরজা তোমরা দেখতে পাবে না। তা তোমরা এক কাজ করো। আমি তোমাদের প্রাচীর ধরিয়ে দিচ্ছি, সেই প্রাচীরের গায়ে হাত রেখে তোমরা বেরিয়ে যেয়ো। দেখো ভাই, প্রাচীর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ো না যেন, তাহলে কখন দরজা পেরিয়ে যাবে বুঝতেও পারবে না। বাইরে যাবার ঐ একটিই দরজা। একবার যদি দরজা পেরিয়ে যাও তাহলে আবার এই শহরের মধ্যে তোমাদের ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে।" দুই অন্ধ তখন প্রাচীরের গায়ে হাত রেখে এগিয়ে যেতে লাগল।

দুই অন্ধেরই কোমরে ছিল দাদ। দাদের চুলকুনি শুরু হতেই দুজনে চুলকোতে শুরু করল। এক অন্ধ তো প্রাচীর থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে দুহাত দিয়েই দাদ চুলকোতে লাগল আর তার ফলে দরজাও তার নাগালের বাইরে চলে গেল। সে আবার শহরের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়ল। আর এক অন্ধ ছিল বুদ্ধিমান। সে এক হাত প্রাচীরে রেখে অন্য হাত দিয়ে দাদ চুলকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রাচীরের যেখানটায় ফাঁক ছিল সেখানে যেমনি হাত পড়া, অমনি সে সেই ফাঁক দিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল।

☆ ☆ ☆

জীব হল অন্ধ, তাকে এই দেহরূপ নগরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি অনবরত তাকে খোঁচা মারছে, ফলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সে কেবলই ঠোক্কর খেয়ে মরছে, অন্ধ জীবের আর শান্তি মিলছে না। ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তবে, সদ্‌গুরুর দর্শন সদ্‌গুরুই বলে দেন যে এই মানবজীবনই হল মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। তাঁর উপদেশই হল সেই প্রাচীর, যাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে পারলে এই জীবনেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। তবে বিষয়-বাসনা তো মানুষকে ছাড়তে চায় না। দাদের চুলকুনির মতো তা মানুষকে অস্থির করে মারে। তাই যে চালাক, সে এক হাত দিয়ে দেয়ালটি অর্থাৎ গুরুর উপদেশের পরম আশ্রয়টি আঁকড়ে ধরে থাকে, আর এক হাত দিয়ে দাদ চুলকোয়, মানে সংসারের কাজ সেরে যায়। এতেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়, সংসারকে ত্যাগ করবার প্রয়োজন হয় না, বিষয় বা সংসার আমাদের মুক্তিলাভের পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু প্রাচীর ছেড়ে দিয়ে, গুরুর উপদেশকেই ভুলে, ভগবানকে ভুলে আমরা যদি বিষয় আর সংসার নিয়েই মত্ত হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের ভাগ্যে জুটবে মহতী বিনষ্টি, দেহের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে বারে বারে আমাদের ফিরে আসতে হবে এই সংসার-অরণ্যে।

জনক রাজার গুরু লাভ

জনক রাজা এক মস্ত সভা ডেকেছেন। যত মুনি-ঋষি সাধু-সন্ন্যাসী সবাই আহূত হয়ে সেই সভায় এসে মিলিত হয়েছেন। সভার মাঝখানে একটি আসন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, সে আসনে বসবেন জনক রাজার গুরুদেব। এমন সময় জনক রাজা ঘোষণা করলেন ঃ "আপনাদের মধ্যে যিনি আমাকে এক কথায় তত্ত্বের উপদেশ দিতে পারবেন যাতে আমার মনে আর কোনো প্রশ্ন জাগবে না, তিনি এসে গুরুর জন্যে নির্দিষ্ট এই শূন্য আসনে উপবেশন করুন।"

রাজাকে উপদেশ দিতে মুনি-ঋষিরা কেউ আসন ছেড়ে উঠলেন না। তাঁরা ভাবলেন, উপদেশ শুনে রাজার মনে যদি কোনো সংশয় জাগে, প্রশ্ন জাগে, তবে তো গুরুর আসন থেকে তিনি নামিয়ে দেবেন। তখন অপমানের একশেষ হতে হবে, সবাই হাসাহাসি শুরু করবে। এই ভেবে তাঁরা যে যাঁর জায়গায় স্থির হয়ে বসে রইলেন।

এমন সময় সভায় এসে উপস্থিত হলেন অষ্টাবক্র মুনি। অতি কদাকার তাঁর দেহের গঠন, দেহের আট জায়গা বাঁকা। তিনি এসেই গুরুর আসন খালি দেখে সেখানে বসে পড়লেন। তাই দেখে সভাস্থ সকলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিলেন—আরে, দেহের একটা অঙ্গের অসংগতি থাকলে কেউ গুরু হতে পারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না, আর এঁর তো আট জায়গায় বাঁকা। এই দেহ নিয়েও রাজগুরু হবার সাধ হয়েছে, নির্লজ্জের মতো তাই ঐ আসনে গিয়ে বসেছেন। তখন অষ্টাবক্রকে নিয়ে চারিদিকে হাসাহাসির ধূম পড়ে গেল।

অষ্টাবক্র তখন সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ "আমাকে দেখে যারা হাসছে তারা সবাই কসাই আর চামার।" একথা শুনে সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেউ কেউ অষ্টাবক্রকে বললেন ঃ "আপনি নিজে এতবড়ো মুনি হয়ে এমন অশোভন কথা উচ্চারণ করলেন! আপনার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। এখানে আমরা যত মুনি-ঋষি রয়েছি সবাইকে আপনি কসাই আর চামার বলবেন, এ কেমন কথা? আপনার এই কথায় আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।"

অষ্টাবক্র বললেন ঃ "আমি কখনো মিথ্যে কথা বলিনে। যা সত্য, আমি তাই বলেছি। আমি এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যে আমায় দেখে হেসে উঠলে, কাকে দেখে তোমরা এমন হাসলে? হাড় মাংসে গড়া, চামড়ায় ঢাকা এই দেহটাকে দেখেই তো তোমরা হেসেছো? চামড়ার দিকে নজর কার? চামারের। আর মাংসের দিকে নজর দেয় কে? কসাই। তাই বলছি, আমার এই শরীরটাকে দেখে যারা হেসেছে তারা সবাই কসাই আর চামার।"

এমন সময় রাজা জনক অষ্টাবক্রকে বললেন ঃ "আপনি গুরুর আসনে বসেছেন, এখন এককথায় আপনি আমাকে তত্ত্ব উপদেশ করুন।" ব্যাস-বশিষ্ঠের মতো আরও যাঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবছেন, জনকের মনে কোনো সংশয় জাগবে না, অথচ এক কথাতেই অষ্টাবক্র জনককে তত্ত্ব উপদেশ করবেন, কী সে তত্ত্ব? অষ্টাবক্র তখন জনককে বললেন ঃ "রাজা জনক, সম্পূর্ণ নিজস্ব বলতে তোমার যা আছে তা তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" এই একটিমাত্র কথাতেই জনকের তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হল, অষ্টাবক্র নিজের গুরুদক্ষিণাও চেয়ে নিলেন। যত সাধু-সজ্জন সেখানে ছিলেন, সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

অষ্টাবক্রের এই একটি কথায় জনকের মনে নানারকম চিন্তার উদয় হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, নিজস্ব বলতে আমার কী আছে? রাজ্য? এ রাজ্য কি আমার? আমি যখন ছিলাম না তখনো এ রাজ্য ছিল, আবার আমি যখন থাকব না তখনো এ রাজ্য থাকবে। রাজ্য তো আমার সঙ্গে আসেনি, আমার সঙ্গে যাবেও না। তবে একে 'আমার' বলি কী করে? এই যে দেহ, এ দেহটাও তো আমার নয়। এ তো পঞ্চভূতের সমষ্টি, চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। জনক ভাবতে থাকেন, 'আমার বলে কাকে আমি দাবী করতে পারি? আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজেই বা কে? আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার কিছুই নই। তবে 'আমি' কে?

জনক রাজা গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূরণ হল। আত্মজ্ঞানের চরম ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি তখন জানতে পারলেন যে তিনি হলেন সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা। এইভাবে গুরুর একটি কথাতেই জনক আত্মজ্ঞান লাভ করলেন।

☆ ☆ ☆

অধ্যাত্ম রাজ্যে অধিকারী ভেদ না মেনে উপায় নেই। শ্রেষ্ঠ অধিকারী হলে সদ্‌গুরুর একটিমাত্র ইঙ্গিতেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটতে পারে। তাই বলা হয়ঃ 'বাক্যাৎ তত্ত্বমতির্ভবেৎ', একটি শ্রুতিবাক্য, বেদবাণী বা গুরুর উপদেশেই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। উপনিষদের এমনই একটি মহাকাব্য 'তৎ ত্বম্ অসি', তুমি তো তাই বা সে-ই। তুমি তো জীব নও, তুমি তো শিব। তেমন অধিকারী হলে এই কথা শোনামাত্রই জীব শিব হয়ে যায়, তার আর সাধন-ভজনের প্রয়োজন থাকে না, মনন-নিদিধ্যাসন করতে হয় না, মাত্র শ্রবণেই সে কৃতার্থ হয়ে যেতে পারে।

ভগবান ভক্তের অধীন

এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শহরে বাস করেন। বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলতের কোন অভাব তাঁদের নেই, অভাব শুধু কোনো সন্তানাদি নেই তাঁদের। তাই মনের দুঃখে তাঁরা দিন কাটান। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই স্বামী-স্ত্রী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সেবা করেন আর তাঁদের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন ঃ "বাবা, আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের একটি ছেলে হয়।"

একদিন এক সাধু তাঁদের ঘরে এসেছেন। তেজোময় তাঁর আকৃতি, যেন আগুনের শিখা জ্বলছে তার সর্বাঙ্গে। স্বামী ও স্ত্রী ভক্তিভরে তাঁর সেবাপরিচর্যা করলেন এবং তাঁর কাছেও পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করলেন। সাধু বললেন ঃ "তোমাদের ছেলে হবে কিনা তা আমি এখনই বলতে পারছিনে। তোমরা একটা নির্জন ঘরে আমার আসনের ব্যবস্থা করে দাও। আমি আমার ইষ্টদেবের ধ্যান করব এবং তাঁর কাছে তোমাদের প্রার্থনার কথা জানাব।" স্বামী ও স্ত্রী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুর কথা মতো সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর সাধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ "তোমাদের জন্য আমি ইষ্টদেবের কাছে অনেক মিনতি করলাম, কিন্তু তিনি বললেন যে তোমাদের এমনই ভাগ্য যে তোমাদের কোন সন্তান হবে না।" এই বলে সাধু চলে গেলেন। গভীর হতাশায় স্বামী-স্ত্রীর দিন কাটতে লাগল।

দিন যায়। আবার এক সাধু এসে উপস্থিত হলেন তাঁদের দুয়ারে। অনিন্দ্যনীয় তাঁর রূপ, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ মায়া যেন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে। পরম আগ্রহে স্বামী-স্ত্রী তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা করে ঘরে এসে বসালেন। তারপর বিবিধ উপচারে চরণ বন্দনার পর তাঁরা করজোড়ে তাঁর কাছে নিবেদন করে বললেন ঃ "প্রভু, আমাদের কোন সন্তান না থাকায় আমরা বড়োই মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছি। দয়া করে আপনি বর দিন যেন আমাদের একটি ছেলে হয়।"

একথা শুনে সাধু আসনে বসে চোখ বুঁজে রইলেন। খানিক পরে চোখ খুলে বললেন ঃ "তোমাদের সেবায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। ধ্যানে বসে ইষ্টদেবের দর্শন পেয়ে তাঁর কাছে মিনতি করে বললাম তোমাদের যেন একটি ছেলে হয়। তাঁর কৃপায় শ্রীঘ্রই তোমাদের পুত্রলাভ হবে।" স্বামী ও স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে সাধু বিদায় নিলেন। কিছুদিন পর মায়ের কোল আলো করে সুন্দর এক শিশু জন্ম নিল।

বড়ো আনন্দে পাঁচটি বছর কেটে গেল। একদিন সেই আগের সাধু ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই গৃহস্থের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির আঙিনায় একটি ফুটফুটে ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে সাধু ভাবলেন, এদের তো ছেলে হবার কথা নয়, এ ছেলেটি তবে কার? জিজ্ঞাসা করায় ছেলের বাবা বললেন ঃ "বাবা, আপনি তো বলে গেলেন আমাদের ছেলে হবে না, শুনে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি চলে যাবার পর আর এক সাধু আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁরই আশীর্বাদে আমরা এই ছেলেকে পেয়েছি।"

একথা শুনে সাধু নিজের ইষ্টদেবের উপর ভয়ানক রেগে গেলেন। ইষ্টদেব কি তাহলে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন? এই ভেবে তিনি ধ্যানে বসলেন এবং ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করে তাঁকে বললেন ঃ "ভগবান, আপনি আমাকে বলেছিলেন এদের ছেলে হবে না, অথচ আর এক সাধুকে বর দিলেন যেন এদের ছেলে হয়। এ কেমন আপনার পক্ষপাতিত্ব?" ভগবান বললেন ঃ "বৎস, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব। এখন তুমি এক কাজ করো। আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বড়ো খিদে পেয়েছে। তুমি কিছু নরমাংস যোগাড় করে আনো দেখি। আজ নরমাংস খেতে আমার বড়ো সাধ হয়েছে।"

সাধু তখন ছুরি হাতে নিয়ে নরমাংসের খোঁজে চারিদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও নরমাংস মিলল না। কত লোককে বললেন ভগবান নরমাংস খেতে চেয়েছেন, কিন্তু নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে দিতে কেউ রাজী হল না। বিফল হয়ে সাধু তখন ভগবানের কাছে ফিরে এলেন। ভগবান বললেন ঃ "এখানে তো নরমাংস পেলে না। শহরের বাইরে যে গভীর বন রয়েছে তুমি সেখানে যাও। দেখতে পাবে আমার এক ভক্ত সেখানে আমার ধ্যান করছে। এই ভক্তের প্রভাবেই গৃহস্থের পুত্রলাভ হয়েছে। সে তোমাকে নরমাংসের ব্যবস্থা করে দেবে।"

সাধু আবার গেলেন নরমাংসের খোঁজে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেই সাধুটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল যাঁর প্রভাবে গৃহস্থের ছেলে হয়েছে। তাঁর কাছে গিয়ে এই সাধুটি বললেনঃ "ভাই, আমার ইষ্টদেব নরমাংস খেতে চেয়েছেন, তুমি যোগাড় করে দিতে পারবে?" অপর সাধুটি বললেন ঃ "নিশ্চয়ই পারব। ভগবান খেতে চয়েছেন এ তো পরম ভাগ্যের কথা।" এই বলে প্রথম সাধুর হাত থেকে ছুরিখানা নিয়ে তিনি বললেন ঃ "ভগবান নরমাংস তো খেতে চেয়েছেন, কিন্তু শরীরের কোন্ অংশের মাংস তিনি খেতে চান তা কি কিছু বলেছেন?" শুনে আগের সাধুটি বললেন ঃ "না ভাই, তা তো কিছু বলে দেননি।" তখন দ্বিতীয় সাধুটি বললেন ঃ "বলে দেননি? তবে তো বড়ো মুশকিল হল। কোন্ জায়গার মাংস তাঁর জন্যে দিই? তবে আমার শরীরের সব জায়গা থেকেই কিছু কিছু মাংস কেটে দিচ্ছি, তাঁর যে জায়গার মাংস পছন্দ তাই খাবেন।" তখন প্রথম সাধু বললেন্ ঃ "আরে না না, সব জায়গার মাংস কাটতে হবে না। যে কোনো জায়গা থেকে একটু কেটে দাও।" পরের সাধুটি তখন বললেন ঃ "তা কি কখনো হয়? ভগবান খেতে চেয়েছেন এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। কোন্ জায়গার মাংস তাঁর ভালো লাগবে তা যখন তুমি জানো না, তাঁকে জিজ্ঞাসাও করে আসোনি, তখন সব জায়গার মাংসই তো দেওয়া উচিত।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধু ছুরি দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ থেকে মাংস কাটতে শুরু করলেন। শরীর থেকে দরদর ধারায় রক্তের স্রোত বইতে লাগল। সাধুর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আরও কাটতে যাবেন এমন সময় ভগবান সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাত চেপে ধরলেন।

ভগবান তখন প্রথম সাধুটিকে বললেন ঃ "এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে তো? ঐ গৃহস্থের ছেলে হবার কথা ছিল না, আমি তোমাকে কিছুই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিথ্যে বলিনি। তবুও কেন তার ছেলে হল তা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। তুমি যেমন আমার ভক্ত, এই সাধুও তেমনি আমার ভক্ত। অথচ তোমাদের দুজনের সেবার মধ্যে কত পার্থক্য সেটা তুমি নিজেই বুঝে দেখো। আমি নরমাংস খেতে চাইলাম, আর তুমি কিনা তার সন্ধানে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ালে। কেন? তুমি কি মানুষ নও? তুমি তো কই নিজের মাংস কেটে আমাকে দিতে পারলে না। আর এই সাধুকে দেখো। আমি নরমাংস খাবো শুনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে আপন হাতে সারা অঙ্গ থেকে মাংস কেটে দিচ্ছে কারণ সে জানে না দেহের কোন্ জায়গার মাংসে আমার পরিতৃপ্ত হবে। যে ভক্ত আমার জন্যে এইভাবে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে আমিও তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিই। গৃহস্থের ছেলে হবার কথা ছিল না, তবু আমার এই ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করবার জন্য আমি নিজেই ঐ গৃহস্থের ঘরে পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছি।

☆ ☆ ☆

ভগবানের ভক্ত বলে তো সবাই নিজেকে মনে করে, কিন্তু ভগবান ভক্তকে যাচাই করে নেন সে কতখানি নিজেকে বিকিয়ে দিতে পেরেছে, তাই দিয়ে। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ যে করতে পারে, ভগবানের জন্যে নিজেকে পর্যন্ত বলি দিতে পারে, সেই হল যথার্থ ভক্ত। ভগবানও তার জন্যে সব করতে পারেন, নিজেকেও দিয়ে দিতে পারেন, পুত্র বিত্ত তো কোন্ ছার। তাই গীতাতেও তিনি বলেছেন ঃ 'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'।

কিছু চেয়ো না, সব পাবে

কোনো অবস্থাপন্ন গৃহস্থের একটি ছেলে ছিল। শিশুকালেই ছেলেটির বাপ-মা দুজনেই যখন মারা গেলেন তখন সুযোগ বুঝে শত্রুরা তাকে ঠকিয়ে নাবালকের সম্পত্তি দখল করে নিল। ক্রমে ছেলেটি বড়ো হয়ে বিয়ে করে সংসারী হল, কিন্তু দু-চারটি সন্তান হবার পর দারিদ্র্যের জ্বালায় তার দুঃখের অন্ত রইল না। বাজারে অনেক ধার-দেনা, খাওয়া-পরার সংস্থান নেই, পাওনাদারেরা দিনরাত অপমান করে যায়। সে কী করবে, কেমন করে এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবে, কিছুই সে ঠিক করতে পারল না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন এক সাধুর কাছে গিয়ে সে বলল ঃ "বাবা, আমি বড়ো দুর্দশায় পড়েছি। কেমন করে এ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাব আপনি দয়া করে বলে দিন।" এই বলে সে তার দুরবস্থার সমস্ত কথা সাধুর কাছে খুলে বলল। সব শুনে সাধু বললেন ঃ "তোমার দুঃখ দূর করবার উপায় আমি বলে দিতে পারি, তবে আমার কথামতো কাজ করতে পারবে কিনা দেখো।" যুবক বললঃ "আপনি বলুন কী আমাকে করতে হবে, আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয় আমি তা করতে পারব।" সাধু বললেন ঃ "ভাই, এই দেশের রাজার কাছে যদি তুমি যেতে পারো আর কোনোরকমে তাঁকে খুশি করতে পারো, তবে তোমার যত ঋণ সব রাজাই শোধ করে দেবেন। দেনা তো তোমার কম নয়। কিন্তু যে করে হোক রাজাকে খুশি করতে না পারলে কিছু হবে না।" যুবক বলল ঃ "বাবা, আমি দীন-দুঃখী মানুষ আর তিনি হলেন রাজ রাজেশ্বর। তার সঙ্গে আমি দেখা করব কী করে," সাধু বললেন ঃ "সে কৌশলও আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। দেখো চেষ্টা করে সফল হতে পারো কিনা।" এই বলে তিনি তাকে রাজাকে খুশি করবার উপায় বলতে লাগলেন।

সাধু বললেন ঃ "রাজবাড়িতে গিয়ে প্রথমেই তুমি রাজার দর্শন পাবে না, দারোয়ানেরা তোমাকে রাজবাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তাই আগে তাদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করতে হবে। তুমি তাদের তামাক সেজে দিয়ো, বাসন মেজে দিয়ো। তারা যখন জিজ্ঞাসা করবে তুমি কে, কেনই বা তাদের এত সেবা করছ, তখন তুমি বলবে, ভাই, আমি নিজের ইচ্ছায় সকলের সেবা করি, আমি স্বেচ্ছাসেবক। ওদের সঙ্গে যখন বেশ মেলামেশা হয়ে যাবে তখন জমাদারের সঙ্গে আলাপ করবে, মন দিয়ে জমাদারদের সেবা করবে। জমাদার যখন বলবে কে তুমি, তুমি কী চাও, তখন তুমি বলবে আমি কিছুই চাইনে, আমি স্বেচ্ছায় সকলের সেবা করি, আমি স্বেচ্ছাসেবক। এইভাবে একে একে রাজার পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে যাবে। তুমি স্বেচ্ছায় সকলের সেবা করছ অথচ কিছুই চাও না দেখে সকলেই তোমাকে ভালোবাসবে। তখন তাদেরই সঙ্গে তুমি রাজসভায় যেতে পারবে। সেখানে গিয়ে রাজাকে যতদূর সম্মান দেখাতে হয় দেখিয়ো, তাঁকে প্রণাম কোরো। তাহলেই তোমার উপর রাজার দৃষ্টি পড়বে আর তিনি তোমার পরিচয় জানতে চাইবেন। তখন তুমি বলবে, রাজামশাই, আমি স্বেচ্ছাসেবক, আপনার সেবা করতে পেলে আমি ধন্য হব। রাজা যখন বলবেন, একে তো মাইনে দিতে হবে না, এ আমার কাছেই থাকুক, তখনই তুমি রাজাকে আপন করে পাবে। প্রাণপণে তুমি রাজার সেবা করবে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁর কাছে কখনো কিছু চাইবে না, তিনি দিলেও কিছু নেবে না। তুমি যদি নিষ্কাম হতে পারো তাহলে তোমার উপর রাজা খুব খুশি হবেন আর রাজা খুশি হলেই তোমার সব ঋণ থেকে তিনি তোমাকে মুক্ত করে দেবেন।"

সাধুকে প্রণাম করে যুবক রাজবাড়ির বাগানে গেল আর সেখানে দারোয়ানদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল। সে তাদের তামাক সাজে, বাসনটা মেজে দেয়। দারোয়ানরা বলল ঃ "ভাই, তুমি আমাদের এসব কাজ করছ কেন? আমরা মোটে তো দশ টাকা মাইনে পাই, তোমাকে কোথা থেকে মাইনে দেব বলো।" যুবক তখন বলল ঃ "ভাই আমাকে মাইনে দিতে হবে না, আমি স্বেচ্ছাসেবক, নিজের খুশিতে আমি সকলের সেবা করি।" কিছু দিনের মধ্যেই পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে যুবকের পরিচয় হয়ে গেল। তখন সে তাঁদের সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে রাজাকে যথেষ্ট সম্মান জানিয়ে প্রণাম করল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে তুমি?" যুবক বলল ঃ "আমি আপনার দাস।" রাজা বললেন ঃ "আমার তো অনেক দাস-দাসী রয়েছে, নতুন লোকের আর দরকার নেই।" যুবক তখন হাতজোড় করে বলল ঃ "রাজামশাই, আমি স্বেচ্ছাসেবক। আমাকে তো কোনো মাইনে দিতে হবে না, আমি আপন ইচ্ছায় আপনার সেবা করব, তাতেই আমার আনন্দ। আমাকে আপনার কাছে থাকবার অনুমতি দিন।"

রাজা ভাবলেন মাইনে যখন দিতে হচ্ছে না তখন ও এখানেই থাকুক। সেইদিন থেকে যুবক রাজবাড়িতে স্থান পেল। রাজা তাকে স্বেচ্ছাসেবক বলে ডাকেন। তাকে কোনো কাজের জন্যে বলতে হয় না, বলবার আগেই সমস্ত কাজ সে সম্পন্ন করে রাখে। রাজার যা-কিছু কাজ সবই সে নিজের হাতে করে। তার এমন পরিপাটি কাজ দেখে রাজা তাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন।

একদিন রাজা দেখলেন তাঁর সেবক ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছ, তোমার আর কাপড় নেই?" সেবক বলল ঃ "আমার এই কাপড়েই চলবে, অন্য কাপড়ের আর দরকার নেই।' রাজা দেখলেন নতুন কাপড় দিলে তো ও নেবে না, তাই নিজের পুরণো কাপড় তাকে দিয়ে বললেন ঃ "আমার এই প্রসাদী কাপড় তোমাকে দিলাম, এই কাপড় তুমি পরো।" যুবক তখন রাজার প্রসাদ সেই রাজবেশ পরল।

আর একদিন রাজা দেখতে পেলেন তাঁর সেবকের মুখখানা বড়ো শুকনো দেখাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমার মুখ শুকনো দেখছি, তুমি কিছু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খাওনি?'' সেবক বলল ঃ ''না রাজামশাই, এখন আর কিছু খাব না।'' শুনে রাজার মনে বড়ো দুঃখ হল তিনি ভাবলেন, আহা! ছেলেটি এমন নিঃস্বার্থভাবে আমার সেবা করছে আর আমার রাঁধুনি বামুন এমনই হিংসুটে যে তাকে খেতে পর্যন্ত দেয় না। ও তো কারুর কাছে কিছু চাইবে না, এই ভেবে নিজের খাওয়া হয়ে গেলে পর রাজা নিজেই সেই পাতেই সেবককে বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ ''বাছা, তোমাকে কেউ খেতে দেয় না। আজ থেকে রোজ তুমি আমার পাতে বসে খেয়ো।'' এইভাবে রাজার দেওয়া রাজবেশ পরে রাজার পাতে সে তাঁর প্রসাদী রাজভোগ খেতে লাগল।

একদিন সেবক রাজার পা টিপছে, রাজা দেখলেন ঘুমের ঘোরে সে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। রাজা বললেন ঃ ''তোমার খুব ঘুম পেয়েছে দেখছি, তুমি আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ো।'' সেদিন থেকে প্রত্যহ দিনে ও রাতে রাজার পা টেপার পরে সে তাঁরই পায়ের কাছে শুয়ে থাকে। এখন তার ভাগ্যে রাজবেশ জুটছে, প্রত্যহ রাজভোগ খাচ্ছে, গদি-আঁটা রাজার পালঙ্কে শুতে পেয়েছে আর রাজার সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজা তাকে নিজের প্রাণের মতো ভালোবাসতে লাগলেন, সে-ও রাজার সকল কাজের সাথী হয়ে উঠল।

একদিন রাজা কিছু জিনিস কিনতে সেবককে বাজারে পাঠালেন। তার পুরণো পাওনাদাররা তখন বাজারে বসে ছিল। সেবককে দেখামাত্র তারা তাকে চেপে ধরে বলতে লাগল ঃ ''ব্যাটা ফাঁকিবাজ, আমাদের ফাঁকি দিয়ে রাজার কাছে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে? রাজার ভয়ে আমরা কিছু করতে পারিনি, কিন্তু এখন তো তোকে একলা পেয়েছি। ভালো চাস তো এক্ষুনি আমাদের টাকা মিটিয়ে দে, নইলে আজ আর তোকে আস্ত রাখব না। ধার-দেনায় ডুবে আছে, আবার রাজবেশ পরা হয়েছে, লজ্জা করে না তোর?'' এইভাবে অপমান করার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে মারধোর করতে লাগল।

এদিকে সেবকের ফেরার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গিয়েছে দেখে রাজার চিন্তা হল এখনো সে কেন ফিরল না। তখন তিনি নিজেই তার সন্ধানে বাজারে গিয়ে তার দুর্দশা দেখতে পেলেন। তিনি সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ''কী হয়েছে? এরা তোমাকে মারছে কেন?'' সেবক বলল ঃ ''প্রভু, আমি এদের কাছে অনেক ঋণ করেছি, এরা আমার পাওনাদার। আমি সেই দেনা শোধ করতে পারিনি বলে এরা আমার এই দুর্দশা করেছে।''

রাজা তখন পাওনাদারদের নিজের কাছে ডেকে সব ঋণ শোধ করে দিলেন আর তাদের কাছে যত হ্যাণ্ডনোট ছিল সব ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর সেবককে সঙ্গে করে রাজবাড়িতে এসে নিজের হাতে তার শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

নিষ্কাম ভক্তের অধিকার যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। পরমাত্মা হলেন রাজরাজেশ্বর। মানুষ যেসব পাপ করে, সেগুলিই হল তার জীবনের ঋণ। তাই মানুষের কর্তব্য হল রাজরাজেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া। ঋণমুক্তির এই হল একমাত্র কৌশল। কিন্তু নিষ্কামভাবে তাঁর সেবা করতে হবে। ধন জন, মান, প্রতিপত্তি, কিছুই তাঁর কাছে চাওয়া চলবে না। সেবার দ্বারা একবার যদি পরমাত্মাকে আপন করে পাওয়া যায় তাহলে আর কোনো ভয় নেই, পাপরূপী পাওনাদাররা কিছুই করতে পারবে না। তাদের যা-কিছু পাওনা, সব তিনিই মিটিয়ে দেবেন। চিত্রগুপ্ত যদি সেই পাপের হ্যাণ্ডনোটগুলো এনে হাজির করে তাহলে ভগবান সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভক্তকে নিজের চরণে ঠাঁই দেন। মানুষের সুকৃতি থাকলে সদ্‌গুরুও মিলে যায়, তিনিই ভগবানকে লাভ করবার উপায় বলে দেন।

ভগবানকে লাভ করবার এক প্রকৃষ্ট উপায় হল ভক্তসেবা—শ্রীমদ্ভাগবত যে-কথাটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন যাঁরা নিয়ত ভগবানের সঙ্গ করে থাকেন, ভগবানকে কেন্দ্র করেই যাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ত আবর্তিত, ভগবানের সেইসব অন্তরঙ্গ পার্ষদদের, তাঁর পাত্র-মিত্রদের, তাঁর দাসদের সেবা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে সেই সঙ্গগুণেই একদিন আমরা রাজরাজেশ্বরের চরণতলে উপনীত হতে পারব আর তখনই আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।

যা চাও তা এখানেই পাবে

এক রাজা সদ্‌গুরুর নির্দেশে নানারকম সৎকাজ ও সাধন-ভজনে মন দিলেন। কিছুদিন সাধন-ভজন করবার পর রাজার মনে বৈরাগ্য উদয় হল। তিনি তখন গুরুর কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন ঃ "গুরুদেব, আর আমার রাজত্ব করবার ইচ্ছে নেই, আমি রাজত্ব ত্যাগ করব।" গুরু দেখলেন রাজার মনে বৈরাগ্য এসেছে, এখন শিষ্যকে প্রকৃত বৈরাগ্যের মর্ম আর মুক্তির পথ জানিয়ে দেওয়া দরকার।

গুরু তখন রাজাকে বললেন ঃ "বেশতো রাজত্ব তোমাকে করতে হবে না, তুমি বরং কাউকে এ রাজত্ব দিয়ে দাও।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কাকে দেব?" গুরু বললেন ঃ "তোমার যাকে ইচ্ছে তাকেই দাও। আর ইচ্ছে হয় তো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাকেও দিতে পারো, আমি নিতে পারি।" রাজা তখন এক গণ্ডুষ জল নিয়ে শাস্ত্রমতে গুরুদেবকে রাজত্ব দান করলেন।

গুরু এবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "রাজা এখন তুমি কী করবে? তোমার দিন চলবেই বা কেমন করে?" রাজা বললেন ঃ "গুরুদেব, আমি আর এখানে থাকব না, দূরে কোথাও চলে যাব।" গুরু তখন বললেন ঃ "তুমি যাবেই বা কোথায়? যেখানেই যাও না কেন, নিজের জন্যে তো দুমুঠো অন্ন যোগাড় করতে হবে, লজ্জা নিবারণের জন্য দুখানি কাপড় চাই, থাকবার জন্যেও সাড়ে তিন হাত জমি দরকার।" রাজা বললেন ঃ 'হ্যাঁ গুরুদেব, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। জীবনধারণ করতে হলে এ সবই চাই। আমি ঠিক করেছি কোনো বড়লোকের কাছে রোজ দুঘণ্টা করে কাজ করব, তাহলে তার কাছ থেকেই অন্ন বস্ত্রের যোগাড় হয়ে যাবে। আর থাকবার জন্য তো গাছতলাই রয়েছে।" গুরু বললেন ঃ "বাবা, তুমি রাজা, পরের কাজ তো তুমি করতে পারবে না। তার চেয়ে আমি তোমাকে খাবার অন্ন দেব, পরবার কাপড় দেব, আর থাকবার জন্যে বাগানের মধ্যে একখানা ঘরও দেব। তুমি রোজ দু-তিন ঘণ্টা আমার কাজ করে দাও। পরের দাসত্ব করতে যাবে কেন? আমি তোমার গুরু, তুমি আমার কাজই করো।" গুরুর কথায় রাজী হয়ে রাজা গুরুর কাজই করতে লাগলেন।

রোজ দু-তিনঘণ্টার জন্যে রাজা গুরুদেবের রাজত্বের দেখাশুনা করেন। আগে যেমন রাজকার্য করতেন এখনো ঠিক সেইভাবেই সে-কাজ সম্পন্ন করতে লাগলেন, তবে 'আমি রাজা' এই অহংকার তাঁর মনে আর ঠাঁই পেল না। রাজা এখন জানেন এ রাজত্ব আমার নয়, গুরুদেবের, আমি তাঁর দাস মাত্র, তাঁরই কাজ আমি করে যাচ্ছি। এইভাবে গুরুর কাজে রাজার দিন কাটতে লাগল।

গুরু একদিন রাজাকে বললেন ঃ "দেখো রাজা, মুক্তি লাভের জন্যে নির্লিপ্ত হওয়ার জন্যে দূরে পালাবার কোনো দরকার করে না। যা চাও তা তুমি এখানেই পাবে। তোমার যা-কিছু আছে সব যদি ভগবানকে সমপর্ণ করে দাও, গুরুকে যদি সমর্পণ করে দাও আর 'আমি রাজা' এই অভিমানটি যদি ত্যাগ করতে পারো, তাহলে রাজত্ব করলেও তুমি নির্লিপ্ত থাকতে পারবে, কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড়বে না। কিন্তু মন থেকে 'আমি রাজা' এই অহংকারটি ত্যাগ করতেই হবে। তবে শরীরধারীর পক্ষে সব অভিমান ত্যাগ করা তো সম্ভব নয়, তাই একটি উপায় রয়েছে 'দাসোহম্', আমি ঈশ্বরের দাস, গুরুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দাস। তাঁরই অন্নে আমি প্রতিপালিত, তাঁরই দেওয়া বস্ত্রে আমার লজ্জা নিবারণ হচ্ছে। এই ভাব নিয়ে তুমি যত রাজত্বই করো না কেন, কোনো কিছু তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি নির্ভয় ও নির্লিপ্ত থাকতে পারবে।"

☆ ☆ ☆

মহাজনেরা বলেন সংসারে থেকেও ভগবানকে লাভ করা যায়। তাঁকে পেতে হলে যে সংসার ত্যাগ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে 'আমি কর্তা, 'আমার সংসার', এই ভাবটি ত্যাগ করতে হবে। যদি সদ্‌গুরুর কৃপায় ও আপন সুকৃতিবশে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায় যে এ সংসার আমার নয়, তাঁর, আমি তাঁর দাস হয়ে তাঁরই সংসার প্রতিপালন করে চলেছি, তাহলে ঈশ্বর লাভের সংসার কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

ব্যাসদেব, তাঁর দাস ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

ব্যাসদেবের এক দাস অনেকদিন তাঁর সেবা করেছে, সেই দাসের একদিন খুব অসুখ করল। ব্যাসদেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কী করবেন, কোন্ চিকিৎসায় রোগ ভালো হবে কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। অনেক রকম ওষুধপত্র রোগীকে দেওয়া হল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না দেখে তিনি সেই দাসকে সঙ্গে করে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে বললেন ঃ "আমার এই দাসের বড়ো অসুখ, আপনি দয়া করে একে ভলো করে দিন।"

ব্রহ্মা বললেন ঃ "দেখো ভাই, একে ভালো করবার সামর্থ তো আমার নেই, আমি জীবকে সৃষ্টি করি, জীবকে পালন করেন বিষ্ণু। তুমি একবার বিষ্ণুর কাছে গিয়ে দেখো তিনি কোনো উপায় করতে পারেন কিনা।" ব্যাসদেব তখন ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন ঃ "আপনিও কেন চলুন না আমাদের সঙ্গে।" ব্রহ্মা রাজী হয়ে বললেন ঃ "বেশ তো, চলো আমিও যাই।" তখন তিনজন বিষ্ণুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ব্যাসদেব বিষ্ণুকে বললেন ঃ "হে বিষ্ণু, আপনি হলেন পালনকর্তা, আপনি আমার এই অসুস্থ দাসকে রক্ষা করুন।" বিষ্ণু বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমি পালন কর্তা বটে, তবে মহেশ্বর হলেন সংহারকর্তা। তুমি তাঁর কাছে যাও, তিনিই একে বাঁচাবার কোনো উপায় করে দবেন।" ব্যাস তখন বিষ্ণুকে বললেন ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে আর দাসের জন্যে আপনি একবার মহেশ্বরকে বলে দেখবেন।"

তখন ব্যাসের সঙ্গে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে গেলেন। ব্যাস মহেশ্বরকে বললেন ঃ "হে মহেশ্বর, আমি আমার এই দাসের জীবন রক্ষার জন্যে আপনার কাছে এসেছি, আপনি একে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর এমন সামর্থ নেই যে তাকে রক্ষা করেন। দেখুন, তাঁরাও আমার সঙ্গে আপনার কাছে এসেছেন দাসের প্রাণ ভিক্ষার অনুরোধ জানাতে।"

ব্যাসদেবের কথা শুনে মহেশ্বর বললেন ঃ "আরে, তুমি করেছ কী? দাসের ভালো করতে গিয়ে তুমি যে দেখছি তার সর্বনাশ করলে। এর প্রারব্ধে রয়েছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতা আর ব্যাস ও তার দাস, এই পাঁচজন একত্র মিলিত হলেই এই দাসের প্রাণ যাবে। তিন দেবতা আর দাসকে তুমিই তো যোগাড়যন্ত্র করে একসঙ্গে জুটিয়েছ আর বলছ ওকে বাঁচাতে হবে! এ কেমন কথা! এই তিন দেবতার এখন একসঙ্গে মিলবার কথা ছিল না, তুমিই উদ্‌যোগী হয়ে এই যোগাযোগটা যদি না ঘটাতে তাহলে তো এর মৃত্যু হত না। তুমি তো তাকে বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিলে, কিন্তু দেখো তুমিই তার মৃত্যুর কারণ হলে। এখন আর কোনো উপায় নেই। এর ভাগ্যতেই লেখা রয়েছে 'ব্যাসশ্চ দাসোস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ' এই পাঁচজন একত্র হলেই দাসের মৃত্যু হবে। এর যা ভবিতব্য তা এখনই ফলবে। প্রারব্ধকে কি কেউ খণ্ডাতে পারে?"

☆ ☆ ☆

আমরা যাকে নিয়তি বলি, তার হাত থেকে কারুর নিষ্কৃতি নেই। এই নিয়তি আমাদের নিজেদেরই কর্মফলের জের, যাকে বলা হয় প্রারব্ধ। প্রারব্ধের ভোগ তাই সবাইকে ভুগতে হয়, এমন কি জ্ঞানী, যোগী, মুনিকেও। প্রারব্ধের ভোগ এড়াতে গিয়ে আমরা ঘটনাচক্রে সেই প্রারব্ধের নির্দিষ্ট ভোগের পথই প্রশস্ত করে দিই। আমাদের অজ্ঞাতসারে কর্মচক্র এইভাবেই যা ঘটাবার তা আমাদের দিয়েই ঘটিয়ে নেয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিছুই সঙ্গে যাবে না

একটি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে সংকল্প করেছিল যে প্রতিদিন পঁচিশজন ব্রাহ্মণকে আহার করিয়ে তবে সে আহার করবে। মেয়েটির বাপ-মা পরম ধার্মিক। তাঁরা মেয়ের এই শুভ সংকল্পে খুব খুশি হলেন। ক্রমে মেয়েটি বিবাহযোগ্যা হলে বাপ-মা তাকে পাত্রস্থ করলেন। পাত্রের অবস্থাও খুব ভালো, কিন্তু স্বভাবে সে অতি কৃপণ। সে যখন দেখল যে তার স্ত্রী প্রত্যহ পঁচিশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছে তখন তার অত্যন্ত রাগ হল এবং এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সে ঝগড়া শুরু করল। একদিন সে স্ত্রীকে বলল ঃ "তুমি আমার ভাঁড়ার থেকে কোনো জিনিস নেবে না। আমি তোমাকে রোজ একটা করে টাকা দেব, তাই দিয়ে তুমি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ো।"

একথা শুনে হতাশায় মেয়েটির মন ভেঙে গেল। সে ভাবল, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণই ভালো। এই ভেবে সে স্বামীকে বলল ঃ "তুমি তো রোজ আমাকে একটা করে টাকা দেবে বলছ, তাতে মাসে আমার ত্রিশ টাকা হবে। সেই টাকাটা একসঙ্গে আজই আমাকে দিয়ে দাও, আমি আর কখনো তোমার কাছে কিছু চাইব না।" মেয়েটি ভেবে ভেবে ঠিক করেছে, এই টাকায় আজকের মতো আমি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সন্ধ্যাবেলা প্রাণ ত্যাগ করব। রাত পোহাবার আগেই আমাকে মরতে হবে, নইলে সকাল হয়ে গেলেও যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমার এতদিনকার ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে।

এমন সময় এক ফকির সেই বাড়িতে এলেন। ফকিরকে দেখে মেয়েটি তাঁকে আহারের জন্যে অনুরোধ করল। ফকির বললেন ঃ "তোমার কাছে আমি তো কিছু খেতে পারব না মা। কোনো গভীর দুঃখ তুমি মনের মধ্যে চেপে রেখেছ। সেই দুঃখের কারণ আমাকে না বললে আমি কিছুই খাবো না।"

মেয়েটি তখন তার দুঃখের কথা সমস্তই ফকিরকে শোনাল। তারপর বলল ঃ "বাবা, এ প্রাণ আমি আর রাখব না। ছেলেবেলা থেকে পঁচিশজন ব্রাহ্মণ ভোজনের যে ব্রত আমি পালন করে আসছি, এতকাল পরে স্বামীর কৃপণতায় তা বন্ধ করতে হবে, এ আমি সইতে পারব না। তাই আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে, আজ সন্ধ্যেবেলাতেই আমি প্রাণ ত্যাগ করব।"

সব শুনে ফকির বললেন ঃ "মা আজকের দিনটা তুমি অপেক্ষা করো। আমি একবার তোমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। দেখি তাকে বোঝাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারি কিনা। যদি না বোঝে তখন কাল না হয় তুমি দেহত্যাগ কোরো, আজকে হঠাৎ কিছু করে ব'সো না।"

মেয়েটিকে এইভাবে বুঝিয়ে ফকির তখন তার স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন : "ভাই তুমি আমার একটা উপকার করবে?" স্বামী তো কৃপণ, সে ভাবল লোকটা বুঝি টাকার ধান্ধায় এসেছে। তাই সে বলল : "না ভাই, আমি তোমার কোনো উপকার, করতে পারব না।" ফকির বললেন : 'ভাই, এর জন্যে তোমাকে কিছু খরচ করতে হবে না। বিনা খরচেই তুমি আমার উপকার করতে পারো।" পয়সা খরচ হবে না শুনে মেয়েটির স্বামী বলল : "তবে বলো তোমার জন্যে কী করতে হবে?" ফকির বললেন : "ভাই, কাজ আমার সামান্যই। আমরা দুই ভাই ছিলাম, দুজনেই আমরা দরজীর কাজ করতাম। দাদা মারা গিয়েছেন, তবে স্বর্গে গিয়েও তিনি দরজীর কাজই করছেন। স্বর্গে ছুঁচ পাওয়া যায় না, ছুঁচের অভাবে তাঁর খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আর সাত দিন বাদেই তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে। আমার একটা ছুঁচ তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দাদাকে দিয়ো। এতে তো তোমার কোনো খরচ হবে না, দাদারও খুব উপকার করা হবে। নাও ভাই, এই ছুঁচটা নাও আর দাদাকে এটা দিয়ে দিয়ো।"

কৃপণ স্বামীর তখন ভাবনা ধরে গেল, এ ছুঁচ আমি কী করে নিয়ে যাব? কাপড়ে গেঁথে নেব? আমি মরে গেলে শ্মশানের চণ্ডালরা তো কাপড় খুলে নেবে। শরীরের কোন জায়গায় যদি বিঁধিয়ে রাখি তাহলে তো চিতার আগুনে দেহের সঙ্গে ছুঁচও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাহলে কোন্ উপায়ে ছুঁচ নিই? এইসব ভেবে সে ফকিরকে বলল : "না ভাই, তোমার এ উপকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেমন করে এই ছুঁচ নিয়ে যাব তা আমি ভেবে পাচ্ছি নে।" তখন ফকির বললেন : "ভাই তোমার টাকার থলি যাতে করে নিয়ে যাবে তাতে করেই আমার এই ছুঁচ নিয়ে যেয়ো। তোমার এত টাকা তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে আর আমার সামান্য এই ছুঁচটা নিয়ে যেতে পারবে না?"

তখন কৃপণের মনে নানা চিন্তার উদয় হল। সে ভাবতে লাগল, আরে, এ আমি করেছি কী? কার জন্যে এ টাকার পাহাড় জমিয়ে তুলছি? এখানকার এই যে ধন-দৌলত, এ তো এখানেই পড়ে থাকবে। তখন সে ফকিরকে বলল : "ভাই, আমার সঙ্গে তো কিছুই যাবে না, তুমি আমাকে বলে দাও মৃত্যুর পর কোন্ জিনিস আমার সঙ্গে যাবে।" ফকির বললেন: "জন্মেছ তুমি উলঙ্গ হয়ে যাবেও উলঙ্গ হয়ে। তবে তোমার সঙ্গে যাবে তোমার শুভাশুভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ম। যে পাপ আর পুণ্য তুমি সঞ্চয় করেছ, তাই শুধু তোমার সঙ্গে যাবে, আর কিছুই সঙ্গে যাবে না।"

এতক্ষণে কৃপণের চৈতন্য হল, শুভকর্মে তার প্রবৃত্তি জন্মাল। তখন সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল : "তুমি তোমার ইচ্ছেমতো দান-ধ্যান করো, ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।"

☆ ☆ ☆

কিছুই যে আমাদের সঙ্গে যাবে না, সবই যে এখানেই ফেলে যেতে হবে, তা আমরা কোনোদিনই ভাবিনে। তাই আমরা সযত্নে সব নিজের জন্যে সঞ্চয় করে যাই, কাউকে কিছু দিতে চাইনে। এই কৃপণতা, স্বার্থপরতা আমাদের উদার হতে দেয় না, দানশীল হতে শেখায় না। যদি শেষ মুহূর্তেও মানুষের একটু চৈতন্য হয়, দান-ধ্যানে একটু প্রবৃত্তি হয়, তা হলেও সে কৃতার্থ হয়ে যেতে পারে। দরকার স্বার্থপরতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা, পরার্থপরতায় নিজেকে নিযুক্ত করা। তার জন্যে আবার দরকার জীবনের অনিত্যতা বোধ এবং সে-বোধ এনে দেন সদ্গুরু বা এই গল্পের ফকিরবেশী মহাত্মা।

সব ঠাকুরের, ঠাকুরটি আমার

এক সাধু, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সামনে দেখলেন এক বাগানবাড়ী, মার্বেল পাথরে তৈরি। বাড়ির সামনে যেতেই মালিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মালিককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "রাজামশাই, এই বাড়ি কার? আপনার?" রাজা বললেন : "না ভাই, এ বাড়ি আমার ঠাকুরের।" সাধু আবার জিজ্ঞাসা করলেন : "এমন সুন্দর বাগানখানি কার? আপনার?" রাজা বললেন : "না ভাই আমার নয়, বাগান আমার ঠাকুরের।" বাগানের মধ্যে এক স্বচ্ছ সরোবর দেখে সাধু জানতে চাইলেন : "রাজামশাই, এ সরোবরটি কার?" রাজা বললেন : "এ সরোবর আমার ঠাকুরের।" ঘুরতে ঘুরতে এক চমৎকার মন্দিরের কাছে এসে সাধু আবার জিজ্ঞাসা করেন রাজা বলেন সবকিছুই তাঁর ঠাকুরের। শেষে যখন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে দেববিগ্রহের দর্শন মিলল, তখন সাধু আবার প্রশ্ন করলেন : "আচ্ছা রাজামশাই, এ ঠাকুরটি কার?" এবার রাজা বললেন : "ঐ ঠাকুরটিই তো আমার। সবকিছু ঠাকুরের, কেবল ঠাকুরটিই হলেন আমার।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

সংসারে আমরা নিজেরাই মালিক হয়ে বসি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, এই অহংকারে মত্ত হয়ে আমাদের দিন কেটে যায়। কিন্তু ভক্ত যে, সে দেখে তার নিজের বলতে যা-কিছু সবই হল ভগবানের, একমাত্র ভগবানই হলেন তার। এইভাবে ভগবানকে সে আপন করে নেয়। তখন সংসারের কোনো আবিলতা আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করেই ভক্ত তখন পরম আনন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকে।

উল্‌টে যাও

এক পণ্ডিত অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছেন, কিন্তু মনে তার বড় অশান্তি। তিনি এক সাধুর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "বাবা, আমি তো কত শাস্ত্র পড়লাম, কিন্তু তবু আমার মনে শান্তি মিলল না। কিসে শান্তি পাব আমাকে বলে দিন।" সাধু বললেন ঃ "আগে তুমি নদীতে স্নান করে এসো, তারপর তোমায় বলব কিসে শান্তি পাবে।"

পণ্ডিত নদীতে গেলেন স্নান করতে, এমন সময় একটা মাছ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ওহে পণ্ডিত, আমি জলে থাকি, জলও খাই, কিন্তু তবু আমার পিপাসা মেটে না। তুমি তো অনেক শাস্ত্র পড়েছ, এর কোনো উপায় বলতে পারো?" পণ্ডিত বললেন ঃ "তোমার গলার দুপাশে কানকোর যে দুটো ফুটো রয়েছে, তুমি জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই তোমার পিপাসা মেটে না। তুমি এক কাজ করো। জল মুখে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি উল্‌টে যাও তাহলে আর জল বেরিয়ে যাবে না, কিছুটা অন্তত তোমার পেটে যাবে আর তাতে তোমার তৃষ্ণা মিটবে।" এই বলে পণ্ডিত স্নান সেরে সাধুর কাছে এসে বললেন ঃ "এবার আমাকে বলুন কিসে আমার শান্তি মিলবে।'

সাধু বললেন ঃ "ভাই, তুমি মাছকে যে উপদেশ দিয়েছ, ঐ একই উপদেশ তোমার পক্ষেও খাটবে। তুমিও উল্‌টে যাও। মাছের মতো তুমিও তো শাস্ত্র-সমুদ্রে ডুবে রয়েছ, কিন্তু শাস্ত্রের বাণী তোমার পেটে ঢুকছে না, তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করছে না। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই তা বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃষ্ণা মিটছে না, তুমি শান্তি পাচ্ছ না। তাই আমার উপদেশ, তুমিও মাছের মতো উল্‌টে যাও, অন্তর্মুখী হও, তাহলেই তোমার তৃষ্ণা মিটবে, তুমি শান্তি পাবে।"

☆ ☆ ☆

শুধু পাণ্ডিত্যে ভগবানকে লাভ করা যায় না, শান্তি মেলে না। শাস্ত্রের বাণী যাতে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে তার জন্যে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে হয়, সংসারমুখী মনকে ঈশ্বরমুখী করতে হয়। এইভাবে মনকে উল্‌টে দিতে পারলে তবেই সব সোজা হয়ে যাবে, জীবনে শান্তি মিলবে। এই উল্‌টে যাওয়ার নামই 'আবৃত্তচক্ষু' হওয়া, দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়া বাহির থেকে ভিতরে। বাইরে শাস্ত্রবচন শুনে বা জেনে কী হবে, যদি তা ভিতরে না যায়? শান্তিলাভ হয় শুধু উপলব্ধিতে, অনুভূতিতে। তা হল অন্তরের জিনিস। যোগীরা শরীরটাকে উল্‌টে শীর্ষাসন করেন, জিবকে উল্‌টে খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করেন। সব সাধনই উল্‌টে যাওয়ার সাধন এবং তাতেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্‌টে দিলেই সব সোজা হয়ে যায়, আমাদের এই সোজাটাই আসলে উল্‌টো। একে ঘুরিয়ে দিতে হবে ভগবানের দিকে।

ধৈর্য ধরো তালভঙ্গ যেন না হয়

এক রাজা ভয়ানক কৃপণ। একদিন তাঁর রাজসভায় এক নট আর এক নর্তকী এসে বলল ঃ "মহারাজ, আপনি হুকুম দিন, আমরা আপনার সামনে নাচ-গান করে দেখাই।" রাজা দেখলেন এদের তো তাহলে টাকা দিতে হবে, তাই তিনি হুকুম দিতে চাইলেন না। কিন্তু রাজার মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ নাচ-গানের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন। তাঁরা তখন রাজাকে বললেন ঃ "মহারাজ, এতে আপনার কোনো খরচ হবে না। যারা এদের অনুষ্ঠান দেখবে তারাই এদের বকশিস দেবে, আপনি শুধু দয়া করে অনুমতি দিন।" রাজা তখন রাজী হয়ে অনুমতি দিলেন।

সন্ধ্যেবেলা নট আর নর্তকী তাদের অনুষ্ঠান শুরু করল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, রাত পোহাতে তখন আর বেশি বাকি নেই, কিন্তু তখনো পর্যন্ত তারা একটি পয়সাও বকশিস পেল না। তখন নর্তকী নাচের তালে তাল রেখে নটকে এই দোঁহাটি শুনিয়ে দিল ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাত দো ঘড়ী রহ্ গয়া, থক্ গয়া পিঞ্জর আজ।
কহে নটী সুন্ বামদেব খালী তাল বাজ।।

—'সন্ধ্যে থেকে আমরা নাচ-গান করছি, রাত পোহাতে আর মোটে ঘণ্টা দুই বাকি, অথচ এখন পর্যন্ত একটা কানাকড়িও মিলল না। একদিকে দেহ-পিঞ্জর যে অবশ হয়ে গেল। শোনো বামদেব, তুমি কেন আর শুধু শুধু তাল বাজিয়েই চলেছ?"

সঙ্গীনীর এই দোঁহা শোনামাত্র নটও তার গানের তালে তালে নটীর দোঁহার জবাব দিল ঃ

বহুৎ গয়ী থোড়ী রহী, থোড়ী ভী অব্ জায়।
কহে নট সুন্ নায়িকা, তালমে ভঙ্গ্ না পায়।।

—"রাতের বেশির ভাগটাই তো কেটে গেল, রাত পোহাতে আর সামান্যই বাকি। এই সময়টুকুও এখনই কেটে যাবে। তাই বলি ওরে নায়িকা, এখন আর তালভঙ্গ করিসনে, তুই নেচে চল্।"

ওখানে এক সাধু বসে ছিলেন। শীত কাটাবার জন্যে একখানি কম্বল ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কিছুই ছিল না। যেই নট এ দোঁহাটি শুনিয়েছে অমনি সাধুটি তাঁর একমাত্র সম্বল কম্বলখানি নটকে দিয়ে দিলেন। রাজপুত্র নিজের জড়োয়ার চূড় খুলে নটকে দিল আর রাজকন্যা দিল নিজের গলার বহুমূল্য হার। রাজা তো অবাক। নটের দোঁহা থেকে কী বুঝল এরা যে তাকে এভাবে সব দিয়ে দিল? রাজা তখন প্রথমে সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনার তো একমাত্র কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি কম্বলখানা কী বলে ওকে দিতে গেলেন?"

সাধু বললেন ঃ "রাজামশাই, এই নটের দোঁহায় আমার কী যে উপকার হয়েছে কী বলব? সারা জীবন আমি সাধন-ভজন নিয়েই কাটিয়েছি। আমার জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। এখন এই নাচ-গান দেখে ভাবছিলাম, আহা! যদি আপনার মতো রাজত্ব পেতাম তাহলে এমনি নাচ-গান উপভোগ করে কী আনন্দেই না জীবন কাটাতে পারতাম। এমন সময় নটের এই দোঁহাটি শুনে আমার চৈতন্য হল। মনে হল, তাইতো! সারা জীবন তপস্যায় কাটিয়ে এখন এই যাবার বেলায় কিনা আমার মনে ভোগবাসনা জাগল! সারা জীবনের তপস্যা যে তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখনই ঠিক করলাম এসব ভাবনা আমাকে ছাড়তেই হবে, আর যেন আমার এমন তালভঙ্গ কখনো না হয়। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওকে দেবার মতো কিছুই আমার ছিল না, তাই আমি আমার একমাত্র সম্বল কম্বলখানা ওকে দিয়ে দিলাম।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাজা তখন রাজপুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমার হাতের জড়োয়া চূড় তুমি নটকে দিলে কেন?" রাজপুত্র বলল ঃ "বাবা, আপনি যদি অপরাধ না নেন তবে বলি। আমি বড়ো হয়েছি অথচ নিজের ইচ্ছেমতো কিছু খরচ করতে পারিনে কারণ আপনি আমাকে টাকা-পয়সা কিছুই দিতে চান না। তাই আমার মনে এই পাপচিন্তা ঢুকেছিল যে আজ রাতে আপনাকে খুন করে আমি রাজসিংহাসন দখল করে নেব আর তাহলে নিজের খুশিমত সব ভোগ করতে পারব। এমন সময় নটের দোঁহা শুনে আমার মনে হল, আরে, বাবা তো বুড়ো হয়েছেন, এমনিতেই তো তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে, আর কতদিনই বা তিনি বাঁচবেন? তখন রাজত্ব তো আপনিই আমার হাতে এসে যাবে। তবে এখন আর তালভঙ্গ করে পিতৃহত্যার পাপে লিপ্ত হই কেন? অনেক দিন তো কাটল, আর কটা দিনও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। নটের দোঁহাতেই আমার হুঁশ হল আর পিতৃহত্যার পাপ থেকেও রেহাই পেলাম, তাই আমার হাতের চূড় দিয়েছি।

শেষে রাজা তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হ্যাঁ মা, তুমি আবার কেন গলার হার খুলে ঐ নটকে দিতে গেলে?" রাজকন্যা বলল ঃ "বাবা আপনি আমার অপরাধ যদি ক্ষমা করেন তাহলে বলি।" রাজা বললেন ঃ " কোনো ভয় কোরো না, নির্ভয়ে বলো।" তখন রাজকন্যা বলল ঃ "বাবা, আমার এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু টাকা খরচের ভয়ে আপনি আমার বিয়ে দিচ্ছেন না। তাই আমি ঠিক করেছিলাম যে কাল আমি মন্ত্রীর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কুলত্যাগ করব। এমন সময় নটের দোঁহা শুনে মনে হল যে বাবার বয়স হয়েছে, এখন আমি যদি কুলত্যাগ করি তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর নামে কলঙ্ক রটবে। তাই ভাবলাম এতদিন যদি কাটাতে পেরে থাকি তবে আর কটা দিনও কাটিয়ে দিতে পারব। বাবা তো বেশিদিন বাঁচবেন না, কেন তবে তাঁর মনে দুঃখ দিই, তালভঙ্গ কেন করি? নটের দোঁহা শুনে এই কথাগুলো মনে হল বলে আমি গলার হার খুলে তাকে দিয়েছি।"

তিনজনের তিনরকম কথা শুনে রাজার মনেও তখন বৈরাগ্য জাগল। রাজা ভাবলেন, আমার তো মরণ ঘনিয়ে এসেছে, তবে কার জন্যে এত কৃপণতা করছি? রাজা তখন রাজপুত্রদের হাতে রাজ্যের ভার তুলে দিলেন আর রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে নিজে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

নটের একটি দোঁহাতে সাধু, রাজপুত্র, রাজকন্যা ও রাজা, এই চারজনের মনেই বৈরাগ্যের উদয় হল। একই কথা কার মনে কীভাবে কাজ করে কেউ বলতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

হতাশা হল সাধনপথের একটি বড়ো বাধা, যাকে শাস্ত্রে বলেছেন 'নির্বেদ'। অনেকদিন ধরে সাধন-ভজন করবার পরেও যখন সাধক দেখে যে সে তার অভীষ্ট পথে অগ্রসর হতে পারছে না, তখন স্বভাবতই সে হতাশ হয়ে পড়ে। অনেকে এই সময় সাধন-ভজন ছেড়ে দিয়ে পূর্বজীবনের কামনা-বাসনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। হতাশাগ্রস্ত এইসব সাধকদের প্রতি তাই মহাজনদের উপদেশ, তাল যেন ভঙ্গ না হয়, যেন তাল না কেটে যায়। ধৈর্য ধরে লেগে থাকো, 'অনির্বিণ্ণচেতা' হয়ে সাধন করে যাও, কে জানে তুমি হয়তো সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তেই এস পৌঁছেছ। তাই তালভঙ্গ কোরো না, অচিরেই তোমার সিদ্ধিলাভ হতে পারে।

এই উপদেশ যে শুধু সাধকদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য তা নয়, সংসারীদের কাছেও এর অপরিসীম মূল্য রয়েছে। সংসারে নানা কারণে আমরা যখন অধৈর্য হয়ে পড়ি, তখন প্রায়ই আমাদের জীবনের ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়, তাল কেটে যায়। তাই 'তালভঙ্গ কোরা না, ধৈর্য ধরো' এই উপদেশ যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মনে রাখতে পারি তাহলে সংসারের অনেক অশান্তির হাত থেকেই আমরা রক্ষা পাব।

ভাগবতের পণ্ডিত

এক সৈনিক ঘোড়ায় চেপে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পেল পথের ধারে এক মাঠে মানুষের ভিড় জমেছে। ভিড় দেখে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ "এখানে এত ভিড় কিসের?" তখন একজন বলল ঃ "এখানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে কিনা, তাই এত ভিড়।" তাই শুনে সৈনিক ঘোড়া থেকে নামল এবং ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ভাগবতকথা শুনতে গেল। ভাগবতের পণ্ডিত তখন বলছে ঃ "জগৎ-সংসার সব মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।" কথাটি কানে যেতেই সৈনিকের বৈরাগ্য এসে গেল আর সে তখনই তার ঘোড়া বেচে দিয়ে ফকির হয়ে চলে গেল।

তারপর পনর বছর কেটে গিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে সেই ফকির একদিন আবার সেই ময়দানে এসে পৌঁছল। সে দেখল এখনো সেই আগেকার মতোই ভিড় জমেছে। তাই দেখে সে একজনকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "এখানে এত ভিড়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেন বলো তো।" লোকটি বলল : "এখানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তাই শুনতে লোক জমেছে।" ফকির তো শুনে অবাক। "এখনো সেই ভাগবত পাঠ?" লোকটি বলল : "হ্যাঁ, একজন পণ্ডিত আজ কুড়ি বছর ধরে এখানে ভাগবতকথা শোনাচ্ছেন আর তা শুনতে রোজই এরকম ভিড় হয়।"

ফকির তখন পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল : "মশাই, আমার তো এক চাপড়েই চৈতন্য হল আর সেই এক চাপড়েই আমি এই মিথ্যে সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর আপনি নিত্য নিত্য এত চাপড় খাচ্ছেন, তবু আপনার চৈতন্য হল না?"

☆ ☆ ☆

নানারকম শাস্ত্রপাঠ করে বা শাস্ত্রপাঠ শুনে আমরা মনে করতে পারি যে, মুক্তি আমাদের করতলগত। কিন্তু সে ধারণা ভুল। মুক্তি এত সহজ কথা নয়। আসল কথা হল চৈতন্যের জাগরণ। জন্ম-জন্মান্তরের অশুভ সংস্কারে আমাদের চিত্ত মলিন হয়ে আছে। সেই মলিন চিত্তের মালিন্য যতক্ষণ না দূর হচ্ছে, যতক্ষণ না 'দিল্ সাফ' হচ্ছে ততক্ষণ হাজার উপদেশেও কোনো ফল হবে না। চোট্টা লাগা চাই, চাপড়টা খাওয়া চাই অর্থাৎ ভিতরে গিয়ে ঘা দেওয়া চাই। কার্যক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় যে কারুর সেটা এক চোটেই হয়ে যায়, কারুর হাজারো চোটেও কিছু হয় না। এর কারণ হল চিত্তশুদ্ধির তারতম্য। চিত্ত বা মন যত শুদ্ধ হবে, তত মনের তারে বেজে উঠবে শাস্ত্র ও মহাজনের উপদেশের মর্মবাণী।

মারো মারো মারো

গুরুর বাগানে শিষ্য একটা গাছ লাগিয়েছে। সেবা-যত্নে গাছটা যখন একটু বড়ো হল তখন শিষ্যের আর আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা গরু এসে গাছটা খেয়ে ফেলল। তাই দেখে শিষ্য তো রেগে আগুন। সে তখন একটা লাঠি তুলে নিয়ে গরুটাকে দু-চার ঘা দেবে বলে তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। এমন সময় গুরু চীৎকার করে বললেন : "মারো মারো মারো।"

গুরুর কথা কানে যেতেই শিষ্য হাত থেকে লাঠিখানা ফেলে দিয়ে গুরুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করল। অন্য যেসব লোক সেখানে বসে ছিল, তারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন শিষ্যকে বলতে লাগল ঃ "এ তোমার কেমন ধারা গুরুভক্তি? তুমি নিজেই যখন গরুটাকে মারবে বলে ছুটছিলে আর গুরু যখন বললেন 'মারো মারো মারো', ঠিক তখনই তুমি গুরুর আদেশ অমান্য করলে?"

শিষ্য বলল ঃ "ভাই, আমি তো গুরুর আদেশ অমান্য করিনি। গুরু যাকে মারতে আদেশ করলেন তাকেই তো আমি মেরেছি।" সবাই শুনে অবাক হয়ে গেল, এ আবার বলে কী! শিষ্য তখন বলতে লাগল ঃ "গুরুদেব তো গরুকে মারতে বলেননি। গরুকে তো আমি নিজেই মারতে যাচ্ছিলাম, তবে আবার তিনি কেন বলতে যাবেন 'গরুকে মারো'? গুরুদেবের কথা তোমরা বুঝতে পারো নি। তিনি বলেছেন, 'তোমার ভিতরে যে ক্রোধ জেগেছে, সেই ক্রোধকে তুমি মারো'। নইলে গরুর খাদ্য গরুতে খাবে। এতে বলবার কী আছে? গরুর কি জ্ঞান আছে যে তাকে মারলে সে ন্যায়-অন্যায় বুঝবে? আমার গরুকে মারলেই কি গাছটা আবার ফিরে পাওয়া যাবে? তবে আর অনর্থক তাকে মেরে লাভ কী? তাই 'মারো মারো মারো' বলে গুরুদেব আমাকে ক্রোধ ত্যাগ করতেই বলেছেন।"

☆ ☆ ☆

এই গল্পে অধিকারী আর অনধিকারীর মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। অধিকারী শিষ্য সদ্‌গুরুর ইঙ্গিতমাত্র তাঁর উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। সদ্‌গুরু অনেক সময় এমন বিপরীত রীতিতে কথা বলেন যে তার আপাত অর্থ ধরলে অনর্থই ঘটে যায়, অথচ তার ভিতরে এক গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে থাকে, যাতে শিষ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। সেটি ধরতে পারাই যথার্থ সৎশিষ্যের লক্ষণ। যেমন গুরু বললেন ঃ 'দিনে চন্দ্র, রাতে সূর্য', যা আপাতদৃষ্টিতে একান্তই অর্থহীন পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে, অথচ এর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রাণ-সাধনার একটি গভীর সংকেত দিয়ে দিলেন। 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'।

ভিখিরীর জমিদারি

এক ভিখিরী লোকের দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করে বেড়াত, কিন্তু এমনই তার কপাল যে দু'মুঠো অন্নও তার জুটত না, কেবল লোকের কাছে গলাধাক্কা খাওয়াই তার সার হত। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে যখন প্রাণ যায় যায়, এমন সময় এক মহাপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভিখিরীর দুঃখের কথা শুনে মহাপুরুষের বড়ো দয়া হল। তিনি বললেন ঃ "আহা! তোমার এত কষ্ট। তা দেখো বাছা, দেশের রাজা হলেন আমার শিষ্য। আমি একখানা চিঠি লিখে তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি সেই চিঠিখানা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো, তাহলে অনেক ভিক্ষা মিলবে।" এই বলে তিনি তাকে চিঠি লিখে দিলেন, ভিখিরীও সেই চিঠি নিয়ে রাজবাড়িতে গেল।

রাজার গুরুদেব চিঠি দিয়েছেন, তাই দারোয়ানরা ভিখিরীকে রাজবাড়ীতে ঢুকতে বাধা দিল না। ভিখিরি তখন সোজা রাজসভায় ঢুকে রাজার হাতে চিঠি দিল। রাজা দেখলেন স্বয়ং গুরুদেব চিঠি লিখেছেন, একে তো আর সামান্য কিছু দিয়ে বিদেয় করা চলে না। তাই তিনি মন্ত্রীকে বললেন ঃ "একটা ভালো জমিদারি ঠিক করে এর নামে দলিলপত্র লিখে দাও।" দলিল তৈরি হল। রাজা তখন ভিখিরীকে বললেন ঃ "এই জমিদারি তোমাকে দিলাম, এই নাও তার দলিল।" এই বলে রাজা তার হাতে দলিল তুলে দিলেন।

ভিখিরী রাজার সামনেই দলিলখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল ঃ "আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?" আমি না খেতে পেয়ে মরছি, কোথায় আমাকে দুটি খেতে দেবেন, তা না করে আপনি আমার হাতে একখানা কাগজ ধরিয়ে দিলেন! এই কগজে কি আমার পেট ভরবে?"

☆ ☆ ☆

উপযুক্ত হলে, প্রকৃত অধিকারী না হতে পারলে আসল বস্তু লাভ করলেও তার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। জহুরী ছাড়া অন্য কেউ যেমন মণিমাণিক্যের মর্ম বোঝে না, অনধিকারীর কাছে শাস্ত্র বা গুরুবাক্যও তেমনি ব্যর্থ হয়ে যায়। অনধিকারী কোনো মূল্যই দেয় না অমূল্য বস্তুর, হাতে পেয়েও তা খুইয়ে বসে, নিজের হাতেই তা নষ্ট করে ফেলে। সবচেয়ে আগে তাই দরকার অধিকার-অর্জন, যার এক নাম চিত্তশুদ্ধি-সাধন। নইলে রাজার দরবারে গিয়ে সব পেয়েও শূন্য হাতে ফিরতে হয়, গুরু তার সর্বস্ব দিয়ে দিলেও শিষ্য কিছুই পায় না।

এপার-ওপার

একটি লোক গঙ্গার ধারে এসে শুনতে পেল মাঝি সবাইকে ডেকে বলছে ঃ "পারে যাবে গো, পারে যাবে?" লোকটির মনে কিছুটা বৈরাগ্য জেগেছিল। মাঝির ডাক শুনতে পেয়ে সে ভাবল, আমিও তো পারেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেতে চাই, দিনরাত ভগবানকে বলি, ঠাকুর আমায় পার করো। আজ বুঝি সেই সুযোগ এসে গেল। মাঝি যখন পারে নিয়ে যেতে চাইছে তখন এদের সঙ্গেই পারে যাই না কেন? এই ভেবে সে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ভাই তোমরা কোথায় যাবে?" মাঝি বলল ঃ "পারে যাব।" লোকটি তখন মাঝিকে বলল ঃ "আমিও তোমাদের সঙ্গে পারে যাব।"

যাত্রীদের সঙ্গে এই লোকটিও পারে গিয়ে নামল, কিন্তু এখানেও সে দেখল অনেক লোক ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ভাই তোমরা কোথায় যাবে?" তারাও বলল ঃ "পারে যাব।" লোকটি তখন বলল ঃ "আমাকেও তাহলে তোমাদের সঙ্গে পারে নিয়ে চলো।" এই বলে সে আবার নৌকায় চেপে তাদের সঙ্গে ওপার থেকে এপারে এসে পৌছল।

এইভাবে বার কয়েক এপার-ওপার করবার পর তার চিন্তা হল পার তবে কোনটা? সে দেখতে পেল গঙ্গার ধারে এক সাধু বসে আছেন। তার মনে হল ইনি হয়তো পারের সন্ধান বলে দিতে পারবেন। তাই সে সাধুটির কাছে গিয়ে বলল ঃ "বাবা, পার কোথায় আমাকে বলে দেবেন? আমি পারে যেতে চাই, কিন্তু পার খুঁজে পাচ্ছিনে। এপারে আসছি, শুনি লোকে বলছে পারে যাব। ওপারে যাচ্ছি, সেখানেও লোকে বলছে পারে যাব। পার যে কোনটা কিছুই আমি ঠিক করতে পারছিনে। একবার এপার থেকে ওপার যাচ্ছি, আবার ওপার থেকে এপারে আসছি। কেবল ছুটোছুটিই সার হচ্ছে, পার আর মিলছে না।" লোকটির কথা শুনে সাধু তাকে এই দোঁহাটি শোনালেন ঃ

পার কহতে হেঁ ওপারকো, ওপার কহতে হেঁ পার।
পকড় কিনারা বৈঠ্ রহো, এহি পার এহি ওপার।।

—এপার-ওপার বলে কিছু নেই, এপারও যা ওপার তাই। যেকোনো একটা পারের কিনারা ধরে বসে পড়ো, বৃথা ছুটোছুটি করে ম'রো না।

☆ ☆ ☆

মানুষের মন বড়ো অস্থির, কোথাও সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। কোথাও হয়তো সৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে শুনে সে ছুটে গেল সেখানে, কিন্তু দু'দিনেই তার সব উৎসাহ ফুরিয়ে গেল, তখন সে গিয়ে ছুটল আর এক আড্ডায়। এমনিভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটোছুটি করে, নানা ঘাটের জল খেয়ে, নানান জনের নানা উপদেশ আত্মস্থ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। তাই মহাজনেরা বলেন, গুরুর কাছে যা পেয়েছ, এক জায়গায় বসে তাই সাধন করে যাও। যা চাও তা সেখানেই পাবে, বৃথা এখানে-সেখানে ছুটোছুটি করে ম'রো না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুয়োর জল

দুজন লোক এক সাধুর কাছে গিয়ে বলল : "বাবা, আমাদের গাঁয়ে বড়ো জলকষ্ট। গাঁয়ের মধ্যে কোনো কুয়ো নেই, জলের অভাবে তৃষ্ণায় আমরা মরছি। আপনি একটা কিছু উপায় বলে দিন।" সাধু বললেন : "তোমরা একটু পরিশ্রম করলেই তো তোমাদের জলকষ্ট ঘুচতে পারে। তোমরা যদি নিজের নিজের গ্রামে একটা করে কুয়ো খুঁড়ে নাও তাহলেই তো তোমরা ইচ্ছেমতো জল পেতে পারো। তাতে তোমাদের জলের অভাব ঘুচবে, তোমরা শান্তি পাবে।" সাধুর কথা শুনে লোক দুটি নিজেদের গ্রামে ফিরে গেল।

কদিন বাদে তারা আবার এল সাধুর কাছে। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন : "কি গো, তোমাদের কুয়ো খোঁড়া হল? জল মিলল?' একজন বলল : হ্যাঁ বাবা, আপনার আশীর্বাদে খুব সুন্দর কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। এখন আর আমাদের জলের কোনো কষ্ট নেই, ইচ্ছেমতো যখন খুশি আমরা জল পাচ্ছি।" আর একজন বলল : 'বাবা, আমার কুয়োতে এখনো জল মিলল না।" শুনে সাধু অবাক হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন : "সে কি কথা! এতদিন ধরে খুঁড়লে, তবু জল পেলে না? তুমি কী করে খুঁড়েছ আমাকে বলো দেখি।" তখন লোকটি বলল : "আমি এক জায়গায় তো বেশি খুঁড়িনি। খানিকটা খোঁড়ার পর যখন দেখলাম জলের দেখা নেই, তখন সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় খুঁড়তে শুরু করলাম। এইভাবে সারা মাঠ খুঁড়ে ফেললাম, তবু জল মিলল না।" সাধু বললেন : "আরে, তুমি করেছ কী? ধৈর্য ধরে এক জায়গার মাটি খুঁড়বে তো। তা না করে নানা জায়গায় একটু একটু করে মাটি খুঁড়লে সারা জীবনেও তুমি জলের দেখা পাবে না, তোমার তৃষ্ণারও শান্তি হবে না।"

* * *

নিষ্ঠা সাধনপথের এক বড়ো সহায়। শান্তিলাভের আশায় নানা জায়গায় ছুটোছুটি করলে শান্তি মেলে না, পিপাসা মেটে না। সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভ করে এবং একমাত্র সেইটি অবলম্বন করে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারলে সিদ্ধিলাভ করা যায়, তাতেই পিপাসা মেটে, শান্তি মেলে। আমরা চাই দুদিনেই সিদ্ধিলাভ করতে, তাই দুদিন সাধন করেই কোনো ফল না পেয়ে তা ছেড়ে দিই, আবার অন্য সাধনের মন দিই বা এক গুরুকে ছেড়ে আর এক গুরুর কাছে ছুটে যাই। আমাদের তাই ছুটে মরাই সার হয়, পিপাসার জল আর মেলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না। দরকার তাই ধৈর্য আর নিষ্ঠা। সাধন অভ্যাস প্রসঙ্গে পাতঞ্জল যোগদর্শনে তাই বলেছেন ঃ 'স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য-সৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ', অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর নিয়মিত সৎকার অর্থাৎ আদরের সঙ্গে, পরম যত্নে অভ্যাস করলে তবেই তা দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ পাকাপোক্ত হয় এবং সুফল প্রসব করে।

গর্ভাবস্থায় সংস্কার

এক রানী গর্ভাবস্থায় নিজের মহলের বারান্দায় বসে সময় কাটাতেন। সেই বারান্দার সামনে একটা মাঠ ছিল, সেই মাঠে ধোপারা কাপড় কাচত আর রাণী তাই চেয়ে চেয়ে দেখতেন। কিছুদিন পর রানীর এক ছেলে হল, কিন্তু ছেলে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবে ধোপার লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। সে যেখানে কাপড় পায় টেনে নিয়ে কাচতে শুরু করে, বারণ করলেও শোনে না। রাজার ঘরের ছেলের এই স্বভাব দেখে রাজা-রানী দুজনেরই মনে বড় দুঃখ হল।

একদিন রাজা রানীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আচ্ছা রাণী, আমাদের ছেলের এমন স্বভাব হল কেন বলতে পার?" রানী বললেন ঃ "মহারাজ, ছেলে হবার আগে আমি যখন বারান্দায় বসে থাকতাম তখন সব সময় দেখতাম সামনের মাঠে ধোপারা কাপড় কাচছে। আমার গর্ভের সন্তানের উপর ধোপাদের সেই সংস্কার পড়েছে বলেই হয়তো আমাদের ছেলের এই অবস্থা হয়েছে।"

☆ ☆ ☆

গর্ভাবস্থায় মায়েরা যে পরিবেশে সময় কাটান, যেসব ভাব নিয়ে তাঁরা মগ্ন থাকেন, যেসব সঙ্গে তাঁরা আনন্দ পান, সেই পরিবেশ, সেই ভাব, সেই সঙ্গ তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মায়ের ভিতরে যে সংস্কার প্রবল বা প্রধান থাকে, শিশু তাঁর গর্ভে থাকাকালীন সেই সংস্কারই আপনা-আপনি সঞ্চারিত হয়ে যায় সেই শিশুতে। তাই মাকে এই সময় সজাগ থাকতে হয়, শুভ সংস্কার জাগিয়ে তুলতে হয়, সদ্ভাবে মনকে ভরিয়ে রাখতে হয়। তাতেই অনাগত শিশুর অশেষ কল্যাণ, নইলে অশেষ দুর্গতি। এই কারণেই আমাদের দেশের প্রবীণরা গর্ভবতীদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুয়োর জল

দুজন লোক এক সাধুর কাছে গিয়ে বলল : "বাবা, আমাদের গাঁয়ে বড়ো জলকষ্ট। গাঁয়ের মধ্যে কোনো কুয়ো নেই, জলের অভাবে তৃষ্ণায় আমরা মরছি। আপনি একটা কিছু উপায় বলে দিন।" সাধু বললেন : "তোমরা একটু পরিশ্রম করলেই তো তোমাদের জলকষ্ট ঘুচতে পারে। তোমরা যদি নিজের নিজের গ্রামে একটা করে কুয়ো খুঁড়ে নাও তাহলেই তো তোমরা ইচ্ছেমতো জল পেতে পারো। তাতে তোমাদের জলের অভাব ঘুচবে, তোমরা শান্তি পাবে।" সাধুর কথা শুনে লোক দুটি নিজেদের গ্রামে ফিরে গেল।

কদিন বাদে তারা আবার এল সাধুর কাছে। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন : "কি গো, তোমাদের কুয়ো খোঁড়া হল? জল মিলল?' একজন বলল : হ্যাঁ বাবা, আপনার আশীর্বাদে খুব সুন্দর কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। এখন আর আমাদের জলের কোনো কষ্ট নেই, ইচ্ছেমতো যখন খুশি আমরা জল পাচ্ছি।" আর একজন বলল : 'বাবা, আমার কুয়োতে এখনো জল মিলল না।" শুনে সাধু অবাক হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন : "সে কি কথা! এতদিন ধরে খুঁড়লে, তবু জল পেলে না? তুমি কী করে খুঁড়েছ আমাকে বলো দেখি।" তখন লোকটি বলল : "আমি এক জায়গায় তো বেশি খুঁড়িনি। খানিকটা খোঁড়ার পর যখন দেখলাম জলের দেখা নেই, তখন সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় খুঁড়তে শুরু করলাম। এইভাবে সারা মাঠ খুঁড়ে ফেললাম, তবু জল মিলল না।" সাধু বললেন : "আরে, তুমি করেছ কী? ধৈর্য ধরে এক জায়গার মাটি খুঁড়বে তো। তা না করে নানা জায়গায় একটু একটু করে মাটি খুঁড়লে সারা জীবনেও তুমি জলের দেখা পাবে না, তোমার তৃষ্ণারও শান্তি হবে না।"

* * *

নিষ্ঠা সাধনপথের এক বড়ো সহায়। শান্তিলাভের আশায় নানা জায়গায় ছুটোছুটি করলে শান্তি মেলে না, পিপাসা মেটে না। সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভ করে এবং একমাত্র সেইটি অবলম্বন করে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারলে সিদ্ধিলাভ করা যায়, তাতেই পিপাসা মেটে, শান্তি মেলে। আমরা চাই দুদিনেই সিদ্ধিলাভ করতে, তাই দুদিন সাধন করেই কোনো ফল না পেয়ে তা ছেড়ে দিই, আবার অন্য সাধনের মন দিই বা এক গুরুকে ছেড়ে আর এক গুরুর কাছে ছুটে যাই। আমাদের তাই ছুটে মরাই সার হয়, পিপাসার জল আর মেলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না। দরকার তাই ধৈর্য আর নিষ্ঠা। সাধন অভ্যাস প্রসঙ্গে পাতঞ্জল যোগদর্শনে তাই বলেছেন ঃ 'স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য-সৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ', অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর নিয়মিত সৎকার অর্থাৎ আদরের সঙ্গে, পরম যত্নে অভ্যাস করলে তবেই তা দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ পাকাপোক্ত হয় এবং সুফল প্রসব করে।

গর্ভাবস্থায় সংস্কার

এক রানী গর্ভাবস্থায় নিজের মহলের বারান্দায় বসে সময় কাটাতেন। সেই বারান্দার সামনে একটা মাঠ ছিল, সেই মাঠে ধোপারা কাপড় কাচত আর রাণী তাই চেয়ে চেয়ে দেখতেন। কিছুদিন পর রানীর এক ছেলে হল, কিন্তু ছেলে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবে ধোপার লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। সে যেখানে কাপড় পায় টেনে নিয়ে কাচতে শুরু করে, বারণ করলেও শোনে না। রাজার ঘরের ছেলের এই স্বভাব দেখে রাজা-রানী দুজনেরই মনে বড় দুঃখ হল।

একদিন রাজা রানীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আচ্ছা রাণী, আমাদের ছেলের এমন স্বভাব হল কেন বলতে পার?" রানী বললেন ঃ "মহারাজ, ছেলে হবার আগে আমি যখন বারান্দায় বসে থাকতাম তখন সব সময় দেখতাম সামনের মাঠে ধোপারা কাপড় কাচছে। আমার গর্ভের সন্তানের উপর ধোপাদের সেই সংস্কার পড়েছে বলেই হয়তো আমাদের ছেলের এই অবস্থা হয়েছে।"

☆ ☆ ☆

গর্ভাবস্থায় মায়েরা যে পরিবেশে সময় কাটান, যেসব ভাব নিয়ে তাঁরা মগ্ন থাকেন, যেসব সঙ্গে তাঁরা আনন্দ পান, সেই পরিবেশ, সেই ভাব, সেই সঙ্গ তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মায়ের ভিতরে যে সংস্কার প্রবল বা প্রধান থাকে, শিশু তাঁর গর্ভে থাকাকালীন সেই সংস্কারই আপনা-আপনি সঞ্চারিত হয়ে যায় সেই শিশুতে। তাই মাকে এই সময় সজাগ থাকতে হয়, শুভ সংস্কার জাগিয়ে তুলতে হয়, সদ্ভাবে মনকে ভরিয়ে রাখতে হয়। তাতেই অনাগত শিশুর অশেষ কল্যাণ, নইলে অশেষ দুর্গতি। এই কারণেই আমাদের দেশের প্রবীণরা গর্ভবতীদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতে বলতেন এবং সৎ আলোচনায় সৎভাবে সময় কাটাবার উপদেশ দিতেন আর এইভাবেই তাঁরা গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে শুভ সংস্কার গড়ে তুলবার চেষ্টা করতেন।

পূর্বজন্মের সংস্কার না সঙ্গদোষ

রাজা আর রানী তাঁদের মহলে বসে আছেন, সামনে এক পুকুর। এক রাখাল সেই পুকুরে গরুর পাল নিয়ে এল জল খাওয়াতে। তাঁরা দেখলেন, গরু যেমন করে জলে মুখ ডুবিয়ে জল খায়, রাখালও তেমনি মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। রাজা আশ্চর্য হয়ে রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ব্যাপার কী বলো তো! রাখাল গরুর মতো করে জল খাচ্ছে কেন? এ তার পূর্বজন্মের সংস্কার না সঙ্গদোষ?" রানী বললেন ঃ "এ পূর্বজন্মের সংস্কার নয়, এ হল সঙ্গের দোষ।" রাজা বললেন ঃ "কিছুতেই নয়, এ পূর্বজন্মেরই সংস্কার।" এই নিয়ে দুজনে কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। শেষে রাজা রেগে গিয়ে রানীকে রাজ্য থেকে দূর করে দিলেন।

রানী আর কী করেন? রাজার মেজাজ তিনি ভাল করেই জানতেন, দেখলেন, বলে কিছু ফল হবে না। তাই কথাটি না বলে রাজ্য ছেড়ে তিনি দূর বনে চলে গেলেন। বনে গিয়ে সেখানে রানী একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করালেন, তারপর সেই রাখালকে খুঁজে বের করে নিজের কাছে এনে তাকে ছেলের মতো প্রতিপালন করতে লাগলেন। সেইসঙ্গে তিনি রাখালের জন্যে এক পণ্ডিত ঠিক করে তাকে বেশ ভালো করে লেখাপড়া শেখালেন। এইভাবে রানীর স্নেহে আস্তে আস্তে রাখাল তার আগেকার জীবনের কথা ভুলে গেল এবং রানীকেই তার নিজের মা বলে জানল।

একদিন রানী রাখালকে বললেন ঃ "বাবা, এখন থেকে রোজ তুমি একবার করে রাজসভায় যেয়ো। সেখানে কথাবার্তা বেশি বলবে না, শুধু রাজার খবরাখবর, তাঁর হালচাল সব জেনে এসে আমাকে বলবে।" রানী জানতেন রাজা একজন খুব ভালো ঘোড়সওয়ার। তাই তিনিও তাঁর এই ছেলের জন্যে একটা তেজী ঘোড়া কিনে দিয়ে তাকেও এক মস্ত ঘোড়সওয়ার করে গড়ে তুলেছিলেন। মায়ের কথামতো রাখাল রোজ রাজসভায় যেতে লাগল। রানী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী। রোজই তিনি ছেলের কাছে রাজার খবর সংগ্রহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন। একদিন সে এসে বলল ঃ "মা, রাজা কাল বনে যাচ্ছেন শিকার করতে।" মা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "শিকারে তো যাবেন, কিসে যাবেন কিছু শুনেছ?" ছেলে বলল ঃ "হ্যাঁ মা, ঘোড়ায় চড়ে যাবেন।" শুনে রানী বললেন ঃ "যাক, ভালোই হল, তুমিও কাল শিকার করতে যেয়ো। তা তুমি এক কাজ কোরো, যাবার সময় তোমার যা-যা দরকার সবকিছু দুজনের মতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। দুজনের খাবার, দুখানা থালা, জল খাবার জন্যে দুটি গেলাস, দুখানা আসন, এমনকি দুখিলি পানও সঙ্গে নিতে ভুলো না। রাজার ঘোড়ার ঠিক পিছনেই তুমি থাকবে আর কোনোরকমে তাঁকে খুশী করতে চেষ্টা করবে। তারপর যেমন করে হোক তাঁকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। উনিই হলেন তোমার বাবা।" রানীর কথা শুনে রাখালের উৎসাহ শতগুণ বেড়ে গেল। পরদিন সে মায়ের কথামতো দুজনের উপযোগী সব জিনিসপত্র নিয়ে রাজার ঘোড়ার পিছু পিছু শিকারে রওনা হয়ে গেল।

রাজা, তাঁর মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র, পারিষদবর্গ যে যাঁর নিজের নিজের ঘোড়ায় চেপে শিকারে চলেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিলেন যে যাঁর সামনে কোনো জন্তু-জানোয়ার এসে পড়বে তিনিই তার দিকে ঘোড়া ছোটাবেন। হঠাৎ রাজার সামনে এক হরিণ এস পড়ল, রাজাও তৎক্ষণাৎ তাকে লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে রাখালও তাঁর পিছু পিছু নিজের ঘোড়া ছোটাল। হরিণটাকে তাড়া করে রাজা গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর চলে গেলেন, কিন্তু হরিণটাকে আর দেখতে পেলেন না। এদিকে রাজার লোকজন যে পিছনে কোথায় পড়ে রইল তারও কোনো হদিশ মিলল না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় রাজা তখন খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। তাই দেখে রাখাল বলল ঃ "মহারাজ, আপনি ঘোড়া থেকে নামুন, আমি আপনার জন্যে জল নিয়ে আসছি।" কাছে একটা কুয়ো ছিল, রাখাল সেই কুয়ো থেকে জল তুলে আনল, তারপর রাজার ও নিজের ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সে খাবার যোগাড় করতে লেগে গেল। রাখালের কাছে দুজনের খাবার মতো সব জিনিসই ছিল। সে তখন এক এক করে সব জিনিস বের করে একপ্রস্থ রাজার জন্যে সাজিয়ে দিল আর বাকিটা নিজে নিল।

বনের মধ্যে এমন পরিপাটি আহার পেয়ে রাখালের উপর রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন ছেলেটি কেমন হুঁশিয়ার, জঙ্গলে এসেও সব জিনিস কেমন গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আমারও কী সেবা-যত্নটাই না করল! রাজা তখন রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হ্যাঁ গো, তুমি কার ছেলে?"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাখাল বলল ঃ "আমি আমার মায়ের ছেলে। এই বনের মধ্যেই আমাদের বাড়ি, সেখানে আমি আর আমার মা থাকি।" রাজা বললেন ঃ "চলো তোমাদের বাড়ি একবার ঘুরে আসি।" রাজার কোনো সন্তানাদি ছিল না। তাই তাঁর মনে হল যে ছেলেটিকে তার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেব আর সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখে দেব। এমন বুদ্ধিমান ছেলে জঙ্গলে পড়ে থাকবে কেন?

রাখাল তখন নিজেদের বাড়িতে রাজাকে নিয়ে এল। রানী দেখলেন এতদিন পরে তাহলে রাজা এসেছেন তাঁর কাছে। তিনি তখন যত্ন করে নানা রকম রান্না করলেন, তারপর রাজাকে আর ছেলেকে পাশাপাশি বসিয়ে তাঁদের পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগলেন। রাজা অত্যন্ত সচ্চরিত্র, তিনি রাণীর মুখের পানে চোখ তুলে তাকাননি, কিন্তু পরিবেশনের সময় রানীর পায়ে তিল দেখে তিনি চমকে উঠলেন, আরে, এযে দেখছি আমার সেই রানী! তখন তিনি রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ " এ ছেলেটিকে তুমি কোথায় পেলে? একে তুমি আমাকে দিয়ে দাও, ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান, একে আমি রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমার কাছে রাখব।"

রাজার কথা শুনে রানী প্রথমে খুব হেসে উঠলেন, পরে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি জানেন কি এ ছেলেটি কে? এ সেই রাখাল যে গরুর মতো জলে মুখ ডুবিয়ে জল খেত। এখন সে এত বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর হয়েছে। কিন্তু কী করে হল জানেন? সঙ্গের গুণে। আমি একে সহবত শিখিয়েছি। শিক্ষার গুণে, সঙ্গের গুণে সে আজ এমন বুদ্ধিমান হয়েছে। মহারাজ, আপনি বলেছিলেন এর জন্মের দোষ আছে, পূর্বজন্মের সংস্কারে এ গরুর মতো জল খায়। আমি বলেছিলাম, কখনোই তা নয়, এর সঙ্গের দোষ ঘটেছে। গরুর সঙ্গে থেকে থেকে ও গরুর মতোই আচরণ শিখেছিল, গরুর মতো জলে মুখ ডুবিয়ে জল খেত। এখন দেখুন, সঙ্গের গুণে আজ ওর কীরকম উন্নতী হয়েছে।"

☆ ☆ ☆

মানুষের চরিত্র গঠনে সঙ্গের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সঙ্গদোষে কত নির্মল স্বভারের মানুষ যে অধঃপাতে গিয়েছে তার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নয়। তেমনি, অসৎ যারা, যাদের আমরা সবাই ঘৃণা করি, তারাও যে সৎসঙ্গের প্রভাবে সমস্ত মালিন্য ঝেড়ে ফেলে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত সংসারে দেখতে পাওয়া যায়। তাই কাউকে বিপথে যেতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখলে হাল ছেড়ে বসে থাকা ঠিক নয়, তার সেই অধোগতির স্রোত বন্ধ করতে সৎসঙ্গের প্রতি তার যাতে একটা আকর্ষণ জাগে সেই চেষ্টাই করা দরকার, কারণ—

সঙ্গৎসে গুণ উপজায়, সঙ্গৎসে গুণ জায়।
বাঁস ফাঁস মিসরী এক তৌল বিকায়।।

—সঙ্গ থেকেই গুণ জন্মায়, আবার সঙ্গ থেকেই গুণ চলে যায়। বাঁশের বা কঞ্চির টুকরো, সুতোর টুকরো মিছরির মধ্যে ঢুকে গিয়ে সব একই দামে বিকোতে থাকে। সংস্কারই তাই সব নয়, সংস্কারকেও বদলে ফেলা যায় সঙ্গের প্রভাবে। পশুভাবাপন্ন মানুষও দেবভাবাপন্ন হয়ে যেতে পারে সৎসঙ্গের প্রভাবে। শ্রীভগবানও তাই গীতায় বলেছেন 'সদুরাচার', অত্যন্ত দুরাচার পাপী লোকও ভগবানের ভজনের প্রভাবে 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা', অতি শীঘ্র 'ধর্মাত্মা', ধার্মিক হয়ে ওঠে।

ভিখিরী-বাদশা ত্রিমটলিঙ্গ

গ্রামের একটি গরীব লোক ভিক্ষে-সিক্ষে করে দিন কাটায়। সে ভাবল একবার যদি শহরে যেতে পারি তাহলে সেখানে ভালো ভিক্ষে মিলবে, খাওয়ার এত কষ্ট আর থাকবে না। এই মনে করে সে শহরের দিকে পা বাড়াল। শহরে ঢুকতে যাবে এমন সময় রাত হয়ে গেল আর ঠিক তখনই শহরে ঢুকবার দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। বেচারা কী আর করে, এত রাতে কোথায়ই বা যায়, তাই সে দরজার বাইরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে এক সাধু সেই দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন একটা লোক পায়ের উপর পা তুলে ঘুমোচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন লোকটার পায়ের তলায় রাজা হওয়ার একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সাধু ভাবলেন, লোকটার পায়ে তো রাজচিহ্ন দেখছি, তবে কেন সে রাজা না হয়ে রাস্তায় এভাবে শুয়ে রয়েছে? তখন তাঁর হুঁশ হল যে পায়ের উপর পা তুলে শোওয়া তো কাঙালের লক্ষণ। অমনি তিনি তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তিনবার লোকটার পায়ে ঠোকা মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা পা নামিয়ে নিল আর তখনই শহরে ঢুকবার দরজাও খুলে গেল। তখন শোনা গেল যে সেই দেশের বাদশা রাত্রিবেলা মারা গিয়েছেন আর দৈববাণী হয়েছে যে দরজার বাইরে যে শুয়ে রয়েছে সে-ই হল বাদশা হওয়ার উপযুক্ত লোক, তাকেই সিংহাসনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বসাতে হবে। তখন মন্ত্রী এসে লোকটিকে বাদশার প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল।

কাঙালের মতো পায়ের উপর পা তুলে শোওয়া যার অভ্যাস, তার সেই দোষ সেরে গেল সাধুর লাঠির তিনটি ঘায়ে আর তাই নতুন বাদশার নাম হল ত্রিমটলিঙ্গ।

কোনরকমে চেষ্টা না করেই পথের এক ভিখিরী যে বাদশা বনে গেল তার একটাই কারণ থাকা সম্ভব। সেই কারণটি হল তার পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার বা প্রারব্ধ। প্রারব্ধকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

☆ ☆ ☆

পূর্বজন্মের সংস্কার যে মিথ্যে নয় তার দৃষ্টান্ত সংসারে দেখতে পাওয়া যায়। গরীবের ছেলেকে হয়তো কোনো বড়লোক পোষ্যপুত্র নিল আর তার ফলে বিনা চেষ্টায় গরীবের ছেলে কোটিপতি হয়ে গেল। পড়াশুনোয় কোনো ছেলের মোটেই মন বসে না, শত চেষ্টাতেও পড়ার দিকে তার মন বসানো যায় না। পরিণামে সে মূর্খ হয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। আবার এমন ছেলেও দেখা যায় যাকে কিছু বলতে হয় না, ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোর দিকে তার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় আর বড়ো হয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান বলে জীবনে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সবই হল জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রমাণ। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে ঃ

পূর্বদত্তা তু যা বিদ্যা পূর্বদত্তং তু যদ্ ধনম্।
পূর্বদত্তা তু যা ভার্যা অগ্রে ধাবতি ধাবতি।।

—পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারেই বিদ্যা, ধন আর স্ত্রী লাভ হয়ে থাকে। সংস্কারবশে যতটুকু বিদ্যালাভ হবার হবে, তেমনি ধনলাভ হবে, আবার তেমনি স্ত্রীলাভ হবে। তার জন্যে বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয় না। বিদ্যা, বিত্ত, বিবাহ সবই যেন মানুষের আগে আগে ধেয়ে আসে অর্থাৎ সবকিছু পূর্বনির্দিষ্ট হয়েই আছে।

অলক্ষ্মীর মর্যাদা

এক রাজা, তিনি পরম ধার্মিক। তাঁর রাজধানীতে একটা বড়ো বাজার ছিল, কিন্তু সেই বাজারে কেনা-বেচা ক্রমশ কমে যেতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকায় ব্যবসায়ীদের লোকসান হতে লাগল। ব্যবসায়ীরা তখন রাজার কাছে দরবার করে বলল ঃ "মহারাজ, বাজারে তেমন জিনিসপত্র আমাদের বিক্রি হচ্ছে না, তাতে আমাদের খুব ক্ষতি হচ্ছে। আপনি এর একটা বিহিত করুন।" রাজা তাদের বললেন ঃ "তোমরা ভালো ভালো জিনিস নিয়ে বাজারে বোসো। সারাদিনের কেনাবেচার পর তোমাদের যেসব জিনিস বিক্রি হবে না, সন্ধ্যেবেলা সেগুলো সব আমি কিনে নেব।" রাজার কথামতো সেইভাবেই বাজার চলতে লাগল, দুদিনেই বাজার আবার জমজমাট হয়ে উঠল।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন ছিল রাজার শত্রু। রাজাকে জব্দ করবার জন্যে সে অলক্ষ্মীর একটা সুন্দর মূর্তি গড়িয়ে বাজারে এসে বসল। লোকে দেখে আর বলে ঃ "বাঃ, ভারী সুন্দর মূর্তি তো, এ কোন্ দেবীর মূর্তি?" ব্যবসায়ী বলল ঃ "অলক্ষ্মী দেবীর মূর্তি।" সবাই তখন ভয়ে ভয়ে অলক্ষ্মীকে দূর থেকে প্রণাম করে বলতে লাগল ঃ "ওরে বাবা! অলক্ষ্মীকে কে সাধ করে ঘরে নিয়ে যাবে? তোমার ঐ মূর্তি কেনা দূরে থাক। আমরা কেউ আর তোমার দোকানের ছায়া মাড়াব না।"

সন্ধ্যের সময় ব্যবসায়ী রাজসভায় গিয়ে রাজাকে বলল ঃ "মহারাজ আমার এই দেবীমূর্তি আজ বিক্রি হয়নি, এ-মূর্তি আপনি রেখে দিন।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এ কোন্ দেবীর মূর্তি?" ব্যবসায়ী বলল ঃ "অলক্ষ্মী মায়ের মূর্তি।" ব্যবসায়ীর কথা শুনে পাত্র-মিত্র সভাসদ সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা রাজাকে বলতে লাগল ঃ "মহারাজ কিছুতেই আপনি এই মূর্তি কিনবেন না। এযে অলক্ষ্মী।" রাজা বললেন ঃ "আমি সত্যভঙ্গ করতে পারিনে। ওদের আমি কথা দিয়েছি যে ওদের যেসব জিনিস বিক্রি না হবে, তা আমি সন্ধ্যেবেলা কিনে নেব। অলক্ষ্মী হলেও তা আমাকে নিতেই হবে।" পারিষদরা অনুনয় করে বলল ঃ "মহারাজ, এঁকে বিদায় দিন।" কিন্তু রাজার সেই এক কথা ঃ "রাজলক্ষ্মী চলে যাবেন, আমার রাজ্য যায় যাক, তবু আমি সত্য থেকে ভ্রষ্ট হব না।" রাজা তখন ব্যবসায়ীকে দাম মিটিয়ে দিয়ে অলক্ষ্মীকে এনে নিজের পুজোর ঘরে রেখে দিলেন।

রাজা রোজ শেষরাতে উঠে পুজোয় বসতেন। তিনি পুজোয় বসেছেন এমন সময় দেখতে পেলেন এক অলৌকিক দেবীমূর্তি কাঁদতে কাঁদতে পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। রাজা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই শেষরাতে এই অলৌকিক দেবীমূর্তি কোথা থেকে এখানে এলেন, তিনি কাঁদছেনই বা কেন আর যাচ্ছেনই বা কোথায়? রাজা ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি দেবীর মুখের পানে চাইলেন না, পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মা তুমি কে? তুমি কাঁদছ কেন? কোথায় যাচ্ছ তুমি? অতি মধুর অথচ করুণ কণ্ঠে দেবী বললেন : "আমি তোমার রাজলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী আমার সতিন তুমি তাকে এনে আমার পাশে বসিয়েছ, তাই আমি আর এখানে থাকব না, আমি চলে যাচ্ছি। তবে আমি চলে গেলে তোমার রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল দেখা দেবে। তাই বলছি, আমাকে যদি চাও তাহলে অলক্ষ্মীকে বিদেয় করো।" রাজা বললেন : "মাগো, আমি তোমার ছেলে, ছেলেকে কি তুমি মিথ্যের আশ্রয় নিতে বলছ? আমি সত্যবাদী, সত্যকে আমি কী করে ছাড়ব? এতে তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও, থাকো, যদি আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাও, তাই যেয়ো, আমি কিছুতেই সত্যকে ত্যাগ করতে পারব না।" রাজলক্ষ্মী তখন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজা এবার দেখলেন যে অপরূপ সুন্দরী আর একটি স্ত্রীমূর্তি ঘর থেকে চলে যাচ্ছেন।রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কে?" তিনি বললেন : "আমি তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী, আমি রাজলক্ষ্মীর ছোট বোন। দিদি যখন তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন তখন আমারও আর এখানে থাকা চলে না। তাই আমিও চললাম।" কিছুক্ষণ পর রাজার নজরে পড়ল এক অনিন্দ্যকান্তি পুরুষও ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। অবাক হয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনি কে?" পুরুষটি বললেন : "আমি ধর্ম। আমার মা রাজলক্ষ্মী যখন বিদায় নিয়েছেন তখন আমিও আর তোমার ঘরে থাকব না।" এইভাবে নীতি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি যত সদ্‌গুণ ছিল সবাই একে একে মূর্তি ধারণ করে রাজার সামনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সকলের শেষ এক পুরুষমূর্তি চোরের মতো চুপি চুপি রাজার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে দেখে রাজা তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন : "কে তুমি?" সে বলল : "আমি সত্য।" অমনি রাজা তার হাত দুখানা শক্ত করে চেপে ধরে বললেন : "তুমি যাচ্ছ কোথায়? তোমার জন্যে আমি সব ছেড়েছি, তবু তোমাকে ছাড়িনি, আর তুমি কিনা চুপি চুপি সরে পড়তে চাইছ! এখান থেকে তোমার যাওয়া কিছুতেই চলবে না, আমার ঘরে অচল হয়ে তোমাকে থাকতে হবে।" সত্য খুব লজ্জা পেলেন, তবু বললেন : "মহারাজ, আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই চলে গেল, একলা আমি কী করে এখানে থাকি?" রাজা বললেন : "ওসব কথা আমি শুনতে চাইনে, আমি শুধু এইটুকু জানি যে তোমাকে আমি এখান থেকে যেতে দিতে পারব না, আর সেই অধিকার আমার আছে।" সত্য আর কী করেন, রাজার ঘরেই তিনি কায়েম হয়ে রইলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্যকে ছেড়ে নীতি থাকতে পারে না, কাজেই নীতিকে আবার ফিরে আসতে হল। নীতি ফিরে এল বলে দয়া ক্ষমা এরাও আর দূরে থাকতে পারল না। এদের ছেড়ে ধর্মই বা থাকে কী করে? তাই ধর্মকেও ফিরে আসতে হল। ছেলেদের ছেড়ে মা-মাসীদেরও দূরে থাকা সম্ভব নয়, তাই রাজলক্ষ্মী ও ভাগ্যলক্ষ্মীও আবার রাজার ঘরে এসে জুটলেন। একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করে সমস্ত সৎবৃত্তি তখন রাজার আয়ত্তে এসে গেল।

☆ ☆ ☆

যেকোনো একটি সদ্‌বৃত্তিকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে থাকতে পারলে অন্যান্য সদ্‌বৃত্তিও আয়ত্বে এসে যায়। সব বৃত্তির মূল ভিত্তি হল সত্য। এই সত্যকে আঁকড়ে থাকতে পারলে, কোনো অবস্থাতেই তাকে ত্যাগ না করলে, সত্যকে বিসর্জন না দিলে সত্যের দৌলতেই সব সদ্‌গুণ, সব সম্পদ আবার ফিরে পাওয়া যায়। তাই বলা হয় 'সত্যমেব জয়তে', 'সত্যেন লভ্যঃ', 'সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'। তাই সত্যকে বা সত্যের আশ্রিত যেকোনো সদ্‌বৃত্তিকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধার রাখতে হয়। তাহলেই আর সবই আপনি এসে যায়।

দ্বৈত ও অদ্বৈত

এক ছিলেন সাধু আর এক ছিলেন পণ্ডিত। সাধু হলেন অদ্বৈতবাদী আর পণ্ডিতটি দ্বৈতবাদী। পণ্ডিত মনে মনে ভাবলেন, আমি একবার সাধুর কাছে গিয়ে তাঁর অদ্বৈত মত খণ্ডন করে দিয়ে আসব। এই ভেবে তিনি একদিন সাধুর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "আমি এসেছি আপনার অদ্বৈত মত খণ্ডন করে দ্বৈতবাদ সিদ্ধ করতে।' সাধু শুনে বললেন ঃ "বেশ তো, তুমি বোসো, আমিও তোমার কাছে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করে দেব।"

দুজনে বসে আছেন এমন সময় সেখান দিয়ে এক ধোপা যাচ্ছিল। সাধু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ওহে, তুমি কে?" ধোপা বলল ঃ "সাধুবাবা, আমি ধোপা।" সাধু বললেন ঃ না হে না, তুমি ধোপা নও তুমি হলে ব্রহ্ম।" সে বলল ঃ "কেন বাবা আমার অপরাধ বাড়াচ্ছেন। আমি ব্রহ্ম নই, আমি সামান্য এক ধোপা।" সাধু তাকে বললেন ঃ "তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে না, তুমি যেতে পারো।" ধোপা সেখান থেকে চলে গেল।

একটু পরে এক নাপিত চলেছে সেই পথে, সাধু তাকেও ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি কে হে বাপু?" সে বলল ঃ "আমি নাপিত।" সাধু বললেন ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আরে না না, তুমি নাপিত নও, তুমি তো ব্রহ্ম।" নাপিত বলল ঃ "আমার সঙ্গে এমন ঠাট্টা করছেন কেন বাবা? আমি ব্রহ্ম নই, আমি নাপিত মাত্র।" সাধু তাকেও চলে যেতে বললেন।

পণ্ডিত এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার তিনি সাধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ "সাধুজী, এবার আমার দিকে একটু খেয়াল করুন। আমি এসেছি দ্বৈতবাদকে সিদ্ধ করব বলে, আর আপনি সিদ্ধ করবেন অদ্বৈতবাদকে।" সাধু তখন বললেন ঃ "পণ্ডিত, দ্বৈত সিদ্ধ করা আর এমন কী শক্ত ব্যাপার? দেখলে তো সামান্য ধোপা নাপিতও দ্বৈত সিদ্ধ করে দিয়ে চলে গেল। ওদের বললাম তোমরা ব্রহ্ম, ওরা জোর গলায় বলে গেল ওরা ব্রহ্ম নয়, ওরা ধোপা আর নাপিত। ধোপা-নাপিতের মতো নগণ্য লোকও যখন দ্বৈত সিদ্ধ করে গেল, তখন তুমি আর নতুন করে কী সিদ্ধ করবে? অদ্বৈত সিদ্ধ করাতেই তো বাহাদুরির দরকার।"

☆ ☆ ☆

জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তকে জীবনে বা সংসারে সিদ্ধ করা, প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই মহাজনেরা সব সময় সংসারীদের কাছে দ্বৈতবাদ বা ভক্তিপথ অবলম্বনেরই উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন দ্বৈত আর অদ্বৈত, ভক্তি ও জ্ঞান, যে পথ ধরেই যাওয়া যাক না কেন, দুই পথই মানুষকে পৌঁছে দেবে সেই একই পরম সত্যে। যার যেমন অধিকার, সে সেই পথ ধরেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। অদ্বৈতপথ যে সকলের পক্ষে সুগম নয়, পরিহাসচ্ছলে এই গল্পে সেই কথাটিই বলা হয়েছে। শ্রীভগবানও গীতায় তাই বলেছেন ঃ 'ক্লেশোহধিকতরস্তেষাম্'। জ্ঞানের পথ দুর্গম ক্লেশবহুল, ভক্তির পথ সুগম।

রানীর প্রেম

এক জহুরী রাজার কাছে মাঝে মাঝে আসত। জহুরীর চেহারা ছিল ভারী সুন্দর। অমন সুন্দর চেহারা আড়াল থেকে একদিন নজরে পড়তেই রানী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর তখন চিন্তা হল কেমন করে জহুরীর সঙ্গে দেখা করা যায়। ভেবে ভেবে রানী তার দাসীকে জহুরীর কাছে পাঠালেন। দাসী জহুরীকে বলল ঃ "রানীমা হীরে কিনতে চান, তবে তিনি নিজে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চোখে না দেখে কিছু নেবেন না। আপনি কখন যেতে পারবেন বলুন, আমি এসে আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু অন্দরমহলে তো সবাই ঢুকতে পারে না, তাই আপনাকে আমার সঙ্গে লুকিয়ে যেতে হবে।"

জহুরী দিনক্ষণ ঠিক করে দিল। তার কথামতো দাসী এসে একদিন সকলের আগোচরে তাকে অন্দরমহলে রানীর কাছে নিয়ে এল। দু-চার কথার পরই রানীর মনের খবর জানতে জহুরীর আর বাকি রইল না। এমন সময় অসময়ে অন্দরমহলে রাজার পায়ের শব্দ শোনা গেল। রানী দেখলেন সর্বনাশ, একে আমি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি? দাসী তখন জহুরীকে বলল ঃ "আরে, করছ কী? রাজা যে এক্ষুণি তোমাকে খুন করে ফেলবেন। পায়খানার গর্ত দিয়ে শিগগীর নিচে নেমে পড়ো। কাল সকালে মেথর যখন পায়খানা পরিষ্কার করতে আসবে তখন কোনোরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো। এ ছাড়া বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই।"

প্রাণের দায়ে জহুরীকে তখন তাই করতে হল। এদিকে রাজা অসময়ে অন্দরমহলে এসেছিলেন পায়খানায় যাবেন বলে। নিচে গামলার মধ্যে জহুরী বসে রয়েছে, রাজার বিষ্ঠা তার সর্বাঙ্গে পড়তে লাগল। মুখ বুঁজে সহ্য করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। সারারাত জহুরীর ঐ অবস্থায় কাটল। সকালবেলা মেথর এল পায়খানা পরিষ্কার করতে। দরজা খুলে জহুরীকে দেখেই সে চীৎকার করতে যাবে এমন সময় জহুরী তাকে অনুনয় করে বলল ঃ "ভাই, দোহাই তোমার, চেঁচিয়ো না। আমার এই দুরবস্থা থেকে কোনোরকমে তুমি আমাকে উদ্ধার করে দাও। আমি তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব।" মেথর তখন একটা ঝুড়িতে জহুরীকে বসিয়ে তাকে একেবারে গঙ্গার ধারে এনে নামিয়ে দিল। জহুরীও গঙ্গায় ভালো করে স্নান করে নিল, তারপর ঘরে ফিরে মেথরকে বকশিশ দিয়ে বিদায় করল।

এরপর একদিন জহুরী নিজের দোকানে বসে আছে এমন সময় রানীর সেই দাসী আবার তার কাছে এসে বলল ঃ "রানীমা আপনাকে ডেকেছেন, চলুন।"

জহুরীর কি রানীর কাছে যাওয়া উচিত হবে?

☆ ☆ ☆

এই গল্পে রানী হল অবিদ্যা, দাসী হল মায়া আর জহুরী হল জীব। মায়ার প্রলোভনে ভুলে জীব অবিদ্যার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় আর তার ফলে মোহে অন্ধ হয়ে নানা অশান্তির মধ্যে হাবুডুব খেতে থাকে। গল্পের রাজা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানের উদয়ে জীবের সেই মোহ দূর হয় আর তখনই সে অবিদ্যার আবর্জনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। মুক্তির বাসনা জাগলে সদ্‌গুরুর দর্শন মেলে। গল্পে মেথররূপে সদ্‌গুরু দেখা দিয়েছেন। তিনিই তখন জীবের হাত ধরে তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যান। একবার যে অবিদ্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, সে কি আবার সেই ময়লা ঘাঁটতে যাবে?

(চাকরি থেকে অবসর নেবার পর যারা আবার নতুন চাকরি খোঁজে অথবা স্ত্রী বিয়োগের পর যারা আবার বিয়ে করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য করে বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এই গল্পটি শোনাতেন)।

কে বড়ো? অন্ধ না পঙ্গু

পাহাড়ের উপর এক অন্ধ আর এক পঙ্গু বাস করত। অন্ধ দেখে না, পঙ্গু চলতে পারে না। গ্রীষ্মকালে সেই পাহাড়ে দাবানলে জ্বলে উঠল, গাছে গাছে আগুন লেগে সেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আগুনের তাপ গায়ে লাগতেই অন্ধ বুঝতে পারল পাহাড় আগুন লেগেছে। তখন সে পঙ্গুকে বলল : "আমি তো চোখে দেখতে পাইনে, তবে চলতে পারি। আমি তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকি, তোমার চোখ আছে, তুমি আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ বলে দিয়ো।" এই ঠিক করে অন্ধের কাঁধে পঙ্গু চড়ে বসল, অন্ধ হাঁটতে লাগল আর পঙ্গু তাকে পথ বলে দিতে লাগল। এইভাবে তারা দাবানলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাইরে এসে পৌঁছল।

বাইরে এসে কিন্তু দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। অন্ধ পঙ্গুকে বলছে : "তোমাকে আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম, তাই তুমি প্রাণে বেঁচে গেলে, নইলে তোমাকে আজ আগুনে পুড়ে মরতে হত।" আর পঙ্গু বলছে : "তোমাকে যদি পথ বলে না দিতাম তাহলে তুমি আগুন থেকে বেরুতে কী করে? আমি পথ বলে দিয়েছি বলেই তো তোমার প্রাণ বাঁচল।" এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোর তর্ক বেধে গেল। অন্ধ বলল : 'আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি, তাই আমিই হলাম বড়ো।" পঙ্গুও বলে : 'না, আমার জন্যই তুমি প্রাণে বেঁচেছ, আমি তোমার চাইতে বড়ো।"

কে বড়ো, এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করে দেবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

গতজন্মের পুরুষকার, অর্থাৎ গতজন্মে যেসব কর্ম করা হয়েছে, তাদেরই সমষ্টিগত ফল হল এজন্মের প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট। সেই কর্মগুলি আমরা এজন্মে দেখতে পাইনে বলে প্রারব্ধকে বলা হয় অন্ধ। এজন্মে আমরা যে কাজ করি তা পুরুষকার। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, কে বড়ো? প্রারব্ধ, না পুরুষকার? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ নয়।

প্রারব্ধকে বলা হয় অখণ্ডনীয়। তাহলে কি মানুষের জীবনে পুরুষাকারের কোনো সার্থকতা নেই? তা নয়। পায়ে কাঁটা ফুটলে প্রারব্ধের দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকা চলে না। পুরুষকার প্রয়োগ করে চেষ্টা করে কাঁটা তুলে ফেলতে হয়। রোগ হলে ওষুধ খেয়ে রোগ সারাতে হয়। অর্থাৎ পুরুষকার অবলম্বন করে প্রারব্ধকে খণ্ডন করতে হয়। তবে অনেক সময় দেখা যায় প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো কাজ সম্পন্ন করা গেল না। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রারব্ধের শ্রেষ্ঠতা না মেনে উপায় নেই। কাজ করবার সময় তাই পুরুষকার প্রয়োগ করতে হয়, আর ফলাফলকে ছেড়ে দিতে হয় প্রারব্ধের উপর। দৈনন্দিন জীবনে কখনো প্রারব্ধ প্রবল হয়ে দেখা দেয়, কখনো পুরুষকার প্রারব্ধের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাই কে বড়ো, কে ছোটো, নিশ্চয় করে তা বলা যায় না। তবে একদিক দিয়ে পুরুষকারের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা চলে, কারণ গতজন্মের পুরষকারই তো এজন্মে প্রারব্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে পুরুষকার হল জনক আর প্রারব্ধ তার সন্তান। সেইভাবে দেখলে পঙ্গুই বড়ো, যে চক্ষুস্মান। পুরুষকারই প্রধান, যে দেখেশুনে বুঝে কাজ করতে পারে। তবে অন্ধেরও সহায়তা চাই। প্রারব্ধকে সঙ্গে নিয়ে হাত ধরাধরি করে পুরুষকারকে চলতে হবে। নির্দেশ দেবে পুরুষকার, চলবে বা চালাবে প্রারব্ধ।

জ্ঞানীর অন্বেষণে

এক রাজার পাখি পোষার খুব শখ। নানা দেশের নানা জাতের পাখি রয়েছে তাঁর কাছে, কিন্তু রাজহাঁস একটাও নেই। রাজা একদিন তাঁর গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "গুরুদেব, আমার এত পাখি রয়েছে, কিন্তু রাজহাঁস নেই। কেমন করে রাজহাঁস মিলবে আপনি বলে দিন।" গুরু বললেন ঃ "তুমি এক কাজ করো। তোমার আঙিনায় রোজ তুমি দু-চার মন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধান ছড়িয়ে রেখো। ধান খেতে অনেক পাখি এসে জুটবে, কোনোদিন রাজহাঁসও এসে যেতে পারে।'' এইভাবে কয়েকদিন ধান ছড়ানো হল, অনেক পাখিও এসে জুটল, কিন্তু রাজহাঁসের আর দেখা নেই।

এদিকে রাজহাঁস দেখল রোজ রাজবাড়িতে এত এত পাখি চলেছে, ব্যাপার কী? এই ভেবে সে-ও একদিন রাজবাড়িতে এল। রাজা রাজহাঁস চিনতেন না। নতুন রকম এক পাখি এসেছে দেখে রাজা খুব খুশি হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন এই পাখিটাই রাজহাঁস হতে পারে। তিনি তখন গুরুর কাছে গিয়ে বললেন ঃ ''গুরুদেব, আজ এক নতুন রকম পাখি এসেছে, আমার মনে হচ্ছে এই পাখিই হয়তো রাজহাঁস। রাজহাঁসকে চিনিবার উপায় কী আমাকে বলে দিন।'' গুরু বললেন ঃ ''তুমি একটা পাত্রে দুধ আর জল মিশিয়ে পাখিটার পাশে রেখে দাও। যদি রাজহাঁস হয় তাহলে সে দুধটুকু শুধু খাবে, জল পাত্রে পড়ে থাকবে।'' রাজা তাই করলেন। রাজহাঁস জল ফেলে রেখে দুধ খেয়ে নিল। রাজার তখন রাজহাঁসকে চিনে নিতে ভুল হল না।

একদিন রাজার ইচ্ছে হল জ্ঞানী পুরুষদের সেবা করবেন, কিন্তু চিনবেন কী করে জ্ঞানী পুরুষকে? রাজহাঁসের মতো দুধে জলে মিশিয়ে তো জ্ঞানী পুরুষকে চেনা যাবে না। তাহলে উপায়? গুরু বললেন ঃ ''উপায় আছে বইকি। জ্ঞানীর কাছে শাস্ত্র এনে দাও, তিনি নিত্যানিত্য বিচার করে দেবেন, বলে দেবেন এই হল নিত্য, এই হল অনিত্য। রাজহাঁস যেমন দুধ আর জল আলাদা করে দেয়, জ্ঞানীও তেমনি নিত্যবস্তু আর অনিত্যবস্তু আলাদা করে দেন।'' গুরুর নির্দেশে রাজা তখন অতিথি-ফকিরদের জন্যে এক সদাব্রত খুলে দিলেন। নানা দিক থেকে লোকজন সেই সদাব্রতে আসতে লাগল। শেষে জ্ঞানীও একদিন এসে দেখা দিলেন। রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হল।

☆ ☆ ☆

জ্ঞানীকে চিনতে পারা সহজ নয়। গল্পটিতে জ্ঞানীকে চিনে নেবার একটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানীর মূল লক্ষণ হল বিবেক জ্ঞান। বিবেক অর্থাৎ বিবেচন, বিশ্লেষণ করে নিত্য ও অনিত্য, সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দকে যিনি চিনে নিতে পারেন ও চিনিয়ে দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। জ্ঞানীকে তাই পরমহংস বা শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়, যিনি হাঁসেরই মতো দুধ আর জলকে অর্থাৎ সত্য আর মিথ্যাকে আলাদা করে ফেলতে পারেন। অজ্ঞান হল মিশিয়ে ফেলা, গুলিয়ে ফেলা, দড়িকে সাপ বলে মনে করা, আর জ্ঞান হল আলাদা করা, ভেজাল সরিয়ে খাঁটিকে চেনা, দড়িকে দড়ি বলে জানা। জ্ঞানী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাই তিনিই যাঁর এই আলাদা করে, খাঁটি করে চেনার দৃষ্টি ফুটছে। তিনি তাই 'সংকর' বা মিশ্রণ থেকে 'শংকর' বা কল্যাণকর শুদ্ধ সৎস্বরূপকে চিনে নেন।

শুভস্য শীঘ্রম্

এক বৃদ্ধ অনেক টাকাকড়ি জমিয়েছে। তার ইচ্ছে এ টাকাকড়ি সে কাউকে দেবে না, কেবল দান-ধ্যানে ব্যয় করবে। বৃদ্ধের চার ছেলে। তারাও জানে যে বাবা তার টাকা তাদের দেবে না। ছেলেরা যাতে টাকার সন্ধান না পায় তার জন্যে বৃদ্ধ ছেলেদের লুকিয়ে সমস্ত টাকা ঘরের দেয়ালে গেঁথে রেখে দিল। একদিন এক সাধু ভিক্ষে করতে বৃদ্ধের বাড়িতে এলেন। সাধু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, তিনি জানতে পারলেন বৃদ্ধ দান-ধ্যান করে তার টাকা খরচ করতে চায় অথচ তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। তিনি তখন বৃদ্ধকে একটি দোঁহা শোনালেন ঃ

জো কাল করে সো আজ করে, আজ করে সো অব্।
সময় বিত্ জাতা হ্যায়, ফির করেগা কব্।।

—সময় যে চলে যাচ্ছে, কালকের কাজ আজকেই সেরে ফেলো, আজকের কাজ এখনই শেষ করো, এর পরে হয়তো সময় পাবে না।

বৃদ্ধ এই দোঁহার মানে বুঝতে পারল না। ঠিক তখনই তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, কথা বলবার শক্তি আর রইল না, কিন্তু ভিতরে জ্ঞান তখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এমন সময় ছেলেরা এসে তাকে বলল ঃ "বাবা, আপনার কী ইচ্ছে আমাদের বলুন, দান-ধ্যান করতে চান তা-ও বলুন, আপনার টাকাকড়ি কোথায় আছে জানতে পারলে আমরা আপনার ইচ্ছেমতো সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেব।" বৃদ্ধ আর কী করে, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তার চোখ দিয়ে কেবল জল পড়তে লাগল। তখন সে কোনো রকমে দেয়ালের যেখানটায় টাকা গাঁথা রয়েছে, সেই জায়গাটা হাতের ইসারায় ছেলেদের দেখিয়ে দিল। ছেলেরা বুঝে নিল ওখানেই টাকা আছে। কিন্তু বাইরের অনেক লোক তখন ঘরের মধ্যে রয়েছে, তাদের সামনে সেকথা তারা ফাঁস করতে চাইল না। তাই ছেলেরা তাদের বুঝিয়ে বলল ঃ "বাবা বলছেন তাঁর যা টাকা ছিল সব এই বাড়ি তৈরি করতেই খরচ হয়ে গিয়েছে।"

বৃদ্ধের তখনো বুদ্ধিলোপ হয়নি। তার মনে হল ছেলেরা তার ইঙ্গিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুঝতে পারেনি। তাই সে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল আর কাঁদতে কাঁদতে নানারকম ইঙ্গিত করে ছেলেদের বোঝাতে চাইল যে এখনই যেন তার টাকা দিয়ে দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেরা বাপের কথা বুঝতে পারল, কিন্তু জেনেশুনেই তারা বৃদ্ধকে বলল ঃ "বাবা, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি কী চান তা আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনি তো চাইছেন ছোটো ছেলেকে কিছু বেশি টাকা দিতে, আমরা তাই দেব। আপনার ইচ্ছে আমরা অপূর্ণ রাখব না।"

তখন বৃদ্ধের আর কিছু করবার রইল না। মনের ইচ্ছে মনে রেখেই তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল।

☆ ☆ ☆

মনে কোনো শুভ সংকল্পের উদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা কাজে পরিণত করা উচিত। দেরি করলে সংকল্প পূরণের সুযোগ আর নাও আসতে পারে।

রাবণ রাজার সংকল্প

রামের বাণে আহত রাবণ যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন, তখনো তাঁর মৃত্যু হয়নি, তখন নীতিশিক্ষার জন্যে লক্ষ্মণকে রাম পাঠালেন রাবণের কাছে। লক্ষ্মণ গিয়ে রাবণের শিয়রের কাছে দাঁড়ালেন। রাবণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে তুমি?" লক্ষ্মণ বললেন ঃ "আমি লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন নীতিশিক্ষা করতে।" রাবণ চুপ করে রইলেন, কোনো কথা বললেন না। লক্ষ্মণ তখন রামের কাছে ফিরে এসে সব কথা জানালেন। রাম বললেন ঃ "তুমি আবার যাও, এবার গিয়ে রাবণের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ো। শিষ্য যে হবে তাকে তো গুরুর পায়ের কাছেই থাকতে হয়।"

লক্ষ্মণ আবার রাবণের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে রাবণ, আপনি এতদিন তো রাজত্ব করলেন, সংসার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন। আমি শিক্ষার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে আপনি কিছু উপদেশ দিন।" রাবণ বললেন ঃ "লক্ষ্মণ, যখনই তোমার মনে শুভ সংকল্পের উদয় হবে, একটুও দেরি না করে তখনই তা কাজে পরিণত কোরো আর মনে যদি অশুভ সংকল্প জাগে তবে যেকোনো উপায়ে হোক সময়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাটিয়ে দেবে। এই আমাকেই তুমি দেখো না। আমার মনে দুটো সংকল্প জেগেছিল। ভেবেছিলাম, সমুদ্রের জল নোনা, সেই নোনা জলের সমুদ্রকে যদি ক্ষীরসমুদ্র করে দিই তাহলে গরীব-দুঃখীরা ক্ষীর খেয়ে বাঁচবে। তারা ভালো কিছু তো খেতে পায় না, কত কষ্ট তাদের। ক্ষীরসমুদ্র হলে সংসারে কেউ আর খাওয়ার কষ্ট পাবে না, সমুদ্র থেকে ক্ষীর তুলে আনবে আর তাই দিয়ে পেট ভরাবে। এই ছিল আমার প্রথম সংকল্প।"

"এবার আমার দ্বিতীয় সংকল্পের কথা শোনো। একবার আমি যমপুরী দর্শন করতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম পাপীদের সে কী ভীষণ যন্ত্রণা। দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। তখন সংকল্প করলাম, পাপীদের এত দুর্দশা ভোগ করতে হয়, তাদের এ দুর্দশা আমি দূর করব। স্বর্গ পর্যন্ত এমন এক সিঁড়ি তৈরি করে দেব যাতে পাপী পুণ্যবান সকলেই যেন সেই সিঁড়ি দিয়ে সোজা স্বর্গে চলে যেতে পারে, নরকযন্ত্রণা যেন কাউকে আর ভোগ করতে না হয়। দেখো লক্ষ্মণ এই দুই শুভ সংকল্প আমার মনে উদয় হওয়ামাত্রই যদি সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করে ফেলতাম তাহলে জগৎ-সংসারে আমার কতবড়ো অক্ষয় কীর্তি থেকে যেত। কিন্তু তখন সেই কাজ আমি করিনি বলে এখন অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি।"

"অশুভ সংকল্পের কথা আর কী বলব? যখনই মনে হল সীতাদেবীকে চুরি করে নিয়ে এসে আমার পাটরানী করি, তখন আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সীতাদেবীকে চুরি করে আনলাম আর তারই পরিণামে তোমাদের বাণে আমি সবংশে মারা পড়লাম। এই অশুভ সংকল্প মনে উদয় হওয়ামাত্র যদি তা কাজে পরিণত না করতাম, যদি অন্য চিন্তায় বা কাজে সময় কাটিয়ে দিতাম, তাহলে আজ আমার এই দশা হত না। তাই তোমার কাছে এই হল আমার উপদেশ ঃ শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণম্। মনে শুভ সংকল্পের উদয় হওয়ামাত্র তা পালন কোরো, অশুভ সংকল্পের উদয় হলে সময় কাটিয়ে দিয়ো, কালহরণ কোরো।"

☆ ☆ ☆

শুভ সংকল্প যেমন এতটুকু দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করে ফেলা উচিত, অশুভ সংকল্পের বেলায়, খারাপ কোনো মতলবের বেলায় ঠিক তার উল্‌টোটা করাই সমীচীন, কারণ তাতে আমরা খারাপ কাজ করার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাপের ভাগী

এক সাধু অনেক পরিশ্রম করে এক সুন্দর বাগান তৈরী করল। বাগানের মধ্যে নিজের হাতেই একটা কুয়ো খুঁড়ল আর একখানা চালাঘর বানিয়ে তাতে বাস করতে লাগল। একদিন একটা গরু সাধুর বাগানে ঢুকে হঠাৎ সেই কুয়োর ভিতর পড়ে মারা গেল। এমন সময় গোহত্যার পাপ মানুষের মূর্তি ধরে সাধুর সামনে এস হাজির। সাধু জিজ্ঞাসা করল ঃ " কে তুমি? কী চাও" সে বলল ঃ "আমি গোহত্যার পাপ, আমি তোমার শরীর-মন আক্রমণ করব।" সাধু বলল ঃ "ভাই, তুমি অমন কথা বলছ কেন? আমি তো গোহত্যা করিনি।" পাপপুরুষ বলল ঃ "তুমি যদি কুয়ো না খুঁড়তে তাহলে তো গরু মারা পড়ত না। তুমি নিজের হাতে এই কুয়ো খুঁড়েছ, কাজেই গরু হত্যার পাপও তোমাকে ভোগ করতে হবে। তোমার দেহ-মনকে জীর্ণ না করে আমি ছাড়ব না।" সাধু তখন বলল ঃ "ভাই, হাতের দেবতা হলেন ইন্দ্র। তিনি যদি আমার হাতে শক্তি না দিতেন তাহলে তো আমি কুয়ো খুঁড়তে পারতাম না। তাঁরই শক্তিতে আমি কুয়ো খুঁড়েছি, কাজেই গোহত্যার পাপ আমার নয়, ইন্দ্রের।'

পাপপুরুষ তখন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলল ঃ "হে ইন্দ্র তুমি তো হাতের দেবতা। সাধু আমাকে বলেছে যে তুমি তার হাতে শক্তি জুগিয়েছ বলে সেই শক্তিতে সে কুয়ো খুঁড়েছে। তাই সেই কুয়োয় পড়ে যে গরু মরেছে, সেই গোহত্যার জন্যে সে দায়ী নয়, দায়ী তুমি।" ইন্দ্র ভাবলেন, ভালো রে ভালো, ব্যাপারটা তো দেখছি সুবিধের নয়। তিনি তখন গোহত্যা পাপকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে সাধুর বাগানে গিয়ে তার সেই সাধের বাগান লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করলেন। সাধু দেখল একজন লোক তার বাগানে ঢুকে যথেচ্ছভাবে ফুল ছিঁড়ছে, গাছের ডালপালা মটমট করে ভেঙে ফেলছে, কুয়োয় থুথু ফেলে জল নষ্ট করছ, আমার কুয়োর জল নষ্ট করে দিচ্ছ, এ কী কাণ্ড তোমার?" ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাকে বললেন ঃ "এ বাগান তোমার হল কী করে?" সাধু বলল ঃ "কেন? আমি নিজের হাতে এ বাগান করেছি, নিজের হাতে এ কুয়ো খুঁড়েছি, এ বাগান আমার নয়তো কার?"

ইন্দ্র তখন গোহত্যা পাপকে ডেকে বললেন ঃ "নাও ভাই, এবার তুমি সাধুকে চেপে ধরো। এ নিজেই যখন বলছে 'আমার বাগান', 'আমার কুয়ো', সবই যখন সে নিজের হাতে করেছে বলছে, তখন গোহত্যা পাপই বা আমার হতে যাবে কেন? সেটাও তো ওরই হওয়া উচিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

তর্কচ্ছলে আমরা বলতে পারি যে ভগবানই যখন আমাদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেন, তখন পাপ-পুণ্যই বা আমাদের হবে কেন? কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা কী করি? ভালো কিছু করলে অহংকারে মত্ত হয়ে বলি 'আমি করেছি', তখন ভগবানের কথা মনে আসে না। আর মন্দ কাজের বেলাতে ভগবানের দোহাই পেড়ে বলি 'তিনি করিয়েছেন, আমার কী দোষ?' তাই একে সুবিধাবাদীর যুক্তি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে।

বিনা তারের টেলিগ্রাফ

এক বুড়ীর একটিমাত্র মেয়ে, সে থাকে শ্বশুরবাড়িতে। বুড়ীর কিছু টাকা ছিল। একবার বুড়ীর অসুখ করলে তার মেয়ে এসে তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। মেয়ের সেবা-যত্নে বুড়ী যখন ভালো হয়ে উঠল তখন সে তার টাকার পুঁটুলিটি নিয়ে মেয়ের সঙ্গে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। পথ চলতে চলতে ক্লান্তিতে বুড়ীর মেয়ের পা যেন আর চলে না। কী আর করা যায়? তারা তখন পথের ধারে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

এমন সময় এক উটওয়ালা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বুড়ী তাকে ডেকে বলল ঃ "ভাই, তুমি তো গ্রামের দিকেই যাচ্ছ। আমার মেয়ে আর চলতে পারছে না। তুমি কি আমার মেয়েটাকে আর আমার এই পুঁটুলিটাকে তোমার উটের উপর তুলে নিয়ে গ্রামে পৌঁছে দিতে পারবে?" উটওয়ালা বলল ঃ "না না বুড়ী, অত সময় আমার নেই, আমার তাড়া আছে।" এই বলে উটওয়ালা চলে গেল।

কিছুদূর গিয়ে উটওয়ালার মনে হল, যাঃ, কী বোকামিটাই না আমি করলাম। বুড়ীর মেয়ে আর তার টাকার পুঁটুলিটা উটের উপর তুলে নিয়ে যদি ভেগে পড়তাম, বুড়ীর সাধ্য ছিল না যে আমাকে ধরে। ফাঁকতালে কেমন দুটো জিনিসই আমার মিলে যেত। যাই, দেখি একবার বুড়ীর কাছে গিয়ে।

উটওয়ালা যখন এইসব ভাবছে ঠিক তখনই বুড়ীর মনেও চিন্তা হল, আরে, কী বোকামিই না আমি করতে যাচ্ছিলাম! কোথাকার কে উটওয়ালা, জানিনে শুনিনে, লোক ভালো কি মন্দ কিছুই বলা যায় না, এমন লোকের সঙ্গে মেয়েকে একলা ছেড়ে দিচ্ছিলাম। মেয়ে আর টাকার পুঁটুলি নিয়ে যদি সে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উধাও হয়ে যেত? ভগবান আমাকে ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

এমন সময় উটওয়ালা বুড়ীর কাছে ফিরে এসে বলল ঃ ও বুড়ীমা, তোমার মেয়েকে আর পুঁটুলিটা উটের উপর চড়িয়ে দাও, আমি গ্রামে পৌঁছে দেব।" বুড়ী বলল ঃ "তার আর দরকার হবে না বাবা। যিনি তোমার মনে কুবুদ্ধি জাগিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আমাকে সাবধান হবার কথা বলে দিয়েছেন।

☆ ☆ ☆

অনেক সময় দেখা যায় যে একজনের মনে কোনো চিন্তার উদয় হলে আর একজন তা জানতে পারে। এ যেন বিনা তারের টেলিগ্রাফ। মানুষের মধ্যেই যখন এটা সম্ভব তখন ভগবান যে সকলের মনের কথা জানতে পারবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

যাকে দেবার, মালিকই দেন

দুই ফকির শহরে ঘুরে বেড়াত। তাদের মধ্যে একজন সব সময় বলত ঃ

জিসকো দিয়া মৌলা
উসকো কেয়া দেগা আসাফদ্দৌলা?

—ঈশ্বর যাকে দেন, বাদশা আসাফদ্দৌল্লা তাকে আর কী দেবে?

আর এক ফকির বলত ঃ

জিসকো দিয়া আসাফদ্দৌলা
উসকো কেয়া দেগা মৌলা?

—বাদশা আসাফদ্দৌলা যাকে দেন, ঈশ্বর তাকে আর কী দেবে? অর্থাৎ আসাফদ্দৌলার দয়াতেই যখন সবকিছু পাওয়া যায়, তখন ঈশ্বরকে ডাকবার কোনো দরকার নেই।

একদিন দুই ফকির বাদশার দরবারে এসে নিজের নিজের বুলি বাদশাকে শোনাল। বাদশা প্রথম ফকিরের দিকে ফিরেও চাইলেন না। দ্বিতীয় ফকির, সে বাদশাকে ঈশ্বরের চেয়েও বড়ো বলেছিল, তাকে তিনি কাছে ডাকলেন। ফকির ভাবল, বাদশা যখন আমার উপর খুশী হয়েছেন, তখন না জানি কত ধন-দৌলত আমাকে দেবেন। বাদশা একটা তরমুজের ভিতর হীরে-জহরত ভরে সেই তরমুজটা দ্বিতীয় ফকিরকে দিলেন। ফকির জানত না তরমুজের ভিতরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহামূল্য সম্পদ রয়েছে। তাই সে ভাবল, বাদশার এত ধন-দৌলত থাকতে আমাকে কিনা সামান্য একটা তরমুজ দিলেন। এ তরমুজ আমি খাব না। এই ভেবে তরমুজটা বিক্রি করবে বলে সে এক ফলওয়ালার কাছে গিয়ে বলল ঃ "আট আনায় তুমি এটা নেবে?" ফলওয়ালা দেখল এটা সে বারো আনায় বিক্রি করতে পারবে ঃ তাই দরাদরি না করে আট আনায় সে ফকিরের কাছ থেকে তরমুজ কিনে নিল।

এদিকে প্রথম ফকির বাদশার দরবার থেকে বেরিয়ে ভিক্ষেয় বেরুল। ভিক্ষে করে তার জুটল বারো আনা। সেই বারো আনা নিয়ে সে বাজারে গেল আটা কিনতে, কিন্তু বাজারে গিয়ে হঠাৎ তরমুজ খাওয়ার শখ হল। সে তখন ফলওয়ালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ভাই, তোমার এ তরমুজের দাম কত?" ফলওয়ালা বলল ঃ "বারো আনা।" ফকির তখন সেই তরমুজ কিনে নিয়ে এক গাছতলায় গিয়ে বসল। তরমুজ কাটতেই সে দেখে তার ভিতর মণি-মুক্তো ঠাসা রয়েছে। ফকির তখন ভগবানের উদ্দেশে বলতে লাগল ঃ "হে ঈশ্বর, তুমি যাকে দাও, তাকে এমনিভাবে তরমুজ ভরতি করেই দাও।"

আবার একদিন দুই ফকির এসেছে বাদশার দরবারে। যে ফকিরকে বাদশা তরমুজ দিয়েছিলেন, তাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমাকে যে তরমুজ দিয়েছিলাম তা দিয়ে তুমি কী করলে?" ফকির বলল ঃ "আমি ফলওয়ালার কাছে আট আনায় বিক্রি করেছিলাম।" বাদশা তখন ফলওয়ালাকে ডাকলেন। সে বলল ঃ "আমি বারো আনায় এক ফকিরের কাছে তরমুজ বেচেছিলাম।" এবার প্রথম ফকিরের ডাক পড়ল। ফকির বলল ঃ "হুজুর, আমি তো প্রথমেই আপনাকে শুনিয়েছিলাম যে মালিক যাকে দেন, বাদশা আসাফদ্দৌলা তাকে আর কী দেবে? তখন আপনি আমার উপর রাগ করে আমাকে কিছু না দিয়েই বিদেয় করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখুন আমার কথা ঠিক কিনা। আপনি আমায় কিছুই দেননি, কিন্তু ভগবানই আমাকে তরমুজ ভরতি করে হীরে-জহরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বাদশা এবার বুঝতে পারলেন যে দেবার মালিক তিনি নন, ঈশ্বর যাকে দেন, শুধু তারই কপালে ঐশ্বর্যলাভ ঘটে।

☆ ☆ ☆

জগতে দাতা একজনই, তিনি হলেন ভগবান। হাজার সদিচ্ছা থাকলেও কেউ কাউকে কিছু পাইয়ে দিতে পারে না। যাকে যা দেবার তা ভগবানই দিয়ে থাকেন, আর তা দেন মানুষের হাত দিয়েই। তিনি না চাইলে রাজা-বাদশার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুয়ারে গিয়েও কিছু মেলে না। ভক্ত তাই তাঁর দিকেই চেয়ে থাকেন সব অভাব-অভিযোগ মেটাবার জন্য, কারণ তিনি জানেন যে রাজা-মহারাজা চাইলেও কারুর অভাব ঘোচাতে পারেন না যদি ভগবান তা না চান।

বড়ো ব্যাঙ্কের পুঁজি

এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী বড়ো গরীব। ভিক্ষে করে অতি কষ্টে তাদের দিন কাটে। কোনোদিন আধপেটার বেশি আহার জোটে না। তাই ব্রাহ্মণী একদিন ব্রাহ্মণকে বলল ঃ "তুমি দুর দূর গ্রামে ভিক্ষেয় যেয়ো, তাতে হয়তো বেশি ভিক্ষে মিলবে।" ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ দূর গ্রামে ভিক্ষে করতে গেল, তবু তাদের কপালে আধপেটা খাওয়ার বেশি ভিক্ষে মিলল না। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একদিন তারা ঠিক করল জলে ডুবে মরবে। এই ভেবে দুজনে একটা পুকুরে গিয়ে নামল।

এমন সময় নারদ ঋষি সেই পুকুরের ধারে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী পুকুরের জলে ডুবে মরতে চলেছে। তিনি তখন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমরা ডুবে মরতে চাও কেন? কী তোমাদের দুঃখ আমাকে বলো, দেখি কিছু করতে পারি কিনা।" তারা বলল ঃ "প্রভু, কোনোদিন আমরা পেট ভরে খেতে পাইনে, রোজ আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। খিদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছিনে, তাই ঠিক করেছি প্রাণ আমরা রাখব না।" নারদ বললেন ঃ "দেখো ভাই, পালনকর্তা হলেন বিষ্ণু। আমি একবার তাঁর কাছে গিয়ে কথা বলে আসি। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ তোমরা প্রাণ ত্যাগ কোরো না।" ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী নারদের কথায় রাজী হল।

কিছুক্ষণ পর নারদ ফিরে এসে বললেন ঃ "ভাই, পূর্বজন্মে যে তোমরা দান-ধ্যান কিছুই করোনি, তাই এ-জন্মে তোমাদের খাওয়া জুটছে না। শুধু একদিন এক গরীবকে তোমরা আধপেটা খেতে দিয়েছিলে, সেই পুণ্য ফলে ভগবান বিষ্ণুর কাছে তোমাদের আট আনা জমা রয়েছে আর তাইতেই তোমরা রোজ আধপেটা খেতে পাচ্ছ।" এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে নারদকে বলল ঃ "প্রভু, এতই যখন করলেন তখন আমাদের জন্যে আর একটু কষ্ট স্বীকার করুন। দয়া করে আর একবার বিষ্ণুর কাছে গিয়ে আমাদের আধুলিটা চেয়ে এনে দিন।" নারদ বললেন ঃ "আরে মূর্খ, ঐ আধুলি জমা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আছে বলেই তো তার দৌলতে তোমাদের আধপেটা খাওয়া জুটছে। সেটাও যদি চেয়ে নাও তাহলে যে না খেতে পেয়ে মরবে। এখন তবু যা হোক আধপেটা খেতে পাচ্ছ, তখন যে কিছুই জুটবে না।" ব্রাহ্মণ তবু নারদকে বলল ঃ "দোহাই প্রভু, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে সেই আট আনা পয়সা এনে দিন।" নারদ আর কী করেন? বিষ্ণুলোক থেকে আধুলি নিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে দিলেন।

ব্রাহ্মণ তখন ঐ আধুলি দিয়ে চাল, ডাল, তরিতরকারি, আটা, ঘি, তেল নুন সব কিনে এনে ব্রাহ্মণীকে বলল ঃ "আজ খুব ভালো করে রান্না করো দেখি।" ব্রাহ্মণীও যত্ন করে মনের মতো রান্না করলে। কিন্তু এত যে রান্না হল, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী তার কিছুই খেল না, দুপুরবেলা এক গরীব ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে তারা পরিতোষের সঙ্গে আহার করাল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর তহবিলে ব্রাহ্মণ দম্পতির নামে এক টাকা জমা পড়ে গেল।

পরের দিন ভিক্ষে করে ব্রাহ্মণ যা পেল তাতে দুজনে পেট ভরে খেতে পারে। কিন্তু সেদিন তারা কিছু খেল না। পরিপাটি রান্না করে দুজন দুঃখীকে ডেকে পেট ভরে তাদের খেতে দিল। তৃতীয় দিনে ভিক্ষেয় বেরিয়ে ব্রাহ্মণ অনেক জিনিস নিয়ে ঘরে ফিরল এবং আগের দুদিনের মতো নিজেরা উপবাসী থেকে রান্না করা সব খাবার গরীব-দুঃখীদের ডেকে খাইয়ে দিল। এইভবে পাঁচদিন কাটল। তখন গ্রামের মানুষের দৃষ্টি পড়ল তাদের দিকে। এত গরীব, তবু নিজেরা না খেয়ে গরীব-দুঃখীদের খেতে দিচ্ছে, তাদের এই দয়া দেখে গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তারপর থেকে ব্রাহ্মণ দম্পতিকে প্রতিদিন তারা খাবার পাঠাতে লাগল। তখন থেকে ব্রাহ্মণেরও আর ভিক্ষে করবার দরকার হল না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর আর কোনো দুঃখ নেই, পরম আনন্দে তাদের দিন কেটে যাচ্ছে। এমন সময় নারদ আর একদিন তাদের কাছে এলেন। ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য দেখে নারদ তো অবাক। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ভাই, তুমি তো ভিক্ষে করে কোনোমতে দিন কাটাতে, এত ঐশ্বর্য তুমি কোথায় পেলে?" ব্রাহ্মণ তখন হাসতে হাসতে বলল ঃ "প্রভু, সেই যে আধুলি আপনি আমাকে এনে দিয়েছিলেন, সেই পয়সা খাটিয়েই আমি আমার পুঁজি বাড়িয়ে তুলেছি।" এই বলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ব্রাহ্মণ নারদকে শোনাল। নারদ দেখলেন ব্রাহ্মণ বেশ বুদ্ধিমান, নইলে এমন কৌশল করে বড়ো ব্যাঙ্কে নিজের পুঁজি কেউ বাড়িয়ে তুলতে পারে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

দান কখনো নিষ্ফল হয় না। সকল ধর্মে দানের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। মহাজনেরা বলেন, তোমার যদি একটা টাকা উপার্জন হয়, তাহলে সেই টাকাটা খরচ করবার একটা নিয়ম আছে। খাওয়া-দাওয়ায় খরচ করবে আট আনা, চার আনা রেখে দেবে অসময়ের জন্যে, বাকি চার আনা দান-ধ্যানে ব্যয় করবে। এই চার আনাই তোমার নামে বড়ো ব্যাঙ্কে জমা থাকবে, পরের জন্মে তুমি সেটা পাবে। দান করলে কখনো সেটা ঘাটতি হয় না, চতুর্গুণ বাড়তি হয়ে দাতার কাছেই তা ফিরে আসে যেন সুদ সমেত। দানের এই হল মহিমা।

বণিকের পুত্রশোক

মারোয়াড় দেশে এক বণিক বাস করত। ঘরে ছিল তার মা আর স্ত্রী। বণিক ভাবল, এখানে পড়ে না থেকে দূরদেশে যাই, সেখানে গেলে ব্যবসার উন্নতি হবে, অনেক টাকাও রোজগার করা যাবে। এই ভেবে বণিক তার মা আর স্ত্রীকে বলল ঃ "আমি ব্যবসা করতে কলকাতায় যাব, সেখানে গেলে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারব। তোমরা দুজনে দেশেতেই থাকো।" মা আর স্ত্রী বলল ঃ "তোমার বেশি উপার্জনের দরকার কী? এখানে যা রোজগার করছ তাই তো যথেষ্ট। তোমাকে আর দূরদেশে যেতে হবে না।" বণিক তাদের অনেক করে বুঝিয়ে কলকাতায় রওনা হল। তখনকার দিনে তো রেলগাড়ি ছিল না। হাঁটা পথ, পথও দুর্গম, তাই বহুদিন লেগে গেল কলকাতায় পৌঁছতে।

বণিক যখন চলে আসে তখন তার স্ত্রী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। কিছুদিন বাদে বণিকের এক ছেলে হল। যথাসময়ে বণিকের কাছে সেই খবর পৌঁছল, বণিক জানতে পারল তার এক ছেলে হয়েছে। ছেলেটি ক্রমে বড়ো হতে লাগল। বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করে যখন সে যৌবনে পা দিল তখনো তার পিতৃদর্শন ঘটেনি। একদিন সে তার মাকে বলল ঃ "মা, আমি তো কখনো বাবাকে দেখিনি, তাই একবার কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।" মা তাকে নানাভাবে নিরস্ত করতে চাইল, কিন্তু ছেলে কোনো কথা শুনল না, সে বাবার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে বণিকও তখন ভাবছে, বহুদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি, ধন-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্পদও প্রচুর জমানো হয়েছে, আর কেন বিদেশে পড়ে থাকি। এবার দেশে ফেরা যাক। এই ভেবে অনেক চাকর-বাকর সঙ্গে নিয়ে ডুলিতে চেপে সে দেশের দিকে রওনা হল। সন্ধ্যেবেলা এক চটিতে পৌঁছে বণিক চটিওয়ালাকে বলল ঃ "আমার সঙ্গে অনেক লোকজন রয়েছে, আমাকে তিনটে ঘর দিতে হবে।" চটিওয়ালা বলল ঃ "হুজুর, আমার মোটে তিনখানাই ঘর আছে, তার একটাতে একজন লোক এসে রয়েছে। তার আবার কলেরা, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।" বণিক বলল ঃ "তিনখানা ঘর না হলে তো আমার চলবে না। তুমি লোকটাকে বাইরে বের করে দিয়ে ঘরখানা ভালো করে পরিষ্কার করে দাও। আমি তোমাকে অনেক টাকা বকশিশ দেব।" চটিওয়ালা খুব গরীব, বকশিশের লোভে সে কলেরা রুগীকে বাইরে এক গাছের তলায় ফেলে রেখে এল। শীতের রাত। সারারাত সেখানে পড়ে থেকে ভোরের দিকে লোকটা মারা গেল।

সকালবেলা বণিক দাঁত মাজতে মাজতে চাকরদের জিজ্ঞাসা করল ঃ "হ্যাঁরে, কালকের সেই রুগীটাকে দেখেছিস? বেঁচে আছে, না মরেছে?" চাকররা বলল ঃ "কাল সারারাত বেঁচে ছিল, আজ ভোরবেলা মারা গিয়েছে।" বণিকের কৌতূহল হল একবার দেখে আসি। গাছতলায় তখন মানুষের ভিড় জমেছে। বণিকও সেখানে এসে উপস্থিত হল। ভিড়ের মধ্যে মারোয়াড় দেশের একটি লোক তখন খুব কাঁদছে আর বলছে ঃ "আহা রে, অমুক বণিকের ছেলে দেশ থেকে আসছিল বাপকে দেখবে বলে, তার কিনা এই দশা হল! ঘরে তার মা, আর বুড়ী ঠাকুমা রয়েছে। বাপের খোঁজে কলকাতায় যাচ্ছিল, তা আর হল না, বেঘোরে মারা গেল গো।" সেই কথা শোনা মাত্র বণিক বুঝতে পারল এ তো আমারই ছেলে। 'আমার ছেলে' একথা মনে হতেই শোকে সে অধীর হয়ে পড়ল, তার আর দাঁড়াবার সামর্থ্য রইল না। মাটিতে বসে পড়ে ছেলের মৃতদেহ সে কোলে তুলে নিল আর বুক চাপড়ে চুল ছিঁড়ে সে কাঁদতে লাগল।

☆ ☆ ☆

সংসারে মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না। মৃত্যুর কোনো কালাকাল নেই। বাপ-মায়ের চোখের সামনে একমাত্র ছেলে চলে যায়, হা-হুতাশ করা ছাড়া বাপ-মায়ের আর কিছু করবার থাকে না। তবে যে-কোনো লোকের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত হই না কেন? অচেনা মানুষের মৃত্যুতে সাময়িক একটা দুঃখ জাগতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই তা আমরা ভুলে যাই। শোকাহত হই তখনই, যখন মৃতের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করি, 'আমার' বলে অভিমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করি। মহাজনেরা সেইজন্যেই 'আমি' 'আমার' এই অভিমান ত্যাগ করার কথা বলে থাকেন। শোক সবই সম্বন্ধজন্য, তাদাত্ম্যবোধের জন্য, মমত্বের দরুণ। মমতার মূলে আবার অহংতা। শোকের পারে যেতে হলে তাই 'আমি' 'আমার' এই বোধটি বিসর্জন দিতে হবে।

সাধুর ফাঁসি

এক সাধু ভিক্ষে করতে এক জমিদারের বাড়িতে গিয়েছেন। জমিদার খুব সমাদর করে তাঁকে নানারকম ভোজ্যদ্রব্য দিলেন বটে, কিন্তু রান্না করবার জন্যে কাঠ বা আগুন জ্বালবার জন্যে দেশলাই দিলেন না। সাধু তখন জমিদারকে বললেন ঃ "আমাকে কিছু কাঠ না দিলে আমি রান্না করব কেমন করে?" সাধুর কথা শুনে জমিদার হেসে বললেন ঃ "সাধুজী, আপনি ঐ গাছতলায় বসে একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আমার বাড়িতে আগুন লাগবে, সেই আগুনে আপনি রান্না সেরে নেবেন।" তাই শুনে সাধুর মনে বড়ো কৌতূহল হল, এ আবার বলে কী? যাই হোক, ব্যাপার কী তা দেখতে হবে, এই ভেবে সাধু তখন এক গাছতলায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই তিনি দেখতে পেলেন জমিদারের বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

এমন সময় জমিদার এসে সাধুকে বললেন ঃ "সাধুজী, এখন তো আগুনের অভাব নেই, আপনি এই আগুনে আপনার রান্না সেরে নিন।" সাধু বললেন ঃ "তোমার দেওয়া কোনো জিনিসই আমি খাব না। কী নিষ্ঠুর লোক তুমি! নিজের ছেলেমেয়ে, পরিবার, গরু-ঘোড়া, ধন-দৌলত সব আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, আগুন যে লাগবে সেকথা তো তুমি আগে থেকেই জানতে, তা সত্ত্বেও তাদের বাঁচাতে কোনো চেষ্টা করলে না, এ কী আশ্চর্য কথা! আমাকে এর জবাব দাও।" সাধুর কথা শুনে জমিদার হাসতে হাসতে বললেন ঃ "সাধুজী, আমি একখানা চিঠি লিখে আপনার হাতে দিচ্ছি। আমার এক সওদাগর বন্ধু আছে, আপনি এই চিঠি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করুন। সে আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে।" সাধু অবাক হয়ে জমিদারের কথা শুনলেন, তারপর চিঠি নিয়ে সওদাগরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন।

সওদাগর তখন একটা জাহাজে মাল বোঝাই করাতে ভয়ানক ব্যস্ত। সে বলল ঃ "সাধুজী, এখন তো আমার বেশি কথা বলবার সময় নেই। এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

GC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জাহাজে মালপত্র নিয়ে এখুনি আমাকে রওনা হতে হবে, আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন। তিন দিনের দিন এই জাহাজ ডুবে যাবে, মালপত্র সব নষ্ট হয়ে যাবে, আপনি আর আমি ছাড়া কে বাঁচবে না। জাহাজের একখানা কাঠ আঁকড়ে ধরে ভাসতে ভাসতে আমরা দুজনে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠব। সেখানে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব।'' শুনে তো সাধুর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তিনি সওদাগরের সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। জাহাজও ছেড়ে দিল।

ঠিক তৃতীয় দিনে ঝড়-জলে সেই জাহাজ ডুবে গেল। সাধু ও সওদাগর একখানা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে কোনোরকমে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠলেন। সেখানে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে সাধু তখন সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ''ভাই, তুমি তো জানতে যে তোমার জাহাজ ডুবে যাবে, জেনেশুনেও কেন তুমি এতে এত টাকার মাল বোঝাই করালে আর নিজের বিপদ হবে জেনেও কেন এই জাহাজে উঠলে?'' সওদাগর হেসে বলল ঃ ''সাধুজী, আমি না হয় সব জেনেশুনে জাহাজে উঠেছি, আপনিও তো জানতেন জাহাজ ডুববে, তবে আপনিই বা কেন জাহাজে উঠলেন? দেখুন সাধুজী, মানুষের কখন কী হবে তা আগে থেকেই সব ঠিক করা আছে, তাকে আটকাবার ক্ষমতা কারুর নেই। সাধু বললেন ঃ ''সে কী কথা! আটকাবার চেষ্টা করলেই তো আটকানো যায়।'' সাধুর কথা শুনে সওদাগর হাসতে লাগল, তারপর বলল ঃ ''সাধুজী, আজ থেকে ঠিক ছ'মাস বাদে অমুক দিনে খোরাসান শহরে সুলতানের বিচারে আপনার ফাঁসি হবে। আগে থাকতেই একথা আপনাকে জানিয়ে দিলাম। দেখুন চেষ্টা করে তা রোধ করতে পারেন কিনা।''

সওদাগরের কথা শুনে সাধুর খুব দুশ্চিন্তা হল। তিনি ভাবলেন, এই সওদাগর ও তার জমিদার বন্ধু যা যা বলেছিল সবই তো দেখছি মিলে গেল, এখন এ যা বলছে তাও তো ফলে যেতে পারে। সাধু তখন এক মরুভূমিতে গেলেন এবং নিজের হাত-পা কেটে সেখানে পড়ে রইলেন। তিনি ভাবলেন আমার তো হাত পা নেই, আমি আর খোরাসানে গিয়ে পড়ব কেমন করে? এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। পথচলতি মানুষ তাঁর দুর্দশা দেখে দয়া করে মুখে কিছু খাবার আর জল দিয়ে যায়। কিন্তু মরুভূমিতে তো বেশি লোক চলাচল করে না, তাই সাধুর খাওয়ার বড়ো কষ্ট হতে লাগল। সাধু ভাবলেন, কেউ যদি আমাকে শহরে পৌঁছে দিত তাহলে বড়ো ভালো হত। শহরে বহু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লোকের বাস, সেখানে যেতে পারলে আমার খাওয়ার কষ্টটা ঘুচবে। সাধু এই ভেবে প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন।

ছ'মাস শেষ হতে আর একদিন মাত্র বাকি এমন সময় একটি লোক গাড়ি নিয়ে তাঁর কাছে এসে বলল ঃ "ভাই, মরুভূমিতে আমার দিকভ্রম হয়েছে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, তুমি আমাকে দিক নির্ণয় করে দিতে পারবে?" সাধু বললেন ঃ "হ্যাঁ ভাই, কোন্ দিকে যেতে হবে তা আমি তোমাকে বলে দেব, তুমি আমাকে তোমার গাড়িতে তুলে নাও আর কোনো শহরের ধারে আমাকে নামিয়ে দিয়ো।" গাড়ির চালক রাজী হয়ে সাধুকে নিজের গাড়িতে তুলে নিল, সাধুও তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর সাধুকে এক শহরের কাছে গাছের তলায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ির চালক নিজের কাজে চলে গেল। সাধু তখন এক পথিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ভাই, এই শহরের নাম কী?" পথিক বলল ঃ "খোরাসান।"

এই সবই হল কালচক্রের খেলা। গাড়ির যে চালক সে হল স্বয়ং কালপুরুষ। সাধুর কালচক্র পূর্ণ হতে চলেছে, তাই চালকের বেশ ধরে যথাসময়ে যথানির্দিষ্ট স্থানে সে সাধুকে পৌঁছে দিয়ে গেল। খোরাসান নাম শুনেই সাধুর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত আমাকে সেই খোরাসানেই আসতে হল! জন্মেছি আমি কাশীতে, ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছিলাম কাশ্মীরে, সেখানে জমিদারের সঙ্গে দেখা। তারপর সওদাগরের সঙ্গে যোগাযোগ, জাহাজডুবি, শেষে হাত পা কাটা অবস্থায় কতকাল পড়ে রইলাম গুজরাটের মরুভূমিতে। আর আজ কিনা এসে পৌঁছলাম এই খোরাসানে। সাধু তখন প্রাণভরে ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন আর প্রহর গুনছেন। সেদিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। সাধুর মনে ভরসা জাগল, যাক্, তাহলে হয়তো আমার ফাঁসি হল না, হাত পা কেটে মরুভূমিতে থেকে বৃথাই এত কষ্ট ভোগ করলাম। এইসব ভাবতে ভাবতে সাধু ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সাধু দেখলেন তাঁর পাশে একটা সদ্যছিন্ন নরমুন্ড পড়ে রয়েছে। সাধুর পা নেই যে সেখান থেকে কোথাও পালিয়ে বাঁচবেন। বেলা হতেই সেখানে লোকের ভিড় জমে গেল, তখন শোনা গেল রাত্রিবেলা সুলতানের ছেলে খুন হয়েছে আর খুনী মাথা নিয়ে উধাও হয়েছে। এ-ও সেই কালপুরুষেরই কীর্তি। সে-ই কাটা মুন্ডু সাধুর কাছে ফেলে রেখে গিয়েছিল। সেপাইরা এসে দেখল সাধুর পাশে সুলতানের ছেলের মাথা পড়ে রয়েছে। তারা তখন সাধুকে ধরে নিয়ে গেল সুলতানের কাছে। সাধু বললেন ঃ "হুজুর,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার তো হাত পা নেই, আমি কেমন করে আপনার ছেলের মাথা কাটব?" সুলতান তখন পুত্রশোকে ব্যাকুল। তিনি বললেন : "তুমি যে একাজ করোনি তা ঠিক, কিন্তু তুমি জানো কে আমার ছেলেকে খুন করেছে আর সব জেনেশুনেও খুনীকে তুমি আড়াল করতে চাইছ, তার নাম বলছ না। সেই অপরাধে অবশ্যই তোমার ফাঁসি হবে।" এই বলে সুলতান কোতোয়ালকে হুকুম দিলেন : "সাধুকে ফাঁসিতে ঝোলাও।" মরবার আগে সাধু এই দোঁহাটি শোনালেন :

কঁহা কাশী কঁহা কাশ্মীর কঁহা খোরাসান গুজরাত।
পর সে রাম এ জীবকো প্রারব্ধ লে জাত।।

সাধুর ফাঁসি হয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করে গেলেন যে জীবকে প্রারব্ধই গন্তব্যপথে টেনে নিয়ে যায় এবং যা ঘটবার সেটি ঘটায়।

☆ ☆ ☆

জগতে ভগবান কালরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। এই হল তাঁর বিশ্বরূপ, বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত রূপ। যেখানে যা-কিছু পরিণাম, পরিবর্তন, সব এই কালরূপী পরমাত্মাই ঘটিয়ে চলেছেন। সবই তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট, নির্ধারিত হয়ে আছে। যখন যেখানে যেটি ঘটবার তিনিই ঘটাচ্ছেন। তা এড়িয়ে যাবার বা বদলে দেবার শক্তি কারুর নেই। একেই বলে 'প্রারব্ধ' অর্থাৎ যা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ যে কালের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছে, তাকে থামানো বা তার গতিবেগ কমানো, বাড়ানো বা ঘোরানো কোনো মানুষের সাধ্য নয়। ভক্ত তাই জীবনকেও অভিনন্দন করেন না, মরণকেও বরণ করেন না, চেয়ে থাকেন শুধু কালের দিকে, ভৃত্য যেমন তার মনিবের নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকে। তিনি যখন যেখানে দাঁড় করাবেন বা তাকে দিয়ে যে কর্ম করাবেন, ভৃত্য সেই নির্দেশই শুধু পালন করে যাবে। কালচক্রের আবর্তন থেকে ছুটি দেবার মালিকও তিনিই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করলে মানুষকে শুধু হায় করে মরতে হয়, 'এ কী হল' বলে বিলাপের তার আর অন্ত থাকে না।

রাজা জনমেজয়ের কুষ্ঠরোগ

রাজা জনমেজয় একদিন ব্যাসদেবের কাছে নিজের ভাগ্য গণনা করাতে গেলেন। ব্যাসদেব বললেন : "রাজা, কেন মিছিমিছি ভাগ্য গণনা করাতে চাও, ওতে কী লাভ? যা ঘটবার তা তো ঘটবেই।" রাজা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বললেন ঃ "যদি জানতে পারি ভাগ্যে কোনো গ্রহের দোষ রয়েছে, তাহলে তার প্রতিকার করাব।" ব্যাসদেব হেসে বললেন ঃ "কিছুদিনের মধ্যে তোমার শরীরে আঠার রকমের কুষ্ঠ হবে। দেখো চেষ্টা করে যদি তা রোধ করতে পারো।" এই বলে ব্যাসদেব জনমেজয় রাজাকে তাঁর ভবিষ্যৎ বলতে শুরু করলেন।

ব্যাসদেব বললেন ঃ "দেখো রাজা কখনো তুমি যেন যজ্ঞের ঘোড়া কিনো না। তবে আমি জানি আমার এ উপদেশ তুমি শুনবে না, যজ্ঞের ঘোড়া তুমি কিনবেই। বেশ, ঘোড়া না হয় কিনলে, কিন্তু ভুলেও কখনো সেই ঘোড়ায় চেপে দক্ষিণ দিকে যেয়ো না। তাও তুমি শুনবে না, সেই দক্ষিণ দিকেই তুমি যাবে। সেখানে যদি কোনো মেয়েকে দেখতে পাও, আমি বারণ করছি, তাকে তুমি বিয়ে কোরো না; জানি, আমার এই নিষেধ অমান্য করে তুমি তাকেই বিয়ে করবে। তবুও আমি বলছি, সে যেন তোমার পাটরানী হয়ে না বসে। আমার এই নিষেধও তোমার মনে থাকবে না, সেই মেয়েকেই তুমি পাটরানী করবে। তবে দেখো, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেন কোনো যজ্ঞ কোরো না। কিন্তু বৃথাই তোমাকে সাবধান করা। ঐ পাটরানীকে সঙ্গে নিয়েই তুমি যজ্ঞ করতে বসবে। আর শেষবারের মতো তোমাকে সাবধান হতে বলছি। দেখো যেন কোন অল্পবয়সী ব্রাহ্মণকে সেই যজ্ঞে নিযুক্ত কোরো না। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে কোনো লাভ নেই। আমার এই নিষেধ অগ্রাহ্য করে তুমি তোমার যজ্ঞে অল্পবয়সী ব্রাহ্মণদেরই বরণ করবে, যজ্ঞের সময় সেই ব্রাহ্মণেরা হাসাহাসি করবে, তাই দেখে তুমি ভয়ানক রেগে গিয়ে তাদের মাথা কেটে ফেলবে আর সেই পাপে তোমার কুষ্ঠ হবে। আঠারজন ব্রাহ্মণ তোমার হাতে মারা পড়বে আর তাইতেই তোমার দেহে আঠার রকমের কুষ্ঠ হবে।"

এইভাবে রাজার ভবিতব্যের কথা বলে এবং তাঁকে সমাধান করে দিয়ে ব্যাসদেব বললেন ঃ "ভবিষ্যতে জীবনে যা যা ঘটবে সবই তো তোমাকে বলে দিলাম, এখন দেখো আটকাতে পারে কিনা।" রাজা বললেন ঃ "আপনার কথা আমার মনে থাকবে। যজ্ঞ আমি কোনদিনই করব না।" এই বলে রাজা রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

কিছু দিন বাদে যজ্ঞের উপযুক্ত সুলক্ষণযুক্ত একটি সুন্দর ঘোড়া নিয়ে এক অশ্ববিক্রেতা সেই রাজ্যে এসে উপস্থিত হল। ব্যাসদেবের কথা স্মরণ করে রাজা সেই ঘোড়া কিনতে চাইলেন না। তখন পাত্র-মিত্র সকলে বলতে লাগল ঃ "মহারাজ, আপনি এই ঘোড়া কিনলেন না, কিন্তু এই নিয়ে আপনার শত্রুরা হাসাহাসি করবে, তারা বলবে যে যজ্ঞের ঘোড়া কিনবার ক্ষমতা আপনার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নেই।" রাজা ভাবলেন, তাইতো, এরা তো ঠিক কথাই বলেছে। তা ঘোড়াটা কিনলেই বা ক্ষতি কী, আমি ওতে না চড়লেই হল। এই ভেবে রাজা ঘোড়াটা কিনে নিলেন।

আবার কয়েকদিন কাটল। একদিন রাজার শখ হল ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়িয়ে আসবেন। তিনি অশ্বপালকে ঘোড়া নিয়ে আসতে হুকুম করলেন। অশ্বপাল দেখল এমন সুন্দর একটা ঘোড়া থাকতে মহারাজকে অন্য ঘোড়া দিই কেন। এই ভেবে সে নতুন কেনা সেই ঘোড়াটাকে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা তখন ভাবলেন, এমন চমৎকার ঘোড়াটা কিনেছি, একবার না চড়ে কি থাকা যায়? ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ দিকে নাইবা গেলাম। এই মনে করে রাজা যেই ঘোড়ায় চেপে বসেছেন অমনি সেই ঘোড়া সোজা দক্ষিণ দিকে ছুটতে লাগল।

এইভাবে কিছুদূর যাবার পর রাজা দেখতে পেলেন পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তার হাতে একগাছা বরণমালা। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "সুন্দরী, তুমি কাঁদছ কেন?" মেয়েটি বলল ঃ "আমি মনে মনে রাজা জনমেজয়কে পতিত্বে বরণ করেছি, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পেলাম না। সেই দুঃখেই আমি কাঁদছি।" রাজা বললেন ঃ "আমিই রাজা জনমেজয়।" একথা শুনে মেয়েটি রাজার গলায় মালা পরিয়ে দিল। অপূর্ব রূপসী এমন মেয়েকে পত্নীরূপে পেয়ে পরম সমাদরে রাজা তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে পাটরাণীর পদে অভিষিক্ত করলেন। এমন সময় ব্যাসদেবের কথা রাজার মনে পড়ে গেল। রাজা তখন ভাবলেন, ব্যাসদেবের আদেশ তো আমি অমান্য করেছি, এখন কী করা যায়? যা হবার তা তো হয়েছে, এখন আমি বরং সাবধান হই। রাজা তখন স্থির করলেন যে কিছুতেই তিনি যজ্ঞ করবেন না।

কিছুকাল পরে রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। প্রজারা তখন রাজার নামে ছি ছি করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, রাজা তো কেবল নতুন বউ নিয়ে অন্দরমহলে ফুর্তি করে দিল কাটাচ্ছেন। এদিকে যজ্ঞের ঘোড়া কিনেছেন অথচ যজ্ঞ করবার নাম করছেন না। তাইতেই তো রাজ্যের এই হাল হয়েছে, অনাবৃষ্টিতে সব জ্বলে পুড়ে গেল। এমন রাজার রাজত্বে বাস না করাই ভালো। প্রজাদের এইসব কথা শুনে রাজা ঠিক করলেন যে তিনি যজ্ঞ করবেন কিন্তু যজ্ঞে অল্পবয়সী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করবেন না। তিনি তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন বলে মনস্থ করলেন এবং সেইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে যজ্ঞের জন্যে যেন প্রবীন ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিধিলিপি তো খণ্ডন করা যায় না, তাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রবীণ ব্রাহ্মণও মিলল না। অগত্যা বাধ্য হয়েই আঠারজন নবীন ব্রাহ্মণকে যজ্ঞের কাজে বরণ করা হল।

পাটরাণীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা যজ্ঞ করতে বসেছেন। ঘোড়ার এক একটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ অঞ্জলিতে নিয়ে 'অগ্নেয় স্বাহা' বলে রাজা ও রানী অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। যখন তাঁরা ঘোড়ার লিঙ্গ নিয়ে আহুতি দিতে যাচ্ছেন তখন অল্পবয়সী ব্রাহ্মণেরা তাই দেখে হাসতে শুরু করল। রাজা রাগ সামলাতে পারলেন না। তাঁর হাতের কাছেই তরোয়াল ছিল, তাই দিয়ে তিনি সেই আঠারজন নবীন ব্রাহ্মণের মাথা কেটে ফেললেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহে আঠার রকমের কুষ্ঠ দেখা দিল।

জনমেজয়ের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাসদেব উপস্থিত ছিলেন। রাজা তখন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "আপনি তো ভূত-ভবিষ্যতের কথা সমস্তই জানেন। কোন্ উপায়ে আমি এই কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হব আপনি বলে দিন।" ব্যাসদেব বললেন ঃ যেদিন তুমি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত শুনবে, সেইদিন এই পাপব্যাধি থেকে মুক্ত হবে।

* * *

যা অদৃষ্টে আছে তা তো ঘটবেই, তাকে কেউ আটকাতে পারে না। তাই অনর্থক ভাগ্য গণনা করিয়ে লাভ কী? আগে থাকতে ভবিষ্যতের কথা জেনে নিয়ে সুখ বা দুঃখে হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে মানুষের উচিত বর্তমান সময়টুকুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। ভগবান আমাদের তো কতরকম শুভবুদ্ধি দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ জানতে পারলে তাতে যদি আমাদের কল্যাণ হত তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের তা জানবার বুদ্ধিও দিতেন। তা যখন দেননি তখন ধরে নেওয়া উচিত যে ভবিষ্যৎ জেনে আমাদের কোন লাভ নেই। নিত্য বর্তমানে থাকাই হল বুদ্ধিমানের কাজ, সামনে বা পিছনে, ভবিষ্যতে বা অতীতে দৃষ্টিক্ষেপ না করে এই মুহূর্তটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য।

কালের ছোবল

এক রাজা ভাগ্য গণনা করিয়ে দেখলেন যে সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হবে। পাত্র-মিত্র সকলে পরামর্শ করে ঠিক করল যে রাজার জন্যে এক সাতমহলা বাড়িতৈরি করাতে হবে। সেখানে ভিতরের মহলে রাজা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকবেন এবং এমনভাবে তাঁকে পাহারা দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে যাতে কোন সাপ ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। সেভাবে নতুন করে রাজার প্রাসাদ তৈরি হল এবং রাজা তাঁর রক্ষীদের নিয়ে সেখানে বাস করত লাগলেন। কিন্তু এত কাণ্ড করেও রাজাকে বাঁচানো গেল না। একদিন খোলা জানলা দিয়ে হাওয়ায় এক টুকরো খড় এসে তাঁর গায়ে পড়ল আর দেখতে দেখতে সেই খড় সাপের রূপ ধারণ করে তাঁকে দংশন করল। রক্ষীরা তখনই মার মার শব্দে সাপের পিছনে তাড়া করে গেল, কিন্তু সাপকে আর ধরা গেল না, সাপ তাদের পিছনে ফেলে বহুদূর চলে গেল। কেবল একজন রক্ষী তখনো সাপের পিছন ছাড়েনি। সে দেখতে পেল যে চলতে চলতে সাপটা হঠাৎ মানুষের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রক্ষী তখন সেই মানুষের মূর্তির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ভাই, তুমি কে?" সে বলল ঃ "আমি কালপুরুষ। জীবের যখন কাল পূর্ণ হয়ে যায় তখন আমিই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে তাঁকে বধ করি, তারপর তাকে নিয়ে যাই যমরাজের কাছে।" রক্ষী তখন বলল ঃ "রাজাকে তো তুমি মারলে। এখন তুমি কী করবে?" কালপুরুষ বলল ঃ "সামনের ঐ পুকুরে এখনই একজন লোক জল খেতে আসবে আর রাস্তায় ঐ যে ষাঁড়টা বসে রয়েছে, ঐ ষাঁড়টা তার পেটে এমন গুঁতো মারবে যে তাতেই লোকটার মৃত্যু হবে। এই কাজটা সেরে তখন আমি অন্য কাজে হাত দেব।" এই বলে কালপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেল। রক্ষীও তখন পুকুরের ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় সে দেখতে পেল একজন লোক পুকুরের দিকে এগিয়ে আসছে, কিন্তু ষাঁড়টা পথ আটকে বসে রয়েছে দেখে লোকটা তাকে মারবে বলে একখানা পাথর তুলে নিল। রক্ষী তখন লোকটাকে বলল ঃ "ভাই, এখানে আর এক মুহূর্তও তুমি দাঁড়িও না, ষাঁড়টাকেও মেরো না বা জলও খেয়ো না। জল খেলেই তুমি মারা পড়বে।" রক্ষীর কথা শুনে লোকটি বলল ঃ "বাঃ! সুন্দর কথা বলছ দেখছি। পিপাসায় আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সামনে এমন চমৎকার জল রয়েছে, সেই জল খাব না? আর তুমি বলছ কিনা জল খেলেই আমি মরে যাব! কোথাকার পাগল তুমি?" লোকটা রক্ষীর কথা শুনল না, পাথর ছুড়ে ষাঁড়টাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে পুকুরে নেমে সে প্রাণ ভরে জল খেয়ে নিল। যেমনি সে জল খেয়ে পুকুর থেকে উঠে এসেছে, অমনি ষাঁড়টা তেড়ে এসে তার পেটের মধ্যে শিং ঢুকিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মরে গেল।

কালপুরুষ তখনই আবার ফিরে এল। রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "এবার কী করবে তুমি?", কালপুরুষ বলল ঃ "এই রাস্তা দিয়ে দুই সেপাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাবে ঘোড়ায় চড়ে। আমাকে দেখে তারা দুজনেই মুগ্ধ হয়ে যাবে আর আমাকে পাওয়ার জন্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দুজনেই মরবে।" এই বলে কালপুরুষ সেখান থেকে সরে গেল। রক্ষী দেখল দুজন সেপাই ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তারা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় রক্ষী তাদের বলল ঃ "ভাই সাবধান। পথে যদি কোনো মেয়েকে দেখতে পাও তাহলে ভুলেও তার দিকে তাকিয়ো না। যদি তাকাও তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হবে।" সেপাইরা রক্ষীর কথায় কান দিল না, তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে তারা চলে গেল। রক্ষী হঠাৎ দেখতে পেল তাদের সামনে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটিকে দেখেই দুই সেপাই ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে ছুটে গেল এবং কে মেয়েটিকে দখল করবে এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। এ বলে আমি নেব, ও বলে আমি নেব, কেউই ছাড়বার পাত্র নয়। তখন দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং দুজনের তরোয়ালের ঘায়ে দুজনেই আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করল।

কালপুরুষ আবার এসে সামনে দাঁড়াল। রক্ষী জিজ্ঞাসা করল ঃ "ভাই এবার তোমার কাজ কী?" কালপুরুষ বলল ঃ "ঐযে দেখছ গোয়ালাটা গরু দুইবে বলে তোড়জোড় করছে, তার গরু তাকে এমনি লাথি মারবে যে সঙ্গে সঙ্গে সে মরে যাবে।" এবারও কালপুরুষ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। রক্ষী তখন গোয়ালাকে অনুরোধ করল ঃ "ভাই, আজ আর তুমি গরুটাকে দুইয়ো না, দুধ দোয়ালে তুমি মরে যাবে।" গোয়ালা রেগে গিয়ে বলল ঃ "বাজে কথা বলবার আর জায়গা পেলে না। দুধ না দুইলে গরু আমার খারাপ হয়ে যাবে, তখন ছেলেপিলে নিয়ে কি না খেয়ে মরব? রোজ দুবেলা গাই দুইছি, তাতে মরলাম না, আর আজ তোমার কথাতেই মরে যাব? যত সব আহাম্মকের দল।" গোয়ালা কোনো কথা শুনল না, দুধ দুইতে আরম্ভ করল আর অমনি গরুটা তাকে এমন এক লাথি মারলে যে তাতেই বেচারার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

আবার কালপুরুষ এসে হাজির। রক্ষী আবার তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "এবার কোন্ কাজে যাবে?" কালপুরুষ বলল ঃ "সামনের ঐ বটগাছের নিচে পথিক এসে বসবে আর তখনই এক সাপের কামড়ে সে মারা যাবে।" কালপুরুষ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন এক পথিককে বটগাছের কাছে আসতে দেখে রক্ষী অনুনয় করে বলল ঃ "ভাই, দোহাই তোমার, বটগাছের নিচে বোসো না, এখুনি তোমাকে সাপে কাটবে।" পথিক বিরক্ত হয়ে বলল ঃ "কী বাজে কথা বলছ! পথ চলতে চলতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বটগাছের ছায়া মিলেছে, খানিকটা বিশ্রাম না করে আমি যাব না। এমন পরিষ্কার জায়গায় সাপ তুমি কোথায় দেখলে?" এই বলে পথিক সেই গাছের তলায় বসামাত্র কোথা থেকে এক সাপ এসে তাকে ছোবল মারল আর পথিকও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

আবার কালপুরুষ সামনে এসে দাঁড়াতে রক্ষী জিজ্ঞাসা করল ঃ " তোমার এবার কাজ কী?" কালপুরুষ বলল ঃ "দেখো ভাই, এখন তো তোমার কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, কদিন বাদেই তোমার ফাঁসি হবে।" রক্ষী এতগুলো ঘটনা নিজের চোখে ঘটতে দেখেছে, তাই কালপুরুষের কথায় তার মনে কোনো সন্দেহ জাগল না। তাহলে এখন করি কী? সাধু হয়ে যাব? কালপুরুষ বলল ঃ "সাধু হয়েও তোমার কোনো লাভ হবে না, তোমার কাল পূর্ণ হয়ে আসছে, ফাঁসি তোমার হবেই। তবে তোমাকে আমি একটা রুদ্রাক্ষ দিচ্ছি, সেটা তুমি কণ্ঠে ধারণ কোরো। ফাঁসিতে তোমার মৃত্যু হবার পর যমদূত তোমাকে ছুঁতে পারবে না, রুদ্রাক্ষের প্রভাবে শিবের দূত এসে তোমাকে কৈলাসে নিয়ে যাবে।"

রক্ষী তখন প্রথম সাধু হয়ে গেল এবং বনের মধ্যে এক পর্ণকুটীর তৈরি করে সেখানে সাধন-ভজন নিয়ে দিন কাটাতে লাগল। কদিন বাদে সেই দেশের বাদশার ঘরে একজন খুন হয়ে গেল। খুনীরা জঙ্গলের ভিতর সাধুর আস্তানা রয়েছে দেখে নিরাপদ ভেবে সেখানেই গিয়ে লুকিয়ে রইল। এদিকে বাদশার সেপাইরা খুনীর সন্ধানে চারিদিক তোলপাড় করতে করতে সাধুর ঘরে এসে যখন দেখল যে তারা সেখানে লুকিয়ে রয়েছে, তখন তারা খুনীদের সঙ্গে সাধুকেও ধরে নিয়ে গেল বাদশার কাছে। বাদশার হুকুমে সেই খুনীদের সঙ্গে সাধুরও ফাঁসি হয়ে গেল।

☆ ☆ ☆

কালপূর্ণ হলে সবাইকে চলে যেতে হয়, কালকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, মরবার কথা নয় অথচ অতি তুচ্ছ কারণেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। আবার কাল যদি পূর্ণ না হয়ে থাকে তাহলে যত সংকটেই মানুষ পড়ুক না কেন, তার কিছুতেই প্রাণ বিয়োগ হবে না। সে জলে ডুবুক, আগুনে পড়ুক, বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যাক, যেকোনো প্রকারে হোক তার প্রাণ রক্ষা পাবে। তবে কার যে কখন কাল পূর্ণ হবে তা কেউ বলতে পারে না, তা একমাত্র বিধাতাই জানেন। কাজেই মৃত্যুর কথা ভেবে অনর্থক দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শবরীর উপাখ্যান

শবরী ছিল ভিলের মেয়ে। একদিন ঘুরতে ঘুরতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমের কাছে এসে দেখতে পেল মুনি শিষ্যদের সঙ্গে নানারকম সৎপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছেন। সেই আলোচনার কিছু কিছু শবরীর কানে যেতে তার মনপ্রাণ আনন্দে ভরে গেল এবং সমস্ত হৃদয় জুড়ে এক পবিত্র ভাবের সঞ্চার হল। এমন সুন্দর আলোচনা আগে সে কখনো শোনেনি, তাই আরও শুনবার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু সে যে ভিলের মেয়ে, মুনির কাছে বসে শিষ্যদের সঙ্গে উপদেশ শুনবার অধিকার তো তার নেই। তখন সে ভাবতে লাগল কেমন করে এদের কাছে থাকা যায়। ভাবতে ভাবতে সে একটা উপায় খুঁজে পেল। সে রোজ বন থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে অতি গোপনে মুনির আশ্রমে পৌঁছে দিতে লাগল।

রোজ রোজ এইভাবে আশ্রমে শুকনো কাঠ আসছে দেখে মুনি শিষ্যদের বললেন ঃ "একবার খোঁজ করে দেখো তো কে রোজ এখানে শুকনো কাঠ রেখে যাচ্ছে।" শিষ্যরা খোঁজ নিয়ে মুনিকে জানাল ঃ "গুরুদেব, এক ভিলের মেয়ে রোজ কাঠ নিয়ে এসে আশ্রমে রেখে যায়, কাঠের জন্যে কোনো দামও সে নেয় না।" শুনে মতঙ্গ মুনি খুশি হলেন। তিনি শবরীকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হ্যাঁগো, রোজ তুমি কাঠ দিয়ে যাচ্ছ, অথচ তার জন্যে পয়সা নিচ্ছ না কেন বলো তো?" শবরী বলল ঃ "বাবা পয়সার কোনো দরকার নেই, আমি শুধু আপনার সেবা করতে পেলেই ধন্য হব। আমি ভিলের মেয়ে, নীচ কুলে আমার জন্ম, কী করেই বা আমি আপনার সেবা করতে পারি? তাই আপনার রান্না করবার সুবিধে হবে ভেবে আমি বনের শুকনো ডালপালা আপনার আশ্রমে রেখে যাই।" মুনি বললেন ঃ "বাছা, রোজ এই আশ্রমে তুমি প্রসাদ পেয়ো আর রোজ আশ্রমের আঙিনা তুমি পরিষ্কার করে দিয়ো।"

মতঙ্গ মুনির ব্যবস্থামতো পরম আনন্দে শবরীর দিন কাটতে লাগল। রোজ সে শুকনো কাঠ এনে দেয়, আঙিনা পরিষ্কার করে, আশ্রমে প্রসাদ পায়, এইভাবে সব সময় সে সাধুদের সঙ্গ পেতে থাকে। একদিন সে শুনতে পেল সাধুরা সবাই আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন। দুঃখে শবরীর বুক ফেটে গেল, তার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। মুনির কাছে গিয়ে সে বলল ঃ "বাবা, আপনারা চলে গেলে আমার কী দশা হবে, আমি কী নিয়ে থাকব?" মুনি তাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ "বাছা, তুমি কেঁদো না, তোমার মতো ভাগ্যবতী কে আছে? তুমি এই আশ্রমেই থাকো আর একমনে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করো। ভগবান রামচন্দ্র একদিন নিজে এসে এই আশ্রমে তোমাকে দর্শন দেবেন আর তখনই তোমার জীবন পরম সার্থকতায় ভরে উঠবে।"

মুনির বাক্য বিফল হবার নয়। যথাসময়ে রামচন্দ্র এসে শবরীকে দর্শন দিলেন এবং ত্রিলোকপাবন শ্রী রামচন্দ্রের কৃপায় ভক্তিমতী শবরীর জীবন ধন্য হয়ে গেল।

☆ ☆ ☆

সৎসঙ্গের মহিমা বলে শেষ করা যায় না। বনের মেয়ে শবরী, নীচ কুলে তার জন্ম। সৎসঙ্গের প্রভাবে সে-ও তপস্যা করতে শিখল, গুরু-মহাজনের কথায় অটল বিশ্বাসে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে লাগল দীর্ঘকাল, আর তার সেই তপস্যায় ভগবানকে একদিন আসতেই হল তার দুয়ারে।

আমরা সংসার নিয়েই মত্ত হয়ে আছি, ভগবানের দিকে আমাদের মন যায় না। ভগবানের প্রতি এই যে অরুচি তা দূর করতে হলে পাঁচন সেবন করতে হয়। সেই পাঁচন হল সৎসঙ্গ। ভাগবত তাই বলেছেন ঃ 'মহৎ সেবয়া,' সৎপুরুষের, মহাজনের সেবায় হয় 'বাসুদেবকথারুচিঃ', ভগবানের কথায় রুচি আর অনুরাগ জন্মায়। নারদ ভক্তিসূত্রে তাই বলেছেন ঃ 'তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্', তাই সাধো, তাই সাধো, সাধুর সঙ্গই একমাত্র সাধবার জিনিস। শবরীর উপাখ্যান তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নির্জনে পায়রা বধ

এক মহাত্মার কাছে দুজন লোক এসে বলল ঃ "বাবা, আমরা আপনার শিষ্য হতে চাই, আপনি আমাদের কৃপা করুন"। মহাত্মা লোক দুজনের হাতে একটা করে পায়রা দিয়ে বললেন ঃ "আগে তোমরা একটা কাজ করো দেখি। যেখানে কেউ দেখতে পাবে না এমন কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে যে যার পায়রা মেরে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারপর তোমাদের দীক্ষার কথা ভাবা যাবে।" লোক দুজন পায়রা দুটো নিয়ে চলে গেল।

একজন পায়রা নিয়ে নিজের বাড়িতে গেল। তারপর ঘরের দরজা জানলা ভালো করে বন্ধ করে পায়রা মেরে মহাত্মার কাছে নিয়ে এসে বলল ঃ "বাবা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেখানে কেউ ছিল না এমন এক নির্জন জায়গায় আমি পায়রাটাকে মেরেছি। মারবার সময় কেউ দেখতে পায়নি।" লোকটার কথা শুনে মহাত্মা বললেন ঃ "সেকি কথা! নির্জন জায়গা তুমি কোথায় পেলে? কেউ দেখতে পায়নি বলছ, কেন, সেখানে তুমি ছিলে না? তুমি দেখো নি? তুমি কি তবে মানুষ নও? দেখো, আমার কাছে তোমার দীক্ষা হবে না, এখনো তুমি আমার শিষ্য হবার উপযুক্ত হওনি।" এই বলে মহাত্মা তাকে বিদায় দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় লোকটি জ্যান্ত পায়রা নিয়ে মহাত্মার কাছে নিয়ে এসে বলল ঃ "বাবা, পায়রা মারবার জন্য কোন নির্জন জায়গা আমি খুঁজে পেলাম না। অন্য কোন লোক না থাকলেও আমি তো সেখানে ছিলাম, পায়রা মারবার সময় আর কেউ দেখতে না পাক, আমি তো দেখতে পাব। তাই ভাবলাম যে আমিও তো একটা মানুষ, আমার সামনে আমি যদি পায়রাটাকে মারি তাহলে তো আপনার আদেশ অমান্য করা হবে এইকথা মনে হতে পায়রা ফেরৎ নিয়ে এলাম।"

মহাত্মা লোকটির উপর খুব খুশি হয়ে বললেন ঃ "দেখো বাবা, আমি তোমাদের দুজনকে পরীক্ষা করবার জন্যই পায়রা দুটো দিয়েছিলাম। নইলে মহাজনেরা কখনো জীব হত্যার পরামর্শ দেন না। এখন বুঝলাম তুমি আমার শিষ্য হবার উপযুক্ত।"

☆ ☆ ☆

শিষ্য হব বললেই শিষ্য হওয়া যায় না, তার জন্য প্রস্তুতি চাই। শিষ্যের জন্যে গুরু যে কাজ নির্দিষ্ট করে দেন, সেই কাজ পরিশ্রম করে করতে হবে শিষ্যকে, শিষ্যের হয়ে গুরু তা করে দেবেন না। তাই গুরুর নির্দেশ পালন করার যোগ্যতা শিষ্যের আছে কিনা তা জানবার জন্য গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করে নেন। কাজের ভার দিয়ে তিনি কৌশলে যাচাই করে নেন শিষ্যের যথার্থ বোধ জেগেছে কিনা।

সবচেয়ে খারাপ জিনিস কী

গুরুর এক শিষ্য রোজ তাঁর কাছে ব্রহ্মমন্ত্র দেবার আবদার করত। গুরু ভাবলেন একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে শিষ্য ব্রহ্মমন্ত্র লাভ করবার উপযুক্ত হয়েছে কিনা। এই ভেবে তিনি শিষ্যকে বললেন ঃ "তুমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিছুদিন তীর্থ করে এসো, তারপর ব্রহ্মমন্ত্র দেওয়া যাবে। তবে তীর্থ থেকে ফিরবার সময় সবচেয়ে খারাপ যে জিনিস দেখতে পাবে, তাই আমার জন্যে নিয়ে এসো।"

শিষ্য বহু তীর্থ ঘুরে বেড়াল। ফিরবার সময় তার চিন্তা হল বিষ্ঠার চেয়ে খারাপ আর তো কোনো জিনিস নজরে পড়ে না, তাহলে গুরুদেবের জন্যে খানিকটা বিষ্ঠাই নিয়ে যাই। এই ভেবে যেমনি সে মাঠ থেকে বিষ্ঠা তুলতে গিয়েছে অমনি বিষ্ঠা তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল ঃ "খবরদার, তুমি আমাকে ছোঁবে না। আমাকে নিয়ে তোমার কী দরকার?" শিষ্য বলল ঃ "গুরুদেব বলে দিয়েছেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিতে হবে। তা তোমার চেয়ে খারাপ জিনিস তো আর কিছু নেই।"

শিষ্যের কথা শুনে বিষ্ঠা ভয়ানক রেগে গেল। সে বলল ঃ "তার মানে? তুমি ভাবছ আমার চেয়ে তুমি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মোটেই তা নয়। জেনে রেখো তোমার চেয়ে আমি শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কালকেই আমি কতরকম উপাদেয় জিনিস ছিলাম, দেবতারাও আমাকে ভোগ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন আর কতরকম নামই না ছিল আমার— পুরি, কচুরি, মেঠাই, আরও কত কি, আর কী তার সৌরভ। আর দেখো, দু-চার ঘণ্টা তোমাদের সংসর্গে থেকেই আজ আমার কী দশা হয়েছে, এখন আমার নাম হয়েছে বিষ্ঠা। কোথায় গেল আমার সেই সুগন্ধ, তোমাদের সঙ্গদোষে এখন এই দুর্গন্ধ নিয়ে আমি পড়ে আছি। আর আমি তোমাদের সংসর্গে যাচ্ছিনে, গেলে না জানি আরও কত দুর্দশায় আমাকে পড়তে হবে। এখনো শুয়োরের পাল কত আদর করে আমাকে খাচ্ছে, কৃষকেরা মাটিতে সার দেবে বলে কত যত্ন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এখনো আমি কত কাজে লাগছি, কত আদর পাচ্ছি। এখন নিজেই বুঝে দেখো আমি খারাপ, না তুমি খারাপ। তোমাদের কাছে থেকেই আজ আমার এই দশা, আর তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে বসে আছ। খবরদার বলছি তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।"

বিষ্ঠার কথা শুনে শিষ্যের চৈতন্য হল। সে তখন বুঝতে পারল যে এই মল-মূত্র-পুঁজ-রক্ত-ভরা শরীরই হল সবচেয়ে খারাপ জিনিস। শিষ্য এসে দাঁড়াল গুরুর কাছে। গুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি আমার জন্যে খারাপ জিনিস কী নিয়ে এলে?" শিষ্য বলল ঃ "গুরুদেব, আমি অনেক ভেবে দেখলাম আমার এই শরীরটার চাইতে খারাপ জিনিস আর কিছু নেই, তাই নিজেকেই আমি আপনার পায়ে সঁপে দিলাম।" গুরুদেব দেখলেন এতদিনে শিষ্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মেছে, তাই এবার তিনি তাকে ব্রহ্মমন্ত্র দিতে দ্বিধা করলেন না।

☆ ☆ ☆

যে যেমন অধিকারী সদ্‌গুরু তাকে সেইভাবে উপদেশ দেন, কাজেই কার কোন্ অধিকার সেটা গুরুকেই যাচাই করে নিতে হয়। জন্ম-সংস্কার, পরিবেশ ইত্যাদির বিভিন্নতার দরুণ শিক্ষারও তারতম্য হয়ে থাকে। দেহটাকে নিকৃষ্ট মনে করা, তুচ্ছ মনে করা যেমন কোনো সাধকের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে, তেমনি এই দেহে ভগবানের অধিষ্ঠান, কাজেই দেহটাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়— এই ভাবও অনেক সাধককে অধ্যাত্মপথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মোট কথা, আধ্যাত্মিক উন্মেষের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন সাধকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশ সদ্‌গুরু দিয়ে থাকেন। একেই বলে অধিকারভেদ।

নামেতে নামী মেলে

এক সাধু অনেকদিন ধরে তপস্যা করেছেন, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের দর্শন পাননি। একদিন তিনি দৈববানী শুনলেন ঃ "বৎস, দুঃখ কোরো না, নিজের চেষ্টায় তুমি ভগবানকে লাভ করতে পারবে না। তুমি একজন উত্তর সাধক খুঁজে নাও, তারই সাধনবলে তোমার ঈশ্বরদর্শন হবে। তোমার সাধনার মধ্যে একটি দোষ রয়েছে, সেটি হল তোমার একাগ্রতার অভাব। গভীর একাগ্রতা যার আছে, এমন কোনো মানুষকে যদি তুমি উত্তরসাধক করতে পারো তাহলে তার সাহায্যে নিশ্চয় তুমি ভগবানের দর্শন পাবে।" দৈববাণী শুনে সাধু তখন তপস্যা বন্ধ রেখে উত্তর সাধকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

এক নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে সাধু দেখতে পেলেন একটি ছেলে ছিপ নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে বসেছে। তার মনে একাগ্রতা কতখানি তা জানবার জন্যে সাধু ছেলেটির পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় এক বরযাত্রীর দল নানারকম বাজনা বাজিয়ে হইহই করতে করতে সেখান দিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল। সাধু দেখলেন ছেলেটি একবারের জন্যেও পিছন ফিরে চাইল না, যেমন ছিপের দিকে তার নজর ছিল তেমনি একমনে সে সেদিকেই তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তার ছিপে যখন মাছ উঠল, তখন সে মাছটাকে গুছিয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রেখে পিছন ফিরে চাইল। ঠিক তার পিছনে সাধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, সাধুকে দেখে ছেলেটি তাঁকে প্রণাম করল। সাধু বললেন : "বাবা, আমি তো অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এতক্ষণ আমাকে প্রণাম করোনি কেন?" ছেলেটি বলল : "মহারাজ, আমি এতক্ষণ আপনাকে দেখতে পাইনি।" সাধু জিজ্ঞাসা করলেন : "আচ্ছা, এইমাত্র যে বরযাত্রীর দল এখান দিয়ে বাজনা বাজিয়ে গেল, তা তুমি দেখেছ তো?" ছেলেটি বলল : "না মহারাজ, আমি বরযাত্রীদের দেখিনি, বাজনাও শুনতে পাইনি। সমস্ত মন আমার মাছের দিকেই পড়ে ছিল।"

ছেলেটির কথা শুনে সাধু অবাক হয়ে গেলেন। এমন একাগ্রতা, এমন তন্ময়তা তিনি কখনো কারুর মধ্যে দেখেননি। তিনি ভাবলেন একে যদি উত্তরসাধক করতে পারি, তাহলে এর দৌলতেই আমার ঈশ্বর দর্শন হয়ে যেতে পারে। এই ভেবে ছেলেটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "হ্যাঁ বাবা, মাছ ধরে তুমি রোজ কত রোজগার করো।" ছেলেটি বলল : "চার আনা।" সাধু তখন তাকে বললেন : "তোমাকে আর মাছ ধরতে হবে না। আমি তোমাকে রোজ এক টাকা করে দেব যদি তুমি আমার কাজ করতে রাজী থাকো। দেখো বাবা, আমার একটি ছোটো ছেলে আছে, কিন্তু তাকে আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি তাকে খুঁজে বের করে দাও।" ছেলেটি রাজী হয়ে বলল : "আপনার ছেলে কেমন দেখতে আর কোথায় কীভাবে তার খোঁজ করতে হবে তা আমাকে বলে দিন, আমি ঠিক তাকে খুঁজে বের করে দেব।" তখন সাধু বললেন : "আমার ছেলের গায়ের রং নবীন মেঘের মতো, তার কুঞ্চিত কেশ, মাথায় তার শিখিপুচ্ছের চূড়া, পায়ে নূপুর, হাতে বাঁশি, বিজলীর মতো তার অঙ্গজ্যোতি। তার নাম হল গোপাল, বড়ো চঞ্চল সেই ছেলে। ঐ বনের মধ্যে সে লুকিয়ে আছে, সেখানে তুমি খোঁজ করে দেখো। গোপাল গোপাল বলে ডাকলে নিশ্চয় তুমি তার সন্ধান পাবে। তবে সহজে সে ধরা দেবে না। নিবিড় বনের মধ্যে তোমাকে অনেকক্ষণ তার নাম ধরে ডাকতে হবে, তবেই সে তোমার কাছে আসবে। কিন্তু সহজে তুমি তাকে ধরতে পারবে না। তার বাঁশি শুনতে পাবে, পায়ে নূপুরের আওয়াজ শুনতে পাবে আর তখনই বুঝবে সে তোমার খুব কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সাধুর কথা শুনে ছেলেটি নিবিড় বনের মধ্যে গিয়ে 'গোপাল গোপাল' বলে ডাকতে লাগল। তন্ময় হয়ে ডাকতে ডাকতে সে শুনতে পেল বাঁশির মধুর সুর আর নূপুরের ঝংকার। প্রাণ তার আনন্দে ভরে উঠল। সে তখনই সাধুর কাছে ছুটে এসে বলল : "মহারাজ, আপনার ছেলের বাঁশি আর নূপুরের শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি, কিন্তু এখনো তাকে দেখতে পাইনি।" সাধু তাকে উৎসাহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিয়ে বললেন ঃ "বাবা, ছেলেটি আমার বড়ো চঞ্চল, সহজে সে তো ধরা দেবে না, তবে একবার যখন সে তোমার কাছাকাছি এসেছে তখন এইবার দূর থেকে তুমি তাকে দেখতে পাবে। এবার দেখবে শ্যামল বরণ, পীত বসন, কণ্ঠে বনমালা, উজ্জ্বল কান্তি আমার গোপাল তোমার সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে সে এখানে ওখানে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই জ্যোতি দেখে তুমি শুধু 'গোপাল গোপাল' বলে ডেকে যাও।"

সাধুর কথামতো পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ছেলেটি গোপালের খোঁজ করে চলল। তারপর যখন জ্যোতি দর্শন হল তখন সে আনন্দে অধীর হয়ে সাধুকে এসে বলল ঃ "মহারাজ, গোপালের অঙ্গের জ্যোতি আমি দেখেছি, আমি দেখেছি গোপাল দূরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে সে তো আসছে না। ওকে কেমন করে ধরব?" সাধু বললেন ঃ "এবার সে তোমাকে ধরা না দিয়ে পারবে না, তুমি শুধু তার নাম ধরে একমনে ডেকে যাও।" একাগ্রচিত্তে ডাকতে ডাকতে ছেলেটির মধ্যে ভাবোন্মাদ দেখা দিল, তন্ময় হয়ে সে তখন দেখতে লাগল নব ঘনশ্যাম গোপালকে।

ছেলেটি তখন সাধুর কাছে এসে বলল ঃ "গুরুদেব, আপনার কৃপাতেই আমি গোপালের দর্শন পেলাম।" সাধু বললেন ঃ " বাবা, এতদিন আমি তোমার গুরু ছিলাম, কিন্তু আজ থেকে তুমি হলে আমার গুরু। কীভাবে তুমি গোপালের দেখা পেয়েছ, আমাকে এখন তা শিখিয়ে দাও।" ছেলেটি তখন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সাধুকে নিয়ে গেল, তারপর যেভাবে একাগ্রচিত্তে সে নাম জপ করত তা সাধুকে দেখিয়ে দিল। সাধুর প্রতি আদেশ ছিল যে উত্তরসাধকের সাহায্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। তাই তিনি ছেলেটির কাছে দীক্ষা নিয়ে তারই নির্দেশমতো জপের সাধন করতে লাগলেন এবং সেইভাবে নাম করতে করতে নামীর অর্থাৎ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে ধন্য হলেন।

☆ ☆ ☆

মহাজনেরা বলেন কলিতে নাম জপ হল শ্রেষ্ঠ সাধন। নাম আর নামী অভেদ, তাই নামেতেই নামীকে পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল মুখে নাম জপ করে গেলেই হবে না, জপ করবার একটা নিয়ম আছে। জপের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ ভাবনা করতে হয়। মুখে জপ করছি আর মন ছুটছে হাটে-বাজারে সওদা করতে, এমন জপে কোনো লাভ নেই। নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেবতার রূপকে মনে জাগিয়ে রাখতে পারলে তবেই জপ সার্থক হয়ে ওঠে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই গল্পে নাম জপের এক গভীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। একাগ্রতার সঙ্গে নাম জপ করতে থাকলে নাদধ্বনি শোনা যায়। এই নাদধ্বনি বাইরের কোনো শব্দ নয়। সাধকের অন্তরস্থিত অনাহত চক্রে অবিরাম এই শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। চিত্তকে একাগ্র করতে পারলেই সাধক এই নাদধ্বনি শুনতে পায়। এই ধ্বনিকে গল্পে বাঁশি ও নূপুরের ঝংকার বলে বলা হয়েছে। নাদধ্বনি শ্রবণের পর সাধকের চিত্ত ক্রমশ যখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ স্বচ্ছ হয়ে যায় তখনই বিন্দু বা ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন মেলে। তন্ময়তা আরও গভীর হলে সাধকের মধ্যে ভাবোন্মাদ দেখা দেয় এবং অচিরেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে সে ধন্য হয়, তার জীবন পরম সার্থকতায় ভরে ওঠে।

টিট্টিভ পাখির সমুদ্র শোষণ

সমুদ্রের ধারে এক টিট্টিভ পাখি তার বউকে নিয়ে থাকত। বউয়ের যখন ডিম পাড়বার সময় হল তখন সে টিট্টিভকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "হ্যাঁগো, ডিম আমি কোথায় পাড়ব?" টিট্টিভ বলল ঃ "কেন, সমুদ্রের ধার ছাড়া আর কোথায় পাড়বে? এখানেই ডিম পাড়ো।" বউ ভয় পেয়ে বলল ঃ "সেকি বলছ তুমি! সমুদ্র যে ডিম ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।" টিট্টিভের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। সে বলল ঃ "কী, সমুদ্রের এত বড়ো আস্পর্ধা সে ডিম ভাসিয়ে নেবে? একবার নিয়ে দেখুক না, আমি সমুদ্রকে শুষে ফেলে ডিম বের করে আনব।" বউ বলল ঃ "তুমি ছোট্ট পাখি বই তো নও, সমুদ্রের সঙ্গে তুমি পারবে কেন?" বউয়ের কথা শুনে টিট্টিভ ভয়ানক রেগে গিয়ে বলল ঃ "আমার বউ হয়ে একথা বলতে লজ্জা হল না তোমার? কী বলব, তুমি স্ত্রীজাতি, তোমাকে বধ করতে পারিনে, নইলে আমাকে কাপুরুষ বলবার পরিণতি যে কী, তা তোমাকে দেখিয়ে দিতাম।" বউ কী আর করে, টিট্টিভের কথার উপর আর তো কথা চলে না, সে অগত্যা সমুদ্রের পাড়েই ডিম পাড়ল।

টিট্টিভ এবার বেরুবে খাবারের খোঁজে। যাবার আগে বউকে সে বলল ঃ "চলো, দুজনে একসঙ্গে খাবারের সন্ধানে যাই।" বউ বলল ঃ "না না, তুমি একলাই যাও। একজন এখানে না থাকলে কেউ এসে ডিম নষ্ট করে দিয়ে যেতে পারে।" বউয়ের কথা শুনে টিট্টিভ আবার রেগে গেল, রাগে তার গায়ের পালক সব ফুলে উঠল, সে চিৎকার করে গর্জে উঠল ঃ "আমি কাপুরুষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নই, আমার ক্ষমতা তুমি জানো না। কার এমন সাহস আছে যে আমাদের ডিম নষ্ট করবে? প্রাণের ভয় নেই তার? যাক্‌গে, এখন ওসব কথা থাক, চলো আমার সঙ্গে।" এই বলে বউকে সঙ্গে নিয়ে টিট্টিভ খাবারের সন্ধানে চলে গেল।

ছোট্ট একটা পাখির এত আস্ফালন দেখে সমুদ্রের বড়ো কৌতূহল হল। সে ভাবল, ডিমগুলো আমি লুকিয়ে রেখে দিই, এইবার দেখতে হবে টিট্টিভ ফিরে এসে কী করে। এই ভেবে সমুদ্র তার জলের তলায় ডিমগুলোকে লুকিয়ে রাখল। পাখিরা ফিরে এসে দেখল সমুদ্রের ধারে ডিম নেই। টিট্টিভের বউ তো তাই দেখে কান্না জুড়ে দিল আর টিট্টিভ রাগে চোখ লাল করে সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "এখানে ডিম ছিল, কোথায় গেল বলো।" সমুদ্র বলল ঃ "তা তো জানিনে ভাই।" টিট্টিভ বলল ঃ "বটে! নিশ্চয় তুমি জানো ডিম কোথায় আছে। আমি বলছি তুমিই তোমার জলের তলায় ডিমগুলো লুকিয়ে রেখে দিয়েছ। ভালো চাও তো এক্ষুনি ডিমগুলো বের করে দাও, নাহলে তোমার সমস্ত জল আমি শুষে ফেলে ডিম বের করে আনব। আমার ক্ষমতা তখন তুমি টের পাবে।" এই বলে টিট্টিভ আর তার বউ বিন্দু বিন্দু করে সমুদ্রের জল ঠোঁট দিয়ে তুলে ফেলতে লাগল। এক একবার তারা ঠোঁটে করে জল নিয়ে বালিতে ফেলছে, পরের বার ঠোঁটে বালি নিয়ে সমুদ্রে ফেলছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত তারা এইভাবে সমুদ্র শোষণ করতে লাগল।

তখন চারিদিক থেকে পাখিরা এসে তাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল ঃ "এ কোন্ কাজ তোমরা করছ?" তারা বলল ঃ "আমরা সমুদ্র শোষণ করছি। সমুদ্র আমাদের ডিম চুরি করেছে, তাই তাকে শোষণ করে আমরা সেই ডিম উদ্ধার করব।" পাখিরা বলল ঃ "ভাই, এভাবে কতটুকু জল তোমরা শুষে নিতে পারবে? সাত জন্ম ধরে চেষ্টা করলেও এক ঘড়ার বেশি জল তুলতে পারবে না।" টিট্টিভ তখন চোখ পাকিয়ে বলল ঃ "দূর হও এখান থেকে, বাজে কথা শুনবার আমাদের সময় নেই। যদি আমাদের সাহায্য করতে চাও, তাহলে কথা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে কাজে লেগে যাও।" এই কথা শুনে সব পাখি একজোট হয়ে গেল। তারা ভাবল, সত্যিই তো, এরা হল আমাদের স্বজাতি, এদের সাহায্য না করলে কি চলে?

অমনি দলে দলে পাখিরা এসে সেখানে জুটতে লাগল। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কত রঙের কত জাতের সব পাখি। সকলে মিলে এক এক ঠোঁট জল নিয়ে বালিতে ফেলছে আর এক এক ঠোঁট বালি নিয়ে জলে ফেলছে। এমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সময় সমুদ্রের ধার দিয়ে নারদ ঋষি যাচ্ছিলেন বৈকুণ্ঠে। এত পাখি একজোট হয়ে কী করছে জানবার জন্যে তাঁর কৌতূহল হল। তিনি তখন পাখিদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে সব বৃত্তান্ত জেনে নিলেন। তাদের কথা শুনে নারদের বড়ো দয়া হল। তিনি ভাবলেন, এতটুকু সব পাখি, কিন্তু কী তাদের অধ্যবসায়। এদের এই চেষ্টা যদি সফল না হয় তাহলে পৃথিবীতে অধ্যবসায়ের কোনো মূল্যই তো থাকবে না। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নারদ বৈকুণ্ঠে গেলেন এবং গরুড়ের সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাকে জানিয়ে বললেন ঃ "খগরাজ গরুড়, পাখিরা সবাই মিলে এত চেষ্টা করছে, তুমি একবার তাদের কাছে যাও। হলই বা তারা ক্ষুদ্র, তবু তোমার স্বজাতি তো বটে। তুমি হলে পাখিদের রাজা, তোমার অসাধ্য কোনো কাজ নেই। স্বজাতির এই দুঃখ থেকে তুমি তাদের উদ্ধার করো। একমাত্র তুমি ছাড়া তাদের যে কোনো গতি নেই। ওরা নিজেরা কত পরিশ্রমই না করছে, তুমি শুধু নিজে একবার তাদের পাশে দাঁড়াও।

নারদঋষির অনুরোধ গরুড় ঠেলতে পারল না। সে নারদকে বলল ঃ "ঋষিবর, এখুনি আমি সমুদ্রের কাছে যাচ্ছি, তার সমস্ত জল আমি শোষণ করে নেব। দেখব কেমন করে সে টিট্টিভের ডিম লুকিয়ে রাখে।" ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে গরুড় তখনই সমুদ্রের ধারে এসে ভীষণ গর্জন করতে লাগল। গরুড়ের এই রুদ্রমূর্তি দেখে সমুদ্র ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, এতো বিষ্ণুর বাহন, এর অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। এখুনি এ আমার জল শুষে নেবে, জলজন্তু সব মরে যাবে, এর হাত থেকে কিছুই রেহাই পাবে না। সমুদ্র তখন নানাভাবে গরুড়ের স্তব-স্তুতি করতে লাগল, তারপর টিট্টিভের ডিমগুলি এনে তার পায়ের কাছে রেখে দিল। গরুড়ের রাগ আর রইল না, সে টিট্টিভকে ডিমগুলি দিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে গেল।

☆ ☆ ☆

আন্তরিক চেষ্টা যদি থাকে তাহলে দৈব সহায় হন। সেই সঙ্গে চাই দৃঢ় সংকল্প, যা কিছুতেই নুইয়ে পড়ে না, কোনো কাজকেই অসাধ্য মনে ক'রে পিছিয়ে যায় না, হাজারো বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য করে না। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', এই মনোভাব নিয়ে লেগে পড়ে সাধনায়। একেই গীতা বলেছেন 'অনির্বিণ্ণচেতসা' কোনোরকম নির্বেদ বা হতাশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে 'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগো', অটল নিশ্চয়বোধ নিয়ে যোগে যুক্ত হওয়া চাই, যেমন এই টিট্টিভ পাখিটি যুক্ত হয়েছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাল পাথর

এক কৃষকের ক্ষেতের ধান পাখিতে খেয়ে যেত। পাখি তাড়াবার জন্যে কৃষক এক উপায় বের করল। সে ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো সুতোর আগায় বেঁধে সেই সুতো ঘুরিয়ে পাথরগুলোকে দূরে দূরে ছুড়ে দিতে লাগল, তাতে পাখিরা আর তার ক্ষেতের কাছে আসতে পারত না। ক্ষেতের পাশেই ছিল এক নদী, কৃষক সেই নদীতে স্নান করত। একদিন সে স্নান করছে এমন সময় নদীর পাড় খানিকটা ভেঙে গেল। পাড় ভাঙতেই কৃষক দেখতে পেল সেখানে একটা লাল রঙের মাটির হাঁড়ি পড়ে রয়েছে আর সেই হাঁড়ির ভিতর রয়েছে অনেকগুলি লাল পাথর। অমন চমৎকার লাল পাথর দেখে কৃষক হাঁড়িটাকে তুলে নিয়ে এল আর সেই পাথর ছুড়েই সে পাখি তাড়াতে লাগল। এমনিভাবে পাথরগুলো কোথায় যে ছড়িয়ে পড়ল তার আর ঠিক ঠিকানা রইল না। শেষকালে হাঁড়িতে একটিমাত্র পাথর পড়ে রইল, কৃষক তা লক্ষ্য করল না।

রোজ ধান পাহারা দিতে হয় বলে কৃষক আর বাড়ি যেত না, ক্ষেতের মধ্যে একখানা ঘর তৈরি করে সেখানেই থাকত। একদিন কৃষকের বউ তার ছোটো ছেলেকে কোলে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। ছেলেটা দেখল হাঁড়ির ভিতরে একটা টুকটুকে লাল পাথর পড়ে রয়েছে। দেখেই সে সেটা হাতে তুলে নিল। কৃষকের বউ ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরে রান্নার যোগাড় করতে গিয়ে দেখে ঘরে নুন নেই। এদিকে ঘরে একটা পয়সাও নেই যে তা দিয়ে নুন কিনে আনবে। এমন সময় ছেলের হাতের লাল পাথরটার দিকে তার নজর পড়ল। পাথরটাকে তুচ্ছ সাধারণ একটা পাথর বলেই তার মনে হল, তবুও সে ভাবল যে পাথরটা দেখতে যখন এত চমৎকার তখন মুদি হয়তো এর বদলে খানিকটা নুন দিলেও দিতে পারে। এই মনে করে সেটা নিয়ে সে মুদির কাছে গেল। মুদি তাকে বলল ঃ "এ পাথর নিয়ে আমি কী করব? এ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এর বদলে আমি নুন দিতে পারব না।"

এক জহুরী সেই সময় মুদির দোকানে জিনিস কিনছিল। পাথরটার দিকে তার নজর পড়ে গেল। সে তখন কৃষকের বউকে বলল ঃ "পাথরটা আমাকে দাও, আমি তোমাকে নুন কিনে দিচ্ছি।" পাথর হাতে নিয়ে জহুরী দেখল, আরে, এযে লালমণি, এমন অমূল্য জিনিসের কি দাম দেওয়া যায়? জহুরী তখন মুদির কাছ থেকে নুন কিনে কৃষকের বউয়ের হাতে দিয়ে বলল ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তোমার এ পাথরের দাম দিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। তবে এর বদলে আমার যতদূর সাধ্য তা আমি তোমাকে দেব।" এই বলে সে কৃষকের বউকে প্রচুর ধন-রত্ন দিল আর তাদের যে কুঁড়েঘর ছিল সেই জায়গায় এক প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি তৈরি করে দিল।

এদিকে কৃষকের ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাড়ির কাছে এসে অবাক হয়ে গেল, নিজের বাড়ি সে আর খুঁজে পায় না। কোথায় গেল তার সেই কুঁড়েঘর? এ অট্টালিকাই বা কার? কৃষক এইসব ভাবছে এমন সময় তার বউ সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল: "সেদিন ক্ষেত থেকে ছেলে যে লাল পাথরটা নিয়ে এসেছিল, তারই দৌলতে আমাদের এই বাড়ি, এত ধন-দৌলত সব হয়েছে।" এই বলে সমস্ত ঘটনা সে কৃষককে শুনিয়ে দিল। কৃষক তখন হায় হায় করে মাথা চাপড়ে বলতে লাগল: "কি বোকামিই না আমি করেছি। সামান্য পাথর ভেবে এমন মহামূল্য জিনিস আমি কিনা পাখিকে ছুড়ে মেরে নষ্ট করলাম। একটা পাথরেই যদি আমার এমন বাড়ি, এত ধন-দৌলত মিলে থাকে, তাহলে আজ যদি সব পাথর আমার কাছে থাকত, তবে তো আমার সাত রাজার ধন মিলে যেত। হায় হায়, এমন অমূল্য সম্পদ পেয়েও আমি তা হেলায় হারালাম।"

শ্বাস-প্রশ্বাস হল মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। গল্পে একেই লালমণি বলা হয়েছে। জীবরূপী কৃষক লালমণির মর্ম জানে না, তাই সে কেবল ইন্দ্রিয়রূপী পাখিদের পিছনে হেলায় এ সম্পদ নষ্ট করেছে। অমন যে অমূল্য সম্পদ শ্বাস-প্রশ্বাস, আমরাও ইন্দ্রিয়সেবায় তা এইভাবেই নষ্ট করে চলেছি, অথচ সেদিকে আমাদের এতটুকু খেয়াল নেই। দৈবাৎ যদি জহুরীর দেখা মেলে, সদ্‌গুরুর সঙ্গ যদি লাভ করা যায়, তাহলে তিনিই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের অপরিসীম মূল্য বুঝিয়ে দেন এবং তাঁরই নির্দেশে শ্বাস-প্রশ্বাসের যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা আমরা আত্মধনের অধিকারী হতে পারি।

সাধুর পায়েস খাওয়া

এক সাধু কঠোর সংযম অবলম্বন করে সাধন-ভজনে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁর খুব দুর্বলতা ছিল। তিনি পায়েস খেতে এত ভালোবাসতেন যে ধ্যানে বসলেও পায়েসের কথা ভুলতে পারতেন না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবলই মনে হত এখন যদি একটু পায়েস পেতাম তো বেশ হত। অনেক চেষ্টা করেও তিনি মন থেকে পায়েস খাওয়ার লোভ দূর করতে পারলেন না। তাই নিজের উপরেই তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন।

একদিন এক বড়লোকের বাড়ি তিনি ভিক্ষে করতে গিয়েছেন। ধনী গৃহস্থ সাধুকে দেখে পরম সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বাবা, আপনার সেবার জন্যে কীরকম ব্যবস্থা করব বলুন।" সাধু বললেন ঃ "আর কিছু দরকার নেই, শুধু পায়েসের জোগাড় করো।" গৃহস্থ তখন প্রচুর পরিমাণে পায়েস প্রস্তুত করে সাধুর সামনে ধরে দিলেন। সাধুও ভগবানকে নিবেদন করে সেই পায়েস খেতে শুরু করলেন। খেতে খেতে সাধুর পেট ভরে গেল, কিন্তু তবু তিনি থামলেন না। তিনি খেয়েই চলেছেন আর নিজের মনকে বলছেন ঃ "ওরে মন, পায়েসে তোর এত লোভ যে আমাকে ধ্যান পর্যন্ত করতে দিসনে, কেবল পায়েস খাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকিস। এবার দ্যাখ, তোকে জন্মের মতো পায়েস খাওয়াচ্ছি। দেখি তুই কত পায়েস খেতে পারিস।"

সাধু আকণ্ঠ পায়েস খেয়ে চলেছেন, খেতে কষ্ট হচ্ছে. তবু খাচ্ছেন। ক্রমে সব পায়েস বমি হয়ে গেল, তবুও তিনি থামলেন না। শেষে যখন বেহুঁশ হয়ে পড়বার উপক্রম হল, তখন তিনি খাওয়ায় ক্ষান্তি দিলেন। সেইদিন থেকে পায়েসের উপর লোভ তাঁর চলে গেল, এমনকি পায়েসের কথা মনে হলেও তখন তাঁর বমি আসত।

☆ ☆ ☆

অনেকে বলেন ভোগ না করলে ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু সকলের পক্ষে একথা খাটে না। বিবেকী মানুষ কীভাবে ভোগের দ্বারা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হন তা এই গল্পে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ভোগবাসনা দমন করাই উচিত। আগুনে ইন্ধন যোগালে আগুন যেমন আরও প্রবলভাবে জ্বলে ওঠে, ইন্দ্রিয়দের খোরাক জোগাতে থাকলে তাদের উপদ্রবও তেমনি বেড়ে যায়। ভোগকে নিয়ন্ত্রিত করা, তার রাশ টেনে ধরাই সাধারণের পক্ষে কর্তব্য। আকণ্ঠ ভোগ করে ভোগ চরিতার্থ করা বিরল কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এ পথ সকলের জন্যে নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্কাম ভক্তের সর্বস্ব হরণ

এক ছিল বুড়ী ব্রাহ্মণী, বড়ো ভক্তিমতী, সাধন-ভজন নিয়েই তার দিন কাটে। সংসারে আপন বলতে তার কেউ নেই। স্বামী-পুত্র সব মারা গিয়েছে, তাদের জন্যে মিছে শোক না করে বুড়ী আপন মনে তার ঠাকুর সেবা নিয়েই থাকে। খাওয়া-পরার সংস্থান বলতেও তার কিছু নেই, থাকবার মধ্যে একটিই ছিল সম্পত্তি, সেটি হল তার গরু। সেই গরু দুইয়ে সকালবেলা যেটুকু দুধ পায় তাই দিয়ে বুড়ী অতিথির সেবা করে, আর সন্ধ্যেবেলা যেটুকু দুধ হয়, তা ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে সে নিজে খায়। এইভাবেই কোনোমতে সে জীবনধারণ করে আছে।

নারদ ঋষি একদিন বৈকুণ্ঠে গিয়ে ভগবানকে বললেন ঃ "হে ভগবান, মর্ত্যলোকে এক বুড়ীকে দেখে এলাম আপনার পরম ভক্ত, কিন্তু বড়ো গরীব সে, খাওয়া-পরার কোনো সংস্থান নেই। আপনি তাকে একটু কৃপা করুন।" ভগবান হেসে বললেন ঃ "বেশ, তাই হবে। চলো আমরা দুজনে তার কাছে যাই।"

নারদকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান তখন মর্ত্যলোকে নেমে এলেন এবং দুজনে ছদ্মবেশ ধারণ করে বুড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বয়ং ভগবান এসেছেন বুড়ী তা কিছুই বুঝতে পারল না, অতিথি এসেছে মনে করে সে নিজের হাতে তাঁদের পা ধুইয়ে দিল, বসবার জন্যে কুশাসন পেতে দিল, তারপর গরু দুইয়ে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে দুই অতিথিকে যত্ন করে খেতে দিল। অতিথিরাও দুধ খেয়ে পরম পরিতুষ্ট হলেন। যাবার সময় ভগবান অস্ফুটস্বরে বলে গেলেন ঃ "বুড়ীমা, তোমার সেবায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, তাই তোমাকে বর দিচ্ছি তোমার একমাত্র সম্পদ গরুটি মরে যাক।"

নারদ তো ভগবানের এই অন্যায় অবিচার দেখে মনে মনে খুব রেগে গেলেন। এমন ভক্তিমতী বুড়ী, সে কত যত্ন করে আমাদের সেবা করল, আর ভগবান বললেন কিনা তার প্রাণধারণের একমাত্র সম্বল গরুটা মরে যাক। মনে রাগ হলেও নারদ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না। হাজার হোক ভগবান হলেন দুনিয়ার মালিক, তাঁর মুখের উপর কি আর কথা বলা চলে? এই ভেবে নারদ চুপ করে রইলেন বটে কিন্তু বুড়ীর জন্যে তাঁর মনে বড়ো দুঃখ হতে লাগল।

নারদকে নিয়ে ভগবান এবার এক বড়োলোকের বাড়ি গিয়ে বললেন ঃ "আমরা ক্ষুধার্ত অতিথি, আমাদের কিছু খেতে দাও।" শোনামাত্র সেই বাড়ির কর্তা দারোয়ানকে ডেকে হুকুম দিলেন ঃ "এই লোক দুটোকে এখুনি ঘাড় ধরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বের করে দাও।" একথা শুনেই অতিথিরা চলে গেলেন। যাবার সময় ভগবান এখানেও অস্ফুটস্বরে বললেন ঃ "তোমার ধন-ঐশ্বর্য আরও বেড়ে যাক।"

এবার আর নারদ চুপ করে থাকতে না পেরে ভগবানকে বললেন ঃ "হে ভগবান, আপনার এ কেমন বিচার আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। বুড়ী আমাদের এত সেবা যত্ন করল, তাকে আপনি বললেন তোমার গরুটি মরে যাক, আর এই ধনী লোকটা আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিল, তাকে আপনি কিনা বর দিলেন তোমার ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হোক।"

ভগবান তখন হেসে বললেন ঃ "নারদ, এতদিনেও তুমি আমার ভাব বুঝতে পারলে না। এই যে লোকটা ধনমদে উন্মত্ত হয়ে আমার সেবা-পূজা কিছুই না করে আমাকে ভুলে রয়েছে, তাকে আমি আরও ঐশ্বর্যলাভের বর দিলাম কেন জানো? আরও ঐশ্বর্য পেলে সে তাতে আরও ডুবে থাকবে, আমার কাছ থেকে সে তখন একেবারে দূরে সরে যাবে, সেইজন্যেই তাকে এই বর দিয়েছি। আর ঐযে বুড়ী, ও দিনরাত আমারই ভজনা করে, ওর মন সব সময় আমাতেই লেগে আছে, তবু থেকে থেকে তার মন গরুটির দিকে চলে যায়। তার মনের এই চাঞ্চল্যটুকু যাতে আর না হয় সেইজন্যেই আমি ওকে বর দিলাম গরুটি তার মরে যাক। গরুটি মরে গেলে ও ষোল আনা মন আমাতেই দিতে পারবে আর তাতেই ওর মুক্তি হবে। এবার বুঝলে তো কেন আমি দুজনকে দুরকম বর দিলাম।

☆ ☆ ☆

বাংলায় একটা কথা আছে ঃ

যে করে আমার আশ
আমি করি তার সর্বনাশ।
তবুও যদি করে আশ
আমি হই তার দাসের দাস।।

ভগবানে একান্ত শরণাগতি সংসারে দুর্লভ। সংসারে আমরা ভোগের বিচিত্র উপকরণ আহরণ করতেই ব্যস্ত, তারই মধ্যে ভগবানের জন্যে একটু স্থান নির্দিষ্ট করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। কিন্তু এভাবে ভগবানকে লাভ করা যায় না। যথার্থ নিস্কাম ভক্ত যে, তার অন্য কিছুতে মন থাকে না, সে ভগবানকেই চায়। তার সংসার, তার কর্ম ভগবানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। তার এই একান্ত শরণাগতির পথে যদি কোথাও কোনো বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে ভগবানই সেই বাধা দূর করে তাকে আত্মভূত করে নেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্কাম ভক্তের সর্বস্ব লাভ

এক ছিলেন রাজা, তাঁর অন্দরমহলে অনেক রানী। রাজা যুদ্ধে যাবেন, যাবার আগে প্রত্যেক রানীর কাছে দূতীকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, যুদ্ধ জয় করে যখন ফিরবেন তখন কোন্ রানীর জন্যে কী কী জিনিস আনতে হবে। প্রত্যেক রানী দূতীর হাত দিয়ে তাদের পছন্দমতো নানারকম জিনিসের নাম লিখে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। রাজা একবার ফর্দগুলি দেখে নিলেন, কিন্তু ছোট রানীর ফর্দ দেখে তিনি তো অবাক। তাকে একটি ১ চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই। রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ "দেখো মন্ত্রী, রানীরা প্রত্যেকে কতরকম জিনিস চেয়ে ফর্দ পাঠিয়েছে, আর ছোটোরানীর কান্ডখানা দেখো, কাগজে শুধু সংখ্যাটা লিখে পাঠিয়েছে। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কি কিছুই নেই?" মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, রানীদের মধ্যে ছোটো রানীই হলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, তিনি আপনার নিষ্কাম ভক্ত। রাজসভায় সকলের সামনে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতে চান না, তাই তিনি কাগজে ১ লিখে আপনাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আপনার কাছ থেকে অন্য কোনো জিনিস চান না, তিনি একমাত্র আপনাকেই চান।"

রাজা যুদ্ধে চলে গেলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজধানীতে ফিরবার সময় রানীদের জন্যে নানারকম জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এলেন। রানীদের ঘরে ঘরে তাদের পছন্দমতো জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া হল আর রাজা নিজে এলেন ছোটোরানীর ঘরে। রানীকে তিনি বললেন ঃ "তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে, আমি তাই এনে তোমাকে দিলাম। তুমি তো অন্য কিছু চাওনি, একমাত্র আমাকেই চেয়েছিলে। আমিও তাই নিজেকে তোমারই হাতে সঁপে দিলাম।"

ছোটোরানীর মহলে তখন আনন্দের রোল পড়ে গেল। স্বয়ং রাজা যেখানে উপস্থিত সেখানে কোনো অভাব তো থাকতে পারে না, রাজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যা কিছু সম্পদ, সমস্তই ছোটো রানীর মহলে এসে গেল আর রাজাকে আপন করে পেয়ে সেদিন থেকে পরম আনন্দে ছোট রানীর দিন কাটতে লাগল।

☆ ☆ ☆

নিষ্কাম ভক্ত আর কিছু চায় না, সে শুধু ভগবানকেই চায়! ভগবানকে লাভ করলে তার আর কোনো অভাব থাকে না। আমরা বলি, ভগবানকে এত ডাকি, কিন্তু ভগবানের দেখা মেলে না। কিন্তু মিলবে কী করে? চাওয়ার মধ্যেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে আমাদের গলদ রয়ে গিয়েছে। আমরা আর পাঁচটা জিনিসকে যেমন চাই, ভগবানকেও তেমনিভাবেই চেয়ে থাকি। এতে ভগবানকে পাওয়া যায় না। নিজেকে যদি সম্পূর্ণভাবে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে পারি, সমস্ত কামনা ত্যাগ করে একমাত্র তাঁকেই যদি চাইতে পারি, তবেই তিনি ধরা দেন, নইলে নয়।

সোনার কৌটো

এক রাজা একদিন তার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আচ্ছা মন্ত্রী, দুঃখে পড়লে কী করা উচিত?" মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, 'দুখ্ পাইয়ে তো সুখ্ লগাইয়ে,' দুঃখ পেলে সেই দুঃখ ভুলে আনন্দ করুন, তাতেই মঙ্গল হবে।" মন্ত্রীর কথা ঠিক কিনা তা যাচাই করবার জন্যে রাজা একটা সোনার কৌটো মন্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন ঃ "এই কৌটোটা তুমি এখন রেখে দাও। যখনই আমি এটা ফেরত চাইব তখনই আমাকে ফেরত দিতে হবে। যদি না পারো তাহলে তোমার প্রাণদন্ড হবে।" শুনে মন্ত্রীর তো ভয় ধরে গেল। রাজাকে তিনি ভালো করেই চেনেন, রাজার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। তিনি ভাবলেন, সিন্দুক, আলমারি যেখানেই লুকিয়ে রাখি না কেন রাজা যেকোনো উপায়েই হোক আমার কাছ থেকে ঠিক এ কৌটো সরিয়ে ফেলবেন। অনেক ভেবেচিন্তে মন্ত্রী নিজের শোবার ঘরের দরজার খিলান ভেঙে সেখানে কৌটো রেখে ভাঙা খিলান এমনভাবে মেরামত করে দিলেন যাতে কেউ তা বুঝতে না পারে।

এদিকে রাজা তাঁর রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করলেন যে তাঁর একটা কাজ যে করে দিতে পারবে তাকে তিনি এক হাজার টাকা বকশিস দেবেন। সেই ঢেঁড়া শুনে দুজন বেশ্যা রাজবাড়িতে এল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমরা কী কাজ করতে পারো?" একজন বলল ঃ "আমি আকাশে ফাঁদ পাততে পারি।" আর একজন বলল "আমি আকাশে ছিদ্র করতে পারি।" তাদের কথা শুনে রাজা প্রথম বেশ্যাকে বিদায় করে দিলেন। দ্বিতীয়জনকে তিনি বললেন ঃ "আমার একটা সোনার কৌটো মন্ত্রীর কাছে আছে, সেটা সে খুব গোপনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। সেটা তুমি খুঁজে বের করে আমায় এনে দিতে পারবে?" বেশ্যা বলল ঃ "নিশ্চয় পারব হুজুর।" রাজা বললেন ঃ "বেশ কথা, যদি পারো তাহলে তোমাকে আমি এক হাজার টাকা বকশিস দেব।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"বেশ্যা তখন রোজ মন্ত্রীর বাড়ির দরজার সামনে বসে হাপুসনয়নে কাঁদতে লাগল। প্রত্যহ একটা স্ত্রীলোককে বাড়ির সামনে এভাবে কাঁদতে দেখে মন্ত্রীর বড়ো দয়া হল। তিনি তাকে বললেন ঃ "তুমি কি কোনো বিপদে পড়েছ? তোমার কি চাই বলো, আমি তোমার অভাব মিটিয়ে দেব।" বেশ্যা বলল ঃ "বাবা, আমার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল. অনেকদিন হল সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও তার খোঁজ পাইনি। তোমার বউকে দেখতে ঠিক আমার মেয়েরই মতো, তাই তাকে দেখবার জন্যে আমি এখানে বসে কাঁদছি।" মন্ত্রী তখন বেশ্যাকে সঙ্গে করে অন্দরে নিয়ে এসে স্ত্রীকে সব কথা বললেন। সব শুনে বেশ্যার প্রতি মন্ত্রীর স্ত্রীরও দয়া হল। তিনি তাকে বললেন ঃ "আপনার জন্যে কী করতে হবে বলুন, আপনি যা চাইবেন আমি তাই করব।" বেশ্যা বলল ঃ "মা, তুমি হলে আমার মেয়ের মতো, তোমার কাছে আমি কিছুই চাইনে, শুধু তোমার সেবা-যত্ন করব, সব সময় তোমার মুখখানি দেখতে পাব, এইটুকুই আমার প্রার্থনা।" বেশ্যার কথা শুনে মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মন্ত্রী তাকে বললেন ঃ "মা, তুমি আমার বাড়িতেই থাকো, নিজের ইচ্ছেমতো চলাফেরা করো, তোমার কোনো কাজে কেউ বাধা দেবে না।"

সেইভাবে সব ব্যবস্থা হল। বেশ্যাও মন্ত্রীর স্ত্রীকে নিজের মেয়ের মতো আদর-যত্ন করতে লাগল, এমন কি মন্ত্রীর সঙ্গেও সে এমন ব্যবহার করতে লাগল যে মন্ত্রীই তার জামাই। ক্রমে ক্রমে সে মন্ত্রীর বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে উঠল, তার হুকুমমতো বাড়ির সব কাজ চলতে লাগল, বাড়ির যত তালা চাবি সব তার জিম্মায় এসে গেল। এদিকে বেশ্যার মন পড়ে আছে রাজার সেই সোনার কৌটার সন্ধানে। যখন ধারে কাছে কেউ থাকে না তখন সে বাক্স পেঁটরা সিন্দুক খুলে কৌটোর খোঁজ করতে থাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিলল না। বেশ্যা হতাশ হয়ে পড়তে লাগল। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা খোঁজ করে যখন সে কৌটা খুজে পেল না, তখন সে মন্ত্রীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে শুরু করল। সে তখন লক্ষ্য করল যে মন্ত্রী যখনই নিজের শোবার ঘর থেকে বাইরে যায় তখনই তিনি ভালো করে দরজার খিলানের দিকে লক্ষ্য করতে থাকেন, আবার শোবার ঘরে ঢুকে প্রথমেই তিনি সেদিকে চেয়ে দেখেন। বেশ্যার সন্দেহ হল ঐ খিলানের মধ্যেই হয়তো মন্ত্রী সেই কৌটো গেঁথে রেখেছেন।

একদিন মন্ত্রী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রাজবাড়িতে গিয়েছেন, সেই ফাঁকে সুযোগ বুঝে বেশ্যা খিলান ভেঙেই দেখে, আরে, এই তো সোনার কৌটো। অমনি সে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৌটো নিয়ে কাউকে কিছু না বলে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। মন্ত্রী বাড়ি ফিরে এসে দেখেন সর্বনাশ, খিলান ভাঙা. কৌটো সমতে বেশ্যাও উধাও। মন্ত্রী তখন বুঝতে পারলেন একে রাজাই পাঠিয়েছিলেন কৌটো চুরি করে আনতে। তাঁর চিন্তা হল এবার তো রাজা কৌটো ফেরত চাইবেন আর দিতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। মন্ত্রী কী যে করবেন ভেবে পেলেন না।

এদিকে বেশ্যা সেই কৌটো রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে বকশিস নিয়ে চলে গেল। রাজা ভাবলেন, মন্ত্রী আমার চেয়ে ঢের বেশী সেয়ানা। যেখানেই কৌটো রাখব ও ঠিক বের করে নেবে। এই ভেবে তিনি নিজের হাতে কৌটোটা দিঘির জলে ফেলে দিলেন। একটা রুই মাছ সঙ্গে সঙ্গে তা গিলে ফেলল।

রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী এলে পর রাজা তাঁকে বললেন ঃ "এবার আমার কৌটো ফেরত দাও।" মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ কৌটো আমার কাছে নেই, ও আমি দিতে পারব না।" রাজা বললেন ঃ "তবে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।" মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজের আদেশ শিরোধার্য, তবে মহারাজের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আমাকে সাতটা দিন সময় দিন, এই সাত দিন আমি ভগবানকে ডাকব।" রাজা সাত দিন মন্ত্রীকে সময় দিলেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মন্ত্রী এক সদ্‌গুরুর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "বাবা, আর সাত দিন বাদে আমার মৃত্যু হবে, শেষ সময়ে আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" সদ্‌গুরু বললেন ঃ "তুমি দুঃখ কোরো না। বিপদ এসেছে, তাতে তুমি কাতর হোয়ো না, বিষণ্ণ হোয়ো না, আনন্দ করো, কেবল আনন্দ করো।"

সদ্‌গুরুর কথা শুনে মন্ত্রী নিজের বাড়িতে উৎসবের আয়োজন করলেন। নাচ-গান, দান-ধ্যান, যাত্রা-কথকতা ও লোকজনের আনাগোনায় মন্ত্রীর বাড়ি গমগম করতে লাগল। শহরের লোক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল মন্ত্রীর হঠাৎ এ উৎসব করবার কারণ কী? মন্ত্রী দরাজ হাতে খরচ করে চলেছেন, যে যা জিনিস নিয়ে আসছে তিনি দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছেন। উৎসবের এই বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যে মন্ত্রীর আর মৃত্যু চিন্তা করবার অবসর মিলল না।

এইভাবে সাত দিন কেটে গেল। রাজা আবার মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী খবর দিলেন তাঁর বাড়িতে এখনো উৎসব চলছে, উৎসব শেষ হলেই তিনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করবেন। আরও সাত দিন কাটল, এদিকে হয়েছে কি, যে রুই মাছটা সোনার কৌটো গিলে ফেলেছিলেন, সেই মাছ এক জেলের জালে ধরা পড়ল। জেলে ভাবল, এ মাছ বাজারে বিক্রি না করে মন্ত্রীর বাড়িতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদি বেচতে পারি তাহলে অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে। এই ভেবে সে মাছটা মন্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে এল। মন্ত্রী দ্বিগুণ দাম দিয়ে তা কিনে নিলেন। দাসী যখন সেই মাছ কুটছে তখন মাছের পেট থেকে সোনার কৌটো বেরিয়ে পড়ল। দাসী ভাবল মন্ত্রীমশাইকে কৌটোটা দিলে অনেক পুরস্কার মিলবে। সে তখন কৌটোটা মন্ত্রীর হাতে দিল। কৌটো হাতে পেয়ে মন্ত্রীর তো আনন্দ ধরে না। তিনি বুঝতে পারলেন যে রাজা কৌটোটাকে দিঘির জলে ফেলে দিয়েছিলেন আর রুই মাছ সেই কৌটো গিলেছে। তিনি দাসীকে অনেক পুরস্কার দিয়ে কৌটোটা নিজের জামার পকেটে রেখে দিলেন, আর ঠিক সেই সময় রাজবাড়ি থেকে পেয়াদা এসে জানাল যে রাজামশাই হুকুম দিয়েছেন, মন্ত্রীমশাই যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সেই অবস্থায় তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

মন্ত্রী তখন বুক ফুলিয়ে রাজার কাছে এলেন। রাজা বললেন ঃ "তোমাকে বার বার ডেকে পাঠাচ্ছি, তা সত্ত্বেও তুমি আসোনি কেন?" মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, অপরাধ নেবেন না। আমি বাড়িতে উৎসব নিয়ে বড়ো ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসতে পারিনি।" রাজা বললেন ঃ "এখুনি আমার কৌটো ফেরত দাও।" অমনি মন্ত্রী পকেট থেকে কৌটো বের করে রাজার হাতে দিলেন। রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এ কৌটো তুমি কোথায় পেলে?" তখন মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, উৎসবের আনন্দে মেতে ছিলাম বলেই এ কৌটো আমার হাতে এসেছে। আমি জানতাম আপনি আমার প্রাণদণ্ড দেবেনই। তাই বৃথা দুঃখ না করে আমি উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। শুধু যদি দুঃখ করেই দিন কাটাতাম, আনন্দে ডুবে না যেতাম, তাহলে এই কৌটো আমি পেতাম না। আপনি তো কৌটোটাকে দিঘিতে ফেলে দিয়েছিলেন, একটা মাছ সেই কৌটো গিলেছিল, জেলের জালে সেই মাছ ধরা পড়ে, বেশি পয়সার লোভে জেলে সেই মাছ আমার কাছে বিক্রি করে এইভাবেই কৌটো আমার হাতে এসেছে। মহারাজ, আপনাকে আমি বলেছিলাম 'দুখ্ পাইয়ে তো সুখ্ লগাইয়ে'। এখন বুঝে দেখুন কথাটা সত্যি কিনা। সামান্য এই কথাটা আপনাকে বোঝাবার জন্যে আমাকে এত কষ্ট পোয়াতে হল।"

☆ ☆ ☆

সংসারে থাকতে গেলে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। দুঃখের হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পাবে না। কিন্তু দুঃখ দেখা দিলে শোকে যদি মুহ্যমান হয়ে পড়ি, তাতে কোনো লাভ হয় না, তাতে দুঃখ আরও বেড়ে যায়। সেই সন্তাপে ইন্দ্রিয় মন একেবারে শুকিয়ে যেতে থাকে, তাতে শরীরেও রোগ দেখা দেয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহাজনেরা তাই উপদেশ দেন, দুঃখের মধ্যেও আনন্দে থাকবার চেষ্টা করো, ঘরে আলো জ্বাললে অন্ধকার আপনিই কেটে যাবে।

ঈশ্বর মঙ্গলময়

এক রাজা তার পাত্র-মিত্রদের নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিলেন যে যাঁর সামনে জন্তু-জানোয়ার আসবে তিনিই তাকে মারবার জন্যে ঘোড়া ছোটাবেন। রাজার সামনে এক হরিণ এসে পড়ল, রাজাও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মন্ত্রী রাজাকে একলা ছাড়লেন না, তিনিও রাজার পিছনে ঘোড়া ছোটালেন। এইভাবে গভীর বনের মধ্যে এসে হঠাৎ রাজা ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন আর তাঁর বাঁহাত কেটে দরদর ধারায় রক্ত পড়তে লাগল। তাই দেখে মন্ত্রী এক টুকরো কাপড় দিয়ে রাজার হাত ভাল করে বেঁধে দিয়ে বললেন ঃ "মহারাজ, আপনার হাত কেটেছে তার জন্যে আপনি দুঃখ করবেন না। ভগবান মঙ্গলময়, তাঁর কাজে কখনো অমঙ্গল হতে পারে না। এই যে আপনার হাত কেটে রক্ত পড়ছে, এতেও আপনার মঙ্গল হয়েছে জানবেন।" মন্ত্রীর কথা শুনে রাজার ভয়ানক রাগ হল। এত বড়ো একটা আঘাত পেলাম, এমন রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল, আর মন্ত্রী বলে কিনা মঙ্গল হয়েছে! রাজা মনে মনে ঠিক করলেন মন্ত্রীকে একবার দেখে নিতে হবে।

খানিক বাদে রাজা মন্ত্রীকে বললেন ঃ "মন্ত্রী, বড়ো তেষ্টা পেয়েছে, কোথাও একটু জলের সন্ধান মেলে কিনা দেখো তো।" মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, কাছেই একটা কুয়ো আছে দেখছি, চলুন সেখানে গেলে জল পাওয়া যাবে।" কুয়োর কাছে এসে মন্ত্রী জল তুলে রাজাকে দিলেন, জল খেয়ে রাজার প্রাণ ঠাণ্ডা হল। মন্ত্রী তখন নিজে খাবেন বলে যেই জল তুলতে গিয়েছেন অমনি রাজা মন্ত্রীকে ঠেলে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। কুয়োয় পড়তে পড়তে মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি আমাকে কুয়োয় ফেলে দিলেন, এতেও আমার মঙ্গল হবে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁর রাজ্যে অমঙ্গল হতে পারে না।"

মন্ত্রীকে কুয়োয় ফেলে দিয়ে রাজা চলে যাচ্ছেন এমন সময় একদল যক্ষ রাজাকে দেখেতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠল, তারপর তারা রাজাকে ধরে নিয়ে চলল তাদের সঙ্গে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ভাই, তোমরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাকে কোথায় ধরে নিয়ে চলেছ?'' যক্ষরা বলল ঃ ''দেবতারা নরমেধ যজ্ঞ করবেন, নরবলির জন্যে তোমাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি হলে রাজা, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার চেয়ে ভালো বলি তো আর মিলবে না।'' যক্ষদের কথা শুনে ভয়ে রাজার বুক শুকিয়ে গেল। রাজা দেখলেন আর তাঁর রক্ষা নেই, এবার তাঁকে মরতেই হবে। এমন সময় হঠাৎ একজন যক্ষের নজরে পড়ল রাজার হাতে রক্ত লেগে রয়েছে! দেখেই সে তার সঙ্গীদের বলল ঃ ''ওহে, একে তো বলি দেওয়া চলবে না, এর দেহে যে খুঁত রয়েছে, এর হাত দিয়ে এখনো রক্ত পড়ছে। নিখুঁত দেহ না হলে বলি হবে কেমন করে?'' রাজার হাতের রক্ত দেখে যক্ষরা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। রাজার তখন হুঁশ হল, মন্ত্রী তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল যে হাত কাটার দরুণ আমার মঙ্গলই হবে। তখন আমি মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি ভাগ্যে আমার হাত কেটেছিল, তাইতো অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। এই ভেবে মন্ত্রী বেঁচে আছে কিনা দেখবার জন্যে রাজা আর সেই কুয়োর কাছে ফিরে এলেন।

মন্ত্রীর ভাগ্য ভালো কুয়োয় পড়তে পড়তে একটা গাছের শিকড়ে তাঁর হাত ঠেকে গিয়েছিল। সেই শিকড় ধরে ঝুলে তিনি কোনরকমে প্রাণে বেঁচে ছিলেন। উপর থেকে রাজার ডাক শুনতে পেয়ে এবার তিনি সাড়া দিলেন, রাজাও তখন একটা দড়ি কুয়োর ভিতর নামিয়ে দিতে মন্ত্রী সেই দড়ি ধরে উপরে উঠে এলেন। রাজা তখন মন্ত্রীর কাছে যক্ষদের কথা, কেমন করে বলি দেবে বলে তারা তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তারপর তাঁর হাতে রক্ত দেখে কেমন করে তারা তাঁকে ছেড়ে দিল, সব কথা একে একে বলে শেষে বললেন ঃ ''মন্ত্রী, আমার হাত কেটে রক্ত বেরিয়েছিল বলেই আমি আজ প্রাণে বেঁচে গেলাম। তাতেই যে আমার মঙ্গল হয়েছে, তোমার সেই কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি কুয়োর মধ্যে পড়ে এত যে কষ্ট পেলে, তাতে তোমার কী মঙ্গল হল?'' মন্ত্রী বললেন ঃ ''মহারাজ, আপনি যদি আমাকে কুয়োয় ফেলে না দিতেন, তাহলে যক্ষরা আমাকেই বলি দেবে বলে ধরে নিয়ে যেত। কুয়োয় ফেলে দিয়ে আপনি আমার যথার্থ মঙ্গল করেছেন, কারণ এইভাবেই আপনি আমাকে তাদের চোখের আড়ালে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এখন দেখলেন তো মহারাজ, ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যা করেন তা মঙ্গলেরই জন্যে।''

☆ ☆ ☆

সংসারে শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা লেগেই আছে। প্রশ্ন জাগে, জ্বালা-যন্ত্রণাময় এই সংসার যখন ভগবানেরই সৃষ্টি, তখন তাঁকে মঙ্গলময় বলি কেমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে? উপার্জনক্ষম একমাত্র ছেলে যখন সম্বলহীন বৃদ্ধ পিতা-মাতা এবং তার স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যাদের আকূলে ভাসিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন স্বভাবতই ঈশ্বরের মঙ্গল-বিধানের প্রতি আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলি। মহাজনেরা কিন্তু এই অবস্থাতেও ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা খুঁজে দেখবার কথা বলে থাকেন। সেক্ষেত্রে বিচার করে দেখতে হয় যে দীর্ঘকাল রোগ-শয্যায় শায়িত পুত্রের চিকিৎসার খরচ অসহায় পিতা-মাতা কেমন করে বহন করবে, তার রোগ-যন্ত্রণার উপশমই বা তারা করবে কেমন করে? পুত্রের মৃত্যুতে তখন তাদের একমাত্র সান্ত্বনা হল এই যে মঙ্গলময় ঈশ্বর মৃত্যুরূপে দেখা দিয়ে তার সব যন্ত্রণা দূর করে তাকে নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। এইভাবে বিচার করে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার ভিতর থেকেই মঙ্গলকে খুঁজে বের করতে হয়। স্থূল দৃষ্টিতে কোনো মঙ্গল খুঁজে না পেলেও অন্ধবিশ্বাসে তা মেনে নেওয়া উচিত। তখন মনে করতে হয় যে আমার দৃষ্টি সংকীর্ণ, তাই আমি দুঃখের মধ্যে মঙ্গলকে দেখতে পাচ্ছিনে। 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—এই মহাবাক্যটি মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সংসারের দুঃখ-শোকে শান্তি মিলতে পারে না।

দুঃখের সার্থকতা

অঢেল টাকার মালিক একজন লোকের উপর এক সাধুর কৃপাদৃষ্টি পড়ল। সাধু তাকে বললেন ঃ "দেখো বাবা, তুমি রোজ রামনাম কোরো।" ধনী লোকটি বলল ঃ "আমার কত কাজ, রামনাম করব সে সময় আমার কোথায়? ওসব আমার দ্বারা হবে না।" সাধু দেখলেন টাকার গরমে লোকটির বেশ দেমাক হয়েছে, তার এই গর্ব দূর করা দরকার।

সাধু ছিলেন নানারকম অলৌকিক শক্তির অধিকারী। একদিন লোকটি গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে এমন সময় সাধু অবিকল তার মূর্তি ধারণ করে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। এমন নিখুঁতভাবে তিনি নিজের চেহারা পালটিয়ে ফেলেছেন যে ধনী লোকটির চেহারার সঙ্গে তাঁর এতটুকুও তফাত নেই। ঘরে ঢুকে তিনি ঐ লোকটির ছেলেদের বললেন ঃ "দেখো, আমি বড়ো মুশকিলে পড়েছি। আমি গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখি এক বহুরূপী ঠিক আমারই মতো চেহারা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখুনি হয়তো সে আমার এই বাড়িতে আসবে। যদি আসে তাহলে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ো.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিছুতেই যেন সে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না পারে।" এই বলে সাধু ঘরের ভিতরে পালঙ্কের উপর গিয়ে বসলেন।

একটু পরেই বাড়ির আসল মালিক সেই লোকটি এসে নিজের বাড়িতে ঢুকতে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেরা তার পথ আটকে দাঁড়াল। লোকটি তো অবাক। সে তখন ছেলেদের বলতে লাগল ঃ "আরে, তোমরা করছ কী? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? আমি গঙ্গাস্নান করে ফিরছি আর তোমরা আমাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না? এ আবার তোমাদের কেমন মতিগতি বাপের সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে?" ছেলেরা তখন রেগে গিয়ে বলল ঃ "ভেবেছ তোমার মতলব আমরা বুঝতে পারিনি? তুমি যে বহুরূপী তা আমরা জানি। আমাদের বাবা ঘরের ভিতরেই রয়েছেন। ভালো চাও তো এখুনি বিদেয় হও।" এইভাবে দুপক্ষে বচসা চলতে লাগল। শেষে ছেলেরা নিজেদের বাপকে দু-চার ঘা চড়-চাপড় ও গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে বার করে দিল।

ধনী লোকটি আর কী করে, সে গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করল। রাজা তখন সাধুকে ডেকে পাঠালেন। সাধু আসতেই রাজা তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন, দুটি লোক হুবহু একরকম দেখতে। কে আসল, কে নকল তিনি ঠিক করতে পারলেন না। রাজার এই অবস্থা লক্ষ্য করে সাধু রাজাকে বললেন ঃ "রাজামশাই, যে আসল লোক, সে তো ঘরের সব খবরই বলতে পারবে। আপনি এক কাজ করলেই তো আসল আর নকলের মীমাংসা হয়ে যায়। ঘরের যেকোনো গোপন খবর আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কে আসল আর কে নকল।" রাজা দেখলেন কথাটা মন্দ নয়। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমার বড় ছেলের বিয়েতে কত খরচ হয়েছে? মেজো ছেলের বিয়েতে কত খরচ হয়েছে? তোমার বাড়ি তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে?" সাধু তো অলৌকিক শক্তিধর, তিনি পটাপট সব জবাব দিয়ে দিলেন। রাজা তখন ধনী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এ যা যা বলছে সব ঠিকমতো বলছে তো?" ধনী লোকটি বলল ঃ "রাজামশাই, ওসব খরচের হিসেব আমার মনে নেই।" সাধু তখন রাজাকে বললেন ঃ "আপনি আমার বাড়ি থেকে হিসেবের খাতাপত্র আনিয়ে দেখুন আমি ঠিক বলছি কিনা।" রাজার হুকুমে তখনই খাতাপত্র আনানো হল। রাজা দেখলেন সাধুর কথাই ঠিক, তাই তাঁর বিচারে ধনী লোকটি বহুরূপী বলে সাব্যস্ত হল।

তার অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। সমস্ত দিনের অনাহার, ছেলেদের হাতে মার খাওয়া, নিজের বাড়িতে ঢুকতে পায়নি, এদিকে বিনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরাধে সবাই তাকে জোচ্চর বলছে। মনের দুঃখে গঙ্গার ধারে বসে সে কাঁদতে লাগল। এইভাবে দু-চারদিন কেটে গেলে পর সাধু নিজের মূর্তিতে লোকটির সঙ্গে দেখা করে বললেন ঃ "বাবা, এখন তো তোমার ধন-ঐশ্বর্য কিছুই নেই, ছেলেরা তোমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর কী করবে বাবা, তুমি রামনাম করো।" ধনী লোকটি বলল ঃ "সাধুজী, এখন আমার চোখ খুলেছে। আমি বুঝতে পারছি টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কিছুই আমার নয়, সবই ভগবানের। আমার যদি হত তাহলে আমার এমন দুর্দশা হবে কেন? এখন থেকে আপনার কথামতো রামনাম করেই দিন কাটাব।" সাধু খুশি হয়ে বললেন ঃ "বাবা, তোমার মঙ্গলের জন্যে আমিই তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি। এখন তুমি নিজের ঘরে যাও, ঐশ্বর্য ভোগ করো আর সেইসঙ্গে রামনাম করতে থাকো। তাতে তোমার কল্যাণ হবে।" সাধুর কথা শুনে ধনী লোকটি তখন থেকে বিষয়কর্মের সঙ্গে ভগবৎ আরাধনায় মন দিল এবং এইভাবে সাধুর কৃপায় পরম কল্যাণের পথে সে অগ্রসর হতে লাগল।

☆ ☆ ☆

সাধারণত দেখা যায় দুঃখ না পেলে মানুষের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় না, ভগবানের দিকে মন যায় না। গভীর দুঃখ আমাদের মনে যে বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলে, তাকে যদি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, তাতেই আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে কুন্তীর স্তব স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্।।

—হে জগদ্‌গুরু যে বিপদ উপস্থিত হলে পুনর্জন্মনিবারক তোমার দর্শনলাভ হয়ে থাকে, সেই বিপদই নিত্য আমাকে ঘিরে থাকুক।

কুন্তী দেখেছেন, যখনই তাঁর কোনো বিপদ এসেছে, তখনই তিনি ভগবানকে ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাই তিনি প্রার্থনা করেছেন বিপদ যেন সদাসর্বদাই আমার লেগে থাকে, কারণ সেই বিপদের মধ্যে ভগবানের দর্শন তো আমি পাব।

এইখানেই হল দুঃখের চরম ও পরম সার্থকতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহৎ লোকের স্বভাব

এক সাধু নৌকো করে নদী পার হচ্ছিলেন, নৌকোয় আরও অনেক যাত্রী ছিল, এক বড়োলোকও তার মোসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সেই নৌকোয় উঠেছিল। মোসাহেবের কাজই হল তার মনিবকে খুশি রাখা। কী করে মনিবকে আনন্দ দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এক দুর্বুদ্ধি চাপল, সে তখন সাধুর উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে দিল। কখনো তাঁর মাথায় খোঁচা মারে, কখনো তাঁর ঝোলা ধরে টানে আর হো হো করে হাসতে থাকল। তার এইসব কাণ্ড দেখে নৌকোর যত লোক সবাই হাসতে লাগল। সাধু কিন্তু নির্বিকার হয়ে বসে রইলেন, একটি কথাও তিনি বললেন না।

কিন্তু সাধুর এই অপমান দেবতাদের সহ্য হল না। সাধু শুনতে পেলেন দেবতারা তাঁকে বলেছেন ঃ "সাধু মহারাজ, আপনার এই অপমান আমরা আর সইতে পারছিনে। আপনি হুকুম দিন, এই মোসাহেবের সঙ্গে নৌকোর সবাইকে আমরা ডুবিয়ে মারি।" সাধু বললেন ঃ "না না, অমন কাজ তোমরা কোরো না। কেন এতগুলো লোকের প্রাণ তোমরা নষ্ট করবে?" দেবতারা তখন বললেন ঃ "আপনি তবে অনুমতি করুন, ঐ মোসাহেবটাকে জলে ফেলে দিই।" সাধু দেবতাদের বললেন ঃ "তোমরা যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকো তাহলে আমি অনুনয় করে বলছি তোমরা ওকে প্রাণে মেরো না। তার চেয়ে ওর দুর্বুদ্ধি নষ্ট করে সেই জায়গায় সুবুদ্ধি এনে দাও না কেন। সুবুদ্ধি হলে ও আর কখনো কোনো লোককে এভাবে অপমান করবে না। জানো তো, ভাঙতে সকলেই পারে, কিন্তু গড়তে পারে ক'জন?"

☆ ☆ ☆

মহৎ মানুষের হাজারো অপকার করলেও তিনি সর্বদা অপকারীর উপকারই করে থাকেন। তিনি চান সকলের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, তাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটুক। নিজের ক্ষতি বা অপমানের দিকে তিনি তাকান না বা মনেও রাখেন না কিছু।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুই বর এক বউ

এক বরযাত্রীর দল বর-বউ নিয়ে খুব ধুমধাম করে ঘরে ফিরছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন তারা যাচ্ছে তখন একটা ভূত বরের বেশ ধরে সেই দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে বলতে শুরু করল ঃ "আরে, আমার বউকে নিয়ে কোথায় চলেছ তোমরা? ওকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দাও, নইলে ভালো হবে না বলছি।" এই বলেই সে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। বরযাত্রীরা দেখল মহা বিপদ, দুই বরই একরকম দেখতে, এখন কাকে রাখে, কাকে ছাড়ে। কিছুই ঠিক করতে না পেরে তারা তখন রাজার কাছে মীমাংসার জন্যে গেল। রাজাও দেখলেন দুই বর একই রকম দেখতে, তিনিও মহা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। অন্য কোন উপায় না দেখে তিনি তখন বউটিকে জিজ্ঞসা করলেন ঃ "কে তোমার বর তুমিই বলো।" বউটি একবার একে দেখায়, একবার ওকে দেখায়, কিছুই সে ঠিক করে বলতে পারে না। রাজাও এ সমস্যার কোনো মীমাংসা করতে পারলেন না। বরযাত্রীর দল নিরাশ হয়ে বউয়ের সঙ্গে দুই বরকে নিয়ে আবার রওনা হল।

মাঠে তখন রাখাল ছেলেরা গরু চরাতে এসেছে। গরুর পালকে ছেড়ে দিয়ে তারা সবাই খেলায় মেতে উঠল। কেউ হল রাজা, কেউ হল মন্ত্রী, কেউ বা পাত্র মিত্র সেপাই। যে রাজা হয়েছে সে বসেছে একটা মাটির ঢিপির উপরে, সেই মাটির ঢিপিই হল তার সিংহাসন। রাজা দেখতে পেল এক বরযাত্রীর দল ঝগড়া করতে করতে চলেছে। রাজা তখন তার সেপাইদের হুকুম দিল ঃ "দেখে এসো ওরা কেন ঝগড়া করছে আর ওদের আমার কাছে ধরে আনো। ওদের বোলো আমি ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দেব।" সেপাইরা তখনই তাদের কাছে ছুটে গিয়ে বলল ঃ "তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো। আমাদের রাজা বিচার করে তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবে।" খেলার রাজা ঝগড়া মেটাবে শুনে বরযাত্রীর দল তো অবাক। তবু ব্যাপার কী তা দেখবার জন্যে তারা সেপাইদের সঙ্গে তাদের রাজার কাছে এসে উপস্থিত হল।

বরযাত্রীদের কথা শুনে রাজা বলল ঃ "তোমরা কোনো চিন্তা কোরো না, আমি এখুনি তোমাদের সব গোলমাল মিটিয়ে দিচ্ছি। তোমরা একশোটা ছিদ্র করা একটা ঘড়া আমার কাছে নিয়ে এসো।" রাজার কথায় বরযাত্রীরা সেইরকম একটা ঘড়া নিয়ে এল। রাজা বলল ঃ "বউটির বর বলে তোমরা দুজনেই দাবী করছ। যে এই ঘড়ার মধ্যে ঢুকে এই একশো ছিদ্র দিয়ে বেরুতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারবে, সে-ই হল এই মেয়েটির আসল বর।" এই কথা শুনে ভূত তো মহা খুশি। সে তো ভূত, তার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। সে তখনই সেই ঘড়ার মধ্যে ঢুকে একশো ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে রাজাকে বলল : "এবার আমার বউকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।" রাজাও অমনি বলে উঠল : "বটে! তুই চালাকি পেয়েছিস? তুই নির্ঘাত ভূত, নইলে মানুষ কখনো ওভাবে ঘড়ার মধ্যে ঢুকতে আর বেরুতে পারে? এখুনি এখান থেকে পালা, নইলে ভালো হবে না বলছি।" রাজার কথা শেষ হতে না হতেই বরযাত্রীর দল ভূতকে পেটাতে শুরু করল। বেগতিক দেখে ভূতও তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে ছাড়তে সেখান থেকে ছুটে পালাল।

এদিকে দেশের যিনি রাজা, তিনি যখন শুনলেন যে তিনি নিজে যে বিচার করতে পারেননি, সামান্য একটা রাখাল সেই বিচার করে দিয়েছে, তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কী করে এটা সম্ভব হল তা জানবার জন্যে তিনি সেই মাঠে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন মাটির একটা ঢিপিকে সিংহাসন করে রাখাল তার উপরে রাজা সেজে বসেছিল। তিনি তখন সেই ঢিপি খুঁড়তে হুঁকুম দিলেন। ঢিপি খুঁড়তেই সেখানকার মাটির নিচে থেকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেরিয়ে পড়ল। তখন রাজা বুঝতে পারলেন যে রাখাল ওখানে বসেছিল বলেই তার মগজে বিক্রমাদিত্যের মতো প্রখর বুদ্ধি খুলে গিয়েছিল, তাই সে এত সহজে এতবড়ো একটা সমস্যার মীমাংসা করতে পেরেছে। নইলে সাধারণ এক রাখালের মধ্যে এতখানি বুদ্ধি কি থাকতে পারে?

☆ ☆ ☆

বুদ্ধি হবে রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো প্রখর আর শরীরের বল হবে চাষার মতো, তবেই জীবনে সফলতা অর্জন করা যাবে। অর্থাৎ ব্রহ্মবেত্তার বুদ্ধি আর সংসার করবার মতো কর্মঠ শরীর, এই হল সংসারীর আদর্শ।

নাছোড়বান্দা চাকর

এক রাজার একটি চাকর জুটে গেল, নাম তার মনিরাম ভূত। কাজে বহাল হবার সময় মনিরাম রাজার সঙ্গে এই সর্ত নিল যে সর্বক্ষণ তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে, এক মুহূর্তও তাকে চুপচাপ বসিয়ে রাখা চলবে না। তাছাড়া সব সময় সে রাজার কাছে কাছে থাকবে, রাজা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেখানেই থাকুন আর ঘুমোতেই যান বা খেতেই বসুন, মনিরামকে কখনো কাছছাড়া করা চলবে না। অদ্ভুত ক্ষমতা মনিরামের, কাজের কথা বলতে না বলতেই চোখের পলকে সেই কাজ করে দেয়। এমন এক করিৎকর্মা চাকর পেয়ে রাজা খুব খুশি হলেন।

কিন্তু রাজার এ আনন্দ বেশিদিন রইল না। দু-চারদিন বাদেই মনিরামকে দেবার মতো কাজ রাজা আর খুঁজে পেলেন না। এদিকে মনিরামও নাছোড়বান্দা, কাজ কাজ করে রাজাকে সে পাগল করে তুলল। তার তাগাদার জ্বলায় রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন, কী করে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় দিনরাত এই চিন্তায় তাঁর শরীরও ভেঙে পড়তে লাগল।

এইরকম দুশ্চিন্তায় রাজা যখন দিন কাটাচ্ছেন ঠিক তখনই তিনি একজন সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বৎস, তোমাকে এমন কাতর দেখছি কেন?" রাজা বললেন ঃ "গুরুদেব, আমি বড়ো দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছি। আমার এক বিনা মাইনের চাকর জুটেছে, এক মুহূর্তও সে কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তার জন্য এত কাজ কোথায় পাই, এই চিন্তাতেই আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আপনি দয়া করে এর একটা বিহিত করে দিন।" রাজার কথা শুনে হেসে বললেন ঃ "তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, আমি তোমাকে একটা পথ বাতলে দিচ্ছি। তোমার উঠোনে ঐযে বাঁশটা পোঁতা রয়েছে, মনিরামকে বলে দাও ঐ বাঁশ ধরে সে ওঠানামা করুক। যতক্ষণ তুমি তাকে অন্য কাজ দিতে না পারছ, ততক্ষণ সে কেবল বাঁশের উপর উঠবে আর নামবে।"

গুরুর কথামতো রাজা তখনই মনিরামকে বললেন ঃ "যাও, এখন ঐ বাঁশের উপর ওঠানামা করতে থাকো, এই কাজই এখন তোমাকে দিলাম। অন্য কোনো কাজের দরকার পড়লে তখন তোমাকে ডাকব।" মনিরাম আর কী করে, রাজার হুকুম তামিল না করে তার উপায় নেই। সে তখন বাঁশ ধরে ওঠানামা করতে লাগল। এইভাবে মনিরাম ভূত জব্দ হল, রাজাও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলেন।

☆ ☆ ☆

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি করে মনিরাম ভূত রয়েছে, সে হল আমাদের মন। মন কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না, সে অনবরত ছুটোছুটি করতে থাকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। এই মনকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিভাবে যে মনকে বশে রাখা যায় তা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও আমরা বুঝে উঠতে পারিনে।

মনকে নিয়ে এই সংকট আমাদের জীবনে যখন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন সদ্‌গুরুর দর্শন মেলে আর তিনি এই সংকট আমাদের নিরসনের উপায় বলে দেন। সে উপায় হল মনকে বাঁশের উপর ওঠানামা করানোর অভ্যাসে নিযুক্ত রাখা, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে মনের দৃষ্টি ফেরানো। শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে মন যদি লক্ষ্য স্থির রাখতে পারে তাহলেই মন স্থির হয়ে আসে, তার ছুটোছুটি বন্ধ হয়। তাই মহাজনদের উপদেশ হল এই যে মনকে কখনো খালি রেখো না, তাহলেই সে তোমার উপর উৎপাত করবে। মনকে যদি নিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখবার অভ্যাস করানো যায় তাহলে ব্যবহার জগৎ ও পরমার্থ, দুদিক দিয়েই মঙ্গল সাধিত হয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা সাধন পথের একটি পরম সহায় বলে গণ্য। যোগসাধনায় যে প্রাণায়ামের কথা বলা হয়েছে তারও উদ্দেশ্য হল শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করা, যাতে মন স্থির হতে পারে।

মোহান্ধের মোহমুক্তি

সাত মহলা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, তারই অন্দরমহলে রানী থাকেন। রানী পরমাসুন্দরী, কিন্তু তাঁর এই ভুবনভোলানো রূপ একমাত্র রাজা ছাড়া বাইরের কোনো পুরুষ কোনোদিন দেখেনি। নিজের মহলে দাসী ও সখীদের নিয়ে পরম আনন্দে রানীর দিন কাটে।

রানীর এই অসামান্য রূপ একদিন এক মেথরের চোখে পড়ে গেল। অন্দরমহলের পায়খানা পরিষ্কার করে যে মেথরানী, তার সেদিন বড়ো অসুখ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। অথচ সে কাজে যেতে না পারলে পায়খানা পরিষ্কার হবে না, রানীমা তাহলে রাগ করবেন। রানীমা রাগ করলে তার চাকরিটাও ছুটে যেতে পারে আর চাকরি যদি যায় তাহলে তাদের সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। এইসব ভেবে মেথরানী তার স্বামীকে বলল ঃ "আজ তুমিই রাজবাড়ির অন্দরমহলের পায়খানা পরিষ্কার করে এসো। তবে তোমাকে কিন্তু মেয়ে সেজে যেতে হবে। আমার কাপড়চোপড় পরে তুমি যাও, তাহলে কেউ তোমাকে পুরুষ বলে চিনতে পারবে না। সাবধানে কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমার কিন্তু দুশ্চিন্তা ঘুচবে না।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বউয়ের কাপড় পরে মেয়ে সেজে মেথর রাজবাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করল। তারপর যখন সে চলে আসছে তখন হঠাৎ দূর থেকে রাণীকে দেখতে পেল। দেখেই তো চক্ষুস্থির, এমন রূপ সে কখনো দেখেনি। কিন্তু ওখানে সে তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তাই বাধ্য হয়ে তাকে বাড়ি ফিরে আসতে হল। বাড়ি এসে সে আর সুস্থির হয়ে থাকতে পারল না, কেবলই তার মনের মধ্যে রানীর সেই অপরূপ রূপ ভেসে উঠতে লাগল। তার আহারে আর রুচি রইল না, চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল, দিনের পর দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল আর দিনরাত রানীর রূপের চিন্তা করতে করতে সে যেন উন্মাদ হয়ে গেল। তখন তার একমাত্র চিন্তাই হল, যেমন করে হোক অন্তত একদিনের জন্যে হলেও রানীকে কাছে পেতে হবে। অথচ মুখ ফুটে কাউকে একথা বলা চলে না। একবার যদি তা রাজার কানে ওঠে তাহলে তখনই তিনি তার গর্দান নিয়ে নেবেন। মনের চিন্তা মনে চেপে রেখেই মেথরের দিন কাটতে লাগল।

স্বামীর এই শোচনীয় অবস্থা মেথরানী নজর এড়াল না। সে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "কদিন ধরে তোমার কী হয়েছে বলো তো। কোনো অসুখ করেছে? তাহলে বলো, রাজবাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে আসি, ওষুধ খেলেই রোগ ভালো হয়ে যাবে।" মেথর বলল ঃ "আরে না না, অমন কাজও কোরো না। আমার যা রোগ তা কাউকে বলবার নয়, কেউ শুনতে পেলে ঘাড়ের উপরে আর মাথা থাকবে না।" মেথরানী তার স্বামীকে বড়ো ভালবাসত। তাই সে বলল ঃ "তুমি আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না, রোগের কথা সব খুলে বলো, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখব যাতে তোমায় আরাম করতে পারি।" অনেক পীড়াপীড়ির পর মেথর সব কথা জানিয়ে শেষে বলল ঃ "রানীকে একবার অন্তত কাছে না পেলে আমি মরে যাব, তোমরা আমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না।" স্বামীর কথা শুনে মেথরানীর ভয়ানক চিন্তা হল, তবু সে মেথরকে নানাভাবে আশ্বস্ত করে বলল ঃ "তুমি আর মন খারাপ করে থেকো না, যেমন করে হোক আমি তোমার সঙ্গে রানীমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেব।"

পরের দিন মেথরানী রাজবাড়িতে কাজ করেত গিয়ে রানীর সঙ্গে দেখা করল। রানী ছিলেন যেমন সুন্দরী তেমন বুদ্ধিমতী। লোকজনের প্রতি তাঁর দয়ারও অন্ত ছিল না। মেথরানীর শুকনো মুখ দেখে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হ্যাঁরে, তোর মুখ অমন শুকনো দেখছি কেন, কী হয়েছে তোর?" মেথরানী বলল ঃ "রানীমা, আমার দুঃখের কথা কী করেই বা বলি, সেকথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাউকে বলবার নয়।" রানী বললেন ঃ "তুই আমার কাছে সব খুলে বল, আমি দেখব কী করতে পারি।" মেথরানী বলল ঃ "না রানীমা, সেকথা মুখে আনতে আমার ভয় হয়। শুনলে আপনি এখুনি হয়তো আমার মাথা কেটে নেবার হুকুম দেবেন।" ব্যাপার কী জানবার জন্যে রানীর বড়ো কৌতুহল হল। তিনি মেথরানীকে বললেন ঃ "তোর কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি তোর কোনো ক্ষতি করব না, তুই নির্ভয়ে যা বলবার আছে বল।"

মেথারানী প্রথমে খুব খানিকটা কেঁদে নিয়ে বলতে শুরু করল ঃ "কী আর বলব রানীমা, সবই আমার কপাল, নইলে আমার স্বামীর কি এমন মতিগতি হয়।" এই বলে আরম্ভ করে একে একে তার স্বামীর সব কথা সে রানীকে শোনাল। নিজের অসুখ হওয়ায় কেমন করে তার স্বামী শাড়ী পরে মেয়ে সেজে রাজবাড়িতে পায়খানা পরিষ্কার করতে এসেছিল, তারপর রানীমাকে দেখে কেমন করে তার মাথা ঘুরে গেল, এইসব কথা রানীকে শুনিয়ে সে তাঁকে বলল ঃ "রানীমা, আপনাকে দেখে অবধি সে অন্নজল ত্যাগ করেছে, দিনরাত কেবল বলছে, একবার রানীমাকে আমার কাছে এনে দাও; তাঁকে কাছে না পেলে আমি প্রাণে বাঁচব না'। রানীমা, এমন অবুঝ মানুষকে নিয়ে এখন আমি কী যে করব ভেবে পাচ্ছিনে। আমার কপালে বুঝি বৈধব্য ঘনিয়ে এল।" এই বলে বুক চাপড়ে মেথরানী আবার কান্না জুড়ে দিল।

রানীর দয়ার শরীর, সব শুনে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। তিনি তখন মেথরানীকে বললেন ঃ "হায়রে পোড়াকপাল, শেষে মেথরের এই দুর্মতি হল! আমি যে রাজরানী, আমার সঙ্গে কি যে-সে লোকে দেখা করতে পারে? তবে তোর স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা করে আয়, আমি যা যা করতে বলব তা সে করতে রাজী আছে কিনা। যদি রাজী থাকে তাহলে হয়ত একদিন আমার সঙ্গে দেখা করবার একটা উপায় হতে পারে।"

মেথরানী তখন বাড়ি গিয়ে মেথরকে সব কথা জানাল। মেথর বলল ঃ "রানীমাকে একবার কাছে পাওয়ার জন্যে তিনি যে কাজই করতে বলুন না কেন, আমি তাতেই রাজী।" মেথরানী রাজবাড়িতে গিয়ে রানীকে সেকথা জানালে পর তিনি বললেন ঃ "তোর স্বামীকে বলিস গভীর জঙ্গলে গিয়ে সাধু সেজে বসে থাকতে। সে যেন গৈরিক কৌপীন পরে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে আর গায়ে ছাই মেখে কোনো গাছতলায় চোখ বুঁজে বসে থাকে। কারুর সঙ্গে কথা বলা চলবে না, কারুর সামনে কিছু খাওয়া চলবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইভাবে যদি ছ'দিন সে বসে থাকতে পারে তাহলে হয়তো আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার উপায় হতে পারে।"

অবাক হয়ে রানীর কথা শুনছে মেথররানী। রানী বলতে লাগলেন : "জানিস তো, এ রাজ্যের প্রজারা সবাই ধর্মপ্রাণ। ওরা যখন শুনবে যে জঙ্গলে এক বড়ো সাধু এসে আসন পেতেছে, তখন তারা দলে দলে তাকে দর্শন করতে ছুটবে। মেথর যে নকল সাধু তা তো তারা বুঝবে না। এদিকে রাজ্যশুদ্ধ লোক সাধুকে দর্শন করতে যাচ্ছে দেখে রাজার পাত্র-মিত্ররাও তার কাছে যেতে শুরু করবে। তখন রাজাও আর চুপ করে বসে থাকতে পারবে না, তিনিও যাবেন সাধুদর্শনে। রাজার এখনো দীক্ষা হয়নি, তাই তিনি নিশ্চয়ই এই সাধুর কাছে দীক্ষা নিতে চাইবেন। রাজাতো আর একলা দীক্ষা নিতে পারেন না, শাস্ত্রমতে তাঁকে সস্ত্রীক দীক্ষা নিতে হবে। রাজার দীক্ষা হয়ে যাবার পর সমস্ত লোকজন সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আমি একলা দীক্ষা নেবার ছল করে তোর স্বামীর কাছে যাব। তাহলেই তোর স্বামীর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তবে মেথরকে বলিস খুব সাবধানে হুশিয়ার হয়ে এসব কাজ করতে। রাজা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন এ নকল সাধু তাহলে কিন্তু ওর আর রক্ষে থাকবে না, নির্ঘাত তিনি ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবেন।"

মেথরানীকে এইভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রানী তার হাতে অনেক সোনা রূপো হীরে জহরত দিয়ে বললেন : "মেথরকে বলিস সে যখন নকল সাধু হয়ে বসবে তখন যেন তার সামনে একটা বেশ বড় রকমের ধুনি জ্বালিয়ে রাখে। সেই ধুনির যে ছাই হবে, সেই ছাইয়ের মধ্যে এইসব মণিমুক্তো যেন ভালো করে মিশিয়ে রাখে আর লোকে সাধু দেখতে এলে বিভূতি ব'লে তাদের হাতে এক এক মুঠো ছাই তুলে দেয়। ছাই থেকে মণিমুক্তো বেরুতে দেখে মানুষ অবাক হয়ে ভাববে এ সাধু নিশ্চয় কোনো সিদ্ধপুরুষ, নইলে ছাই থেকে কখনো হীরে-জহরত বেরোয়! এর থেকেই দেখবি মস্তবড়ো সাধু বলে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।"

রানীর পরামর্শমতো সব কাজ ঠিক ঠিক হয়ে গেল। মেথর জঙ্গলে গিয়ে সাধু সেজে এক গাছের তলায় চোখ বুজে বসে রইল। সে কথা বলে না, খায় না, লোকজন এলে তাদের হাতে এক মুঠো করে বিভূতি দেয়। ছাই থেকে মণিমুক্তো বেরুতে দেখে মানুষ অবাক হয়ে ভাবে এ সাধু একজন সিদ্ধপুরুষ। তখন এক কান থেকে দু কান, এইভাবে সারা রাজ্য জুড়ে সাধুর নাম ছড়িয়ে পড়ল। আর দলে দলে লোক আসতে লাগল সাধুকে দেখতে। ক্রমে রাজার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দরবারেও সাধুর কথা নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। রাজা তখন পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে করে সাধুকে দর্শন করতে এলেন এবং তার কাছে দীক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। মেথর বলল সস্ত্রীক দীক্ষা নেওয়াই হল শাস্ত্রীয় বিধান। তখন সকলে পরামর্শ করে দীক্ষার দিনক্ষণ করা হল। সেই নির্দিষ্ট দিনে রাজার সঙ্গে রানীও এলেন সাধুর কাছে, চারিদিকে পর্দাঢাকা দোলায় চড়ে। প্রথমে রাজার দীক্ষা হয়ে গেল। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে রাজা গুরুকে প্রণাম করলেন। পাত্র-মিত্র যারা সেখানে ছিল তারাও রাজগুরুকে অজস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে প্রণাম করতে লাগল।

এবার রানী দীক্ষা নেবার ভান করে সাধুর কাছে এলেন। রানীমা আসছেন তাই সাধুর কাছ থেকে সমস্ত লোককে সরিয়ে দেওয়া হল। রানী একলা এসে দাঁড়ালেন সাধুর সামনে। মেথরকে তিনি বললেন ঃ "ওরে মেথর, এতদিনে তো তোর মনস্কামনা পূর্ণ হল, আমি নিজে আজ তোর কাছে এসেছি। এবার আমাকে নিয়ে তুই কী করতে চাস বল।" রানীর কথা শোনামাত্র মেথর তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল ঃ "মা, তুমিই হলে আমার গুরু আর আমি হলাম তোমার শিষ্য। আজ থেকে তোমাতে আমাতে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ হল। মাগো, তুমি আমাকে নকল সাধু হবার উপদেশ দিয়েছিলে, সেই নকল সাধুরই আজ কত সম্মান! স্বয়ং রাজা তার পায়ে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দিয়ে তার সামনে জোড়হাত করে দাঁড়িয়েছেন, স্বয়ং রাণীমা এসেছেন তার কাছে। নকলেরই যখন এত সম্মান তখন আসল সাধু হতে পারলে যে কী লাভ হবে তা আমি কল্পনাতেও আনতে পারছিনে।

রানী তখন বললেন ঃ "দেখো, আমি তোমাকে ধর্মের ভান করতে শিখিয়ে দিয়েছিলাম কেন জানো? আমি জানতাম ধর্মের ভান করতে করতেই একদিন তোমার মধ্যে প্রকৃত ধর্মের ভাব জেগে উঠবে। আমাকে পাবে বলে কী কঠোর তপস্যাই না তুমি করেছ, দীর্ঘকাল চোখ বুঁজে, আহার ও বাক্যের সংযম করে দিন কাটিয়েছ। এইভাবে ইন্দ্রিয়সংযমের ফলে তোমার মধ্যে স্বাত্ত্বিকী বৃত্তির স্ফূরণ হয়েছে, তোমার ভিতরকার যত মালিন্য সব দূর হয়ে গিয়েছে, তোমার চিত্ত হয়েছে নির্মল। আর তোমার কোনো ভয় নেই, এবার তুমি সাধুর ভান ছেড়ে দিয়ে সত্যধর্মের দিকে মন দাও, নকল ছেড়ে আসল সাধু হয়ে যাও।"

রানীর উপদেশে মেথর তখন প্রকৃত সাধু হয়ে ভগবানকে লাভ করবার জন্যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হল।

☆ ☆ ☆

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্মের ভান থেকেও মানুষের মধ্যে সদ্‌বৃত্তি জেগে ওঠা অসম্ভব নয়। এই গল্পটিতে মেথর ইন্দ্রিয়সংযম করে স্থির হয়ে বসে থাকার দরুণ ক্রমে তার মনের অসৎ প্রবৃত্তি দূর হয়ে গেল। মহাজনেরা বলেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখতে পারলে যেমন অন্তরের মালিন্য দূর হয়ে যায়, তেমনি অন্তরকে স্থির করতে পারলেও ইন্দ্রিয়গুলির চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়। ভিতর-বাহিরের এ এক পরম রহস্য। কেউ বাইরে থেকে ভিতরের দেবত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে, কেউ বা ভিতর থেকে নিজের দেবত্বকে বাইরে প্রকাশ করছে। ধর্মের তাই ভানও ভালো। এই ভান থেকেই তার একদিন ত্রাণ হয়ে যেতে পারে, মিথ্যা খেলাই সত্য খেলায় পরিণত হতে পারে।

বিশ্বামিত্রের দম্ভ

বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্র বরাবরই বিদ্বেষ পোষণ করতেন। বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি একবার কোনো কারণে সূর্যবংশীয় রাজা কল্মাষপাদকে অভিশাপ দিয়ে রাক্ষসে পরিণত করেন। বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় রাক্ষস কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রকে খেয়ে ফেলল। পুত্রশোকে বশিষ্ঠ কেমন কাতর হয়েছেন তা দেখবার জন্যে বিশ্বামিত্র একদিন বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন বশিষ্ঠ ও তাঁর স্ত্রী অরুন্ধতী দুজনে বসে গল্প করছেন। অরুন্ধতী তখন তাঁর স্বামীকে বলছিলেন : "কী চমৎকার এই চাঁদের আলো, সারা ভুবন যেন এই আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। এমন উজ্জ্বল প্রকাশ আর কি কোথাও সম্ভব?" বশিষ্ঠ বললেন : "অরুন্ধতী, এইরকম উজ্জ্বলতা রয়েছে বিশ্বামিত্রের তপস্যার মধ্যে।" বশিষ্ঠের এই কথা শুনে বিশ্বামিত্রের মনে বড়ো দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, আমি এঁর একশত পুত্রকে নিধন করেছি, তা সত্ত্বেও ইনি আমার তপস্যার এত প্রশংসা করছেন!

বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন : "আসুন আসুন, ব্রহ্মর্ষি আসুন।" বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : "হে বশিষ্ঠদেব, আপনি আজ আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলছেন কেন? আগে তো কখনো আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলে সম্বোধন করেননি। আমি ক্রোধবশে তাই আপনার শত পুত্রকে সংহার করেছি। আগে যদি ব্রহ্মর্ষি ব'লে আমাকে সম্বোধন করতেন তাহলে আমি আপনার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছেলেদের কোনো ক্ষতি করতাম না। আপনি বলুন, কী এমন কারণ ঘটল যার জন্যে এখন আপনি ব্রহ্মর্ষি বলে সম্বোধন করছেন।" বশিষ্ঠ বললেন ঃ "বিশ্বামিত্র, আমি চিরকাল সত্যবাদী, কখনো আমি মিথ্যা বলিনি। আগে আপনি ছিলেন রাজর্ষি, কী করে তখন আপনাকে ব্রহ্মর্ষি বলব? এখন দেখছি আপনার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নেই, আপনার হৃদয় সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ তাই এখন আপনাকে ব্রহ্মর্ষি বলতে কোনো দ্বিধা আমার নেই।"

বশিষ্ঠের মুখে এই কথা শুনে বিশ্বামিত্রের মনে বেশ অহংকার হল। তিনি বশিষ্ঠকে বললেন ঃ "আপনি তো আমার তপস্যার অনেক প্রশংসা করলেন, এখন বলুন আমার মতো তপস্যার তেজ আর কার মধ্যে দেখেছেন।" বশিষ্ঠ দেখলেন নিজের সম্বন্ধে বিশ্বামিত্রের মনে এখনো বেশ দম্ভ রয়েছে। তিনি বললেন ঃ "আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই, একমাত্র নাগরাজ বাসুকিই পারেন এর উত্তর দিতে।" দুই ঋষি তখন বাসুকির কাছে গেলেন। বিশ্বামিত্রের প্রশ্ন শুনে বাসুকি তাঁকে বললেন ঃ "ঋষিবর, আমি আমার মাথার উপর সমস্ত পৃথিবীর ভার বহন করছি। এই ভার থেকে মুক্ত না হলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি তো অনেক তপস্যা করেছ। তোমার তপস্যার বলে আমার মাথার উপর থেকে পৃথিবীর বোঝা একবার নামিয়ে দাও, মাথা হাল্‌কা হলে পর আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।"

বিশ্বামিত্র তখন বাসুকিকে বললেন ঃ "আমার চল্লিশ হাজার বছরের পুণ্যফল আপনাকে দিচ্ছি, সেই তপস্যার বলে আপনার মাথার উপর থেকে পৃথিবী সরে যাক।" বিশ্বামিত্রের চল্লিশ হাজার বছরের তপস্যার ফল বিফল হল, পৃথিবী যেমন ছিল তেমনি রইল, একটু নড়ল না। বিশ্বামিত্র তখন পঞ্চাশ হাজার বছরের তপস্যার ফল দিলেন। তাতেও কিছু হল না। এবার দিলেন সত্তর হাজার বছরের পুণ্যফল। না, সে তপস্যাও বিফল হল। তখন বাসুকি বশিষ্ঠকে বললেন ঃ "বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের এত তপস্যার জোরেও তো কিছু হল না, এবার তোমার তপস্যা দিয়ে দেখো কিছু করতে পারো কিনা।" বশিষ্ঠ বললেন ঃ "আমি তো এমন কিছু তপস্যা করিনি যার ফল আপনাকে দিতে পারি, তবে আমি ক্ষণকালের জন্যে যে সৎসঙ্গ করেছিলাম, তারই পুণ্যের ফল আপনাকে দিচ্ছি। দেখুন তা দিয়ে পৃথিবীকে আপনার মাথার উপর থেকে নামাতে পারেন কিনা।" এই বলে বশিষ্ঠ তাঁর ক্ষণকালের সৎসঙ্গের পুণ্যফল বাসুকিকে দান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাসুকির মাথার উপর থেকে পৃথিবীর ভার অপসৃত হল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্বামিত্র তখন বাসুকিকে বললেন ঃ "এখন তো আপনার মাথা হালকা হয়েছে, এবার বলুন আমার মতো তপস্যার তেজ আর কার আছে।" বাসুকি বললেন ঃ "এখনো তুমি তোমার প্রশ্নের জবাব পাওনি? তোমার সত্তর হাজার বছরের তপস্যার জোরে পৃথিবী একটুও নড়ল না আর বশিষ্ঠের এক মুহূর্তের সৎসঙ্গের পুণ্যে তা সম্ভব হল। এতেও কি বুঝতে পারোনি যে সৎসঙ্গের মহিমা কতখানি? সৎসঙ্গের কি তুলনা আছে?"

বাসুকির কথা শুনে বিশ্বামিত্র লজ্জা পেলেন। তিনি যে নিজের তপস্যা নিয়ে এত গর্ব বোধ করতেন, তা দূর হয়ে গেল আর সৎসঙ্গের যে বিপুল মহিমা তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন।

☆ ☆ ☆

আপন চেষ্টায় সাধন-ভজন তপস্যা করলে অনেক সময়ই মানুষের মনে অহংকারই জেগে ওঠে, অথচ অহংকারকে দূর করবার জন্যেই তো সাধন-ভজন। তাই অহংকার দূর করবার জন্যে মানুষের প্রয়োজন সৎসঙ্গ, মহতের সঙ্গ, যে মহতেরা তাঁদের বিনয় ও নম্রতায় সকলের অহংকারকে নুইয়ে দেন, লয় করে দেন।

চোরের রূপান্তর

এক চোর বুড়ো হয়ে গিয়েছে, আর সে তেমন চুরি করতে পারে না। তাই চুরি করবার যতরকম বিদ্যে তার জানা ছিল, তা সে তার ছেলেকে ভালো করে শেখাতে লাগল। সমস্ত কৌশল যখন শেখানো হয়ে গেল তখন সে ছেলেকে বলল ঃ "দেখো বাবা, আমার দুটি কথা সব সময় মনে রেখো। কখনো সাধুসঙ্গ কোরো না আর কখনো সত্যি কথা বোলো না। এই দুটি কথা যদি ভুলে যাও তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বে।"

বাপের শিক্ষায় ছেলেও একজন পাকা চোর হয়ে উঠল। একদিন গভীর রাতে পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে সে গেল রাজবাড়িতে। রাজপুত্র তখন নিজের ঘরে পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। চোর নিঃশব্দে সেই ঘরে ঢুকে রাজপুত্রের গলা কেটে তার সমস্ত অলংকার নিয়ে পালিয়ে গেল। রাজবাড়িতে অত সেপাই-সান্ত্রী রয়েছে, কেউ তা জানতে পারল না। কিন্তু চোরের বরাত খারাপ। পরদিন সকালবেলা তাকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় সেপাইরা তার হাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে চলল। পথে যেতে যেতে চোর দেখতে পেল যে পথের ধারে গাছতলায় এক সাধু বসে রয়েছেন আর অনেকগুলি লোক তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর উপদেশ শুনছে। চোরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বাপের কথাগুলো। বাপ তাকে বলেছিল সে যেন কখনো সাধুসঙ্গ না করে। পাছে সাধুর উপদেশ কানে যায় এই ভয়ে তার ইচ্ছে হল আঙুল দিয়ে নিজের কান দুটো বন্ধ করে রাখে। কিন্তু তার হাত যে বাঁধা। কাজেই সাধুর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সাধুর কথাগুলো তার কানে এসে পৌঁছল। সাধু তখন ভক্তদের বলছেন ঃ "দেবতাদের চোখের পলক পড়ে না, তাঁদের পা মাটি স্পর্শ করে না আর তাঁদের কোনো ছায়া পড়ে না।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোরকে সাধুর এই কথাগুলি শুনতে হল।

সেপাইরা চোরকে ধরে নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুই রাজকুমারকে খুন করে তার অলংকার চুরি করেছিস?" চোর বলল ঃ "না মহারাজ, আপনি বিশ্বাস করুন আমি অমন কাজ করিনি।" রাজা তখনকার মতো চোরকে কয়েদখানায় বন্ধ করে রাখলেন। এদিকে চোর তার অপরাধ কবুল করল না দেখে রাজা তাঁর রাজ্যে ঢেঁড়া দিয়ে দিলেন যে চোরকে যে তার অপরাধ কবুল করাতে পারবে তাকে তিনি অনেক পুরস্কার দেবেন। ঢেঁরা শুনে এক বেশ্যা রাজার কাছে এসে বলল ঃ "মহারাজ আমি চোরকে তার অপরাধ স্বীকার করাব, কিন্তু আপনি হুকুম দিয়ে দিন যে আমি যখন কয়েদখানায় চোরের কাছে যাব, তখন যেন কোনো সেপাই-সান্ত্রী সেখানে না থাকে। আমি একলা চোরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" রাজা তাতেই রাজী হয়ে জল্লাদকে বলে দিলেন ঃ "এই বেশ্যার কাছে চোর তার অপরাধ স্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোরের মাথা কেটে ফেলবে। চোর আমার ছেলেকে খুন করেছে, কাজেই তারও বেঁচে থাকা চলবে না।"

চোর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কয়েদখানায় পড়ে রয়েছে। তখন নিশুতি রাত, এমন সময় সেই বেশ্যা কালীর মূর্তি ধারণ করে কয়েদখানায় প্রবেশ করল। এমন নিখুঁতভাবে সে কালী সেজেছে যে মানুষ বলে তাকে চেনাই যায় না। কালীমূর্তি এসে চোরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পড়ল। চোর-ডাকাতদের কুলদেবী হলেন কালী। চোর মনে করল স্বয়ং মা কালী এসেছেন তার কাছে। অমনি সে মা কালী ভেবে বেশ্যাকে প্রণাম করল। বেশ্যা বলল ঃ "বাছা, আমি তোদের কুলদেবী, তোকে রক্ষা করবার জন্যেই আমি এসেছি। তোর কোনো ভয় নেই, আমার কাছে তুই সত্যি কথা বল্ রাজপুত্রকে খুন করে তুই তার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অলংকার চুরি করেছিস কিনা।" চোর ভাবল স্বয়ং কুলদেবী যখন আমাকে রক্ষা করবেন বলে এসেছেন, তখন তাঁর কাছে কি মিথ্যে বলা যায়? এই ভেবে সে তার অপরাধ স্বীকার করতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ তার সাধুর উপদেশ মনে পড়ে গেল। সাধু বলেছিলেন দেবতাদের চোখের পলক পড়ে না, মাটিতে পা স্পর্শ করে না, তাঁদের শরীরের কোনো ছায়া পড়ে না। আরে, এ স্ত্রীলোকটার যে চোখের পলক পড়ছে, মাটিতে পা দিয়ে দিব্যি সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ঐতো তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এ তো তাহলে দেবী নয়, দেবীর ছদ্মবেশ ধরে এ আমাকে দিয়ে অপরাধ কবুল করিয়ে আমাকে খুন করাতে চায়। চোর তখন বেশ্যাকে বলল ঃ "মা, তুমি আমার কুলদেবী, তুমি আমার অন্তর্যামী। মনের কথা তোমার কাছে কি লুকোনো থাকে মা? তুমি তো জানো মা আমি রাজপুত্রকে খুনও করিনি, তাঁর অলংকারও আমি চুরি করিনি। মিথ্যে এরা আমাকে কয়েদখানায় পুরে রেখেছে।"

বেশ্যার চেষ্টা ব্যর্থ হল। চুরির কোনো প্রমাণ না পেয়ে রাজাও চোরকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে চোর ভাবতে লাগল, বাবা আমাকে সাধুসঙ্গ করতে বারণ করেছিলেন পাছে আমি সাধুদের উপদেশ শুনে চুরি করা ছেড়ে দিই। এখন দেখছি, ভাগ্যে সাধুর উপদেশ আমার কানে এসেছিল, নইলে ঐ ছদ্মবেশী কালীকে কুলদেবী মনে করে আমি তো সব অপরাধ স্বীকার করতেই যাচ্ছিলাম। ঐ সাধুর উপদেশই আজ আমাকে প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিল। ক্ষণিকের সাধুসঙ্গেই যদি আমার প্রাণ এভাবে রক্ষা পেতে পারে, তাহলে সব সময় সাধুসঙ্গ করতে পারলে তো আমি অমর হয়ে যাব।

চোর তখনই স্থির করল সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না, চুরিও করবে না, এখন থেকে সে শুধু সাধুদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরবে।

যে ছিল চোর, ক্ষণিকের সাধুসঙ্গের ফলে তার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

☆ ☆ ☆

শ্রী শংকরাচার্য বলেছেন ঃ 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা'— ক্ষণকালের সাধুসঙ্গ ভবসাগর পার হবার নৌকো হয়ে দাঁড়ায়, মানুষকে সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। সৎসঙ্গের এমনই মহিমা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তিম চিন্তা

কোনো গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী বাস করত। বড়ো ভালো মানুষ ছিল তারা, গৃহদেবতার পূজো-অর্চনা নিয়েই তাদের দিন কেটে যেত। কিন্তু তাদের কোনো সন্তানাদি হয়নি বলে তাদের মনে সুখ ছিল না। তাই একটি সন্তানের জন্যে ভগবানের কাছে প্রতিদিন তারা আকুল প্রার্থনা জানাত। অবশেষে বৃদ্ধ বয়েসে যখন তাদের একটি মেয়ে হল তখন স্বামী-স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না, তারা পরম যত্নে মেয়েটিকে লালন-পালন করতে লাগল। মেয়েটি বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবে নানারকম সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হতে দেখে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী মুগ্ধ হয়ে গেল। সে ভোরবেলা বন থেকে ফুল তুলে এনে সারাদিন ধরে শিবের পুজোয় তন্ময় হয়ে থাকে, তারপর দিনের শেষে পুজো শেষ হলে সে ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দেয়।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমে মেয়েটি যখন যৌবনে পা দিল তখন বাপ-মা তার বিয়ের উদ্‌যোগ করতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি বিয়ে করতে রাজী হল না। সে তার মাকে বলল ঃ "মা, কেন তোমরা আমার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ? বিয়ে হলে আমি আর বাঁচব না, বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু হবে।" মেয়ের কথা শুনে বাপ-মা ভয় পেয়ে গেল, তারা আর মেয়ের বিয়ে দিল না। মেয়েটিও মনের আনন্দে শিবের পূজো নিয়ে দিন কাটাতে লাগল।

ব্রাহ্মণের সংসার বেশ নিরুপদ্রবেই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই সংসারে বিপদ ঘনিয়ে এল। তাদের মেয়েটি এমনই অসুস্থ হয়ে পড়ল যে আর বুঝি তাকে বাঁচানো যাবে না। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে মেয়েটি তখন চিন্তা করছে, বাবা বড়ো গরীব, আমার বিয়ে দেবার মত সামর্থ্য তাঁর নেই, তাই আমি বিয়ে না করে পূজার্চনাতেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম। ধন-সম্পদ যে কী জিনিস তা আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। যখন সে এইসব কথা ভাবছে ঠিক তখনই তার মৃত্যু হল।

অন্তিমকালে যে চিন্তা মনে উদয় হয়, সেই চিন্তা অনুসারেই মানুষ আবার জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের মেয়ে মৃত্যুর সময় ধন-দৌলতের চিন্তা করছিল, তাই পরের জন্মে রাজার ঘরে তার জন্ম হল। কিন্তু আগের জন্মের তপস্যার পুণ্যফলে সে-জন্মের কোনো কথা সে ভুলে যায়নি। রাজকন্যা ভাবতে লাগল, গত জন্মে এত তপস্যা করলাম, কিন্তু মৃত্যুকালে ধন-দৌলতের চিন্তা করেছিলাম বলে এবার আমার রাজার ঘরে জন্ম হল। মৃত্যুর সময় যদি হুঁশিয়ার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হতে পারতাম তাহলে আমার সকল তপস্যা এভাবে বিফল হয়ে যেত না। কিন্তু হা-হুতাশ করে তো কোনো লাভ নেই, যা হবার তা হয়েছে। এখন থেকে দিনরাত কেবল ভগবানের নাম জপ করতে থাকি যাতে শেষ সময়ে ইষ্টদেবের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হয়। তাতেই আমি পুনর্জন্মের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাব।

শৈশব অতিক্রম করে রাজকন্যা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করল। মেয়েটি ছাড়া রাজা-রানীর আর কোনো সন্তান নেই। বড়ো আদর যত্নে তাঁরা তাকে মানুষ করেছেন। তাঁরা দেখলেন তাঁদের এই আদরের মেয়েটির যেন কিছুতেই কোনো উৎসাহ নেই, কেবল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মনপ্রাণ ঢেলে বিষ্ণুমূর্তির সেবা করাই তার নিত্যকর্ম হয়ে উঠল। সারাদিন তার অনাহারে কাটে, সেদিকে তার লক্ষ্য নেই, সন্ধ্যেবেলা পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কিছু খেতে চায় না। একমাত্র মেয়ের এইরকম মতিগতি দেখে রাজা-রানী যেমন দুঃখ পেলেন তেমনি রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবেও তাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। রাজার মেয়ে হয়ে সে যদি কেবল ঠাকুরসেবা নিয়েই মেতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে রাজ্যশাসন সে কেমন করে করবে? এতবড়ো রাজত্ব কি শেষে ছাড়খার হয়ে যাবে? রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে পরামর্শ করতে বসলেন। মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, রাজকন্যা এখন বড়ো হয়েছে, আপনি তার বিয়ে দিন। বিয়ে দিলেই তার স্বভাবের পরিবর্তন হবে।" মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা মেয়ের জন্যে পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। রাজকন্যা সে কথা জানতে পেয়ে রাজাকে বলল ঃ "বাবা, আমি যেমন আছি তেমনি আমাকে থাকতে দাও। আমার বিয়ে দিলে আমি আর বাঁচব না।" রাজা দেখলেন মহা বিপদ। বিয়ে দিলে সত্যিই যদি মেয়ে মরে যায় তাহলে কাকে নিয়ে তাঁরা থাকবেন? তার চেয়ে বিষ্ণুর পুজো নিয়ে সে যদি সুখে থাকে তো তাই থাক। এই ভেবে রাজারানী মেয়ের বিয়ের চিন্তা ত্যাগ করলেন, মেয়েও মনের সাধ মিটিয়ে তার ঠাকুরকে নিয়ে মেতে রইল।

দিন যায়, বছর যায়। একদিন রাজকন্যার ভীষণ অসুখ করল, মনে হল আর বুঝি সে বাঁচবে না। রাজা তখন তার চিকিৎসার জন্যে কবিরাজ ডাকতে বললেন। মেয়ে তাই শুনে বলল ঃ "তোমরা কবিরাজকে ডেকো না, কবিরাজ আমাকে স্পর্শ করলেই আমি মারা যাব।" বাপ-মা তার কথা শুনলেন না, কবিরাজকে ডেকে পাঠালেন। কবিরাজ এসে যখন রাজকন্যার নাড়ী টিপে দেখছে, তখন কবিরাজের সেই স্পর্শে তার মনের গতি হঠাৎ বদলে গেল। সে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবতে লাগল, আগের জীবনে আমি কোনো পুরুষের স্পর্শ পাইনি, এ জন্মেও তা পেলাম না। পুরুষের স্পর্শ যে কেমন, তা আর আমার জানা হল না। এই চিন্তা করতে করতেই রাজকন্যা দেহত্যাগ করল।

পুরুষের স্পর্শের কথা চিন্তা করতে করতে মৃত্যু হওয়ায় এবার রাজকন্যা এক বেশ্যার ঘরে জন্ম নিল, কিন্তু আগের দু-জন্মে সে যে কঠোর তপস্যা করেছিল তারই পুণ্যফলে এবারও সে জাতিস্মর হয়ে জন্মাল। তার মনে পড়ে গেল যে মৃত্যুকালে পুরষসংসর্গের কথা চিন্তা করার দরুণ এবার তাকে বেশ্যার ঘরে জন্ম নিতে হয়েছে। এখানে কেমন করে সে নিজের সতীত্ব বজায় রাখবে এবার সেইটাই তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। অনেক ভেবে সে ঠিক করল যে এ জীবনটা তাকে পাগলি সেজে কাটাতে হবে। ভাবনাটা কাজে প্রয়োগ করতে দেরী হল না। লোকে দেখল বেশ্যার ঘরে যে মেয়েটা জন্মেছে তার মাথার ঠিক নেই, অকারণে হাসছে আর কাঁদছে, গায়ে ধুলো কাদা মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকজন দেখলে তাদের গায়ে থুথু দিচ্ছে আর গালাগালি করছে। বাইরের আচরণ দেখে কে বলবে যে সে পাগলি নয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সব সময় সে ভগবানের নাম করে চলেছে, মানস জপে তার অন্তর তখন ভগবৎপ্রেমে বিভোর। এইভাবে বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করে পাগলি যৌবনের কোঠায় পা দিল। পাগলি ভেবে কোনো পুরুষ তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

একদিন পাগলি গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছে এমন সময় সে দেখতে পেল এক সাধু গঙ্গার ধারে বসে চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন। সাধুকে দেখে পাগলি তাঁর কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ধ্যানভঙ্গ হবার পর সাধু যেই চোখ তুলে তাকিয়েছেন, অমনি পাগলি তাঁর দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল ঃ "তপাসু ক্ষপা, অন্তমতাসু গতা", অর্থাৎ এখন তো খুব তপ করছ, এ সবই তো ক্ষয়শীল, তপস্যা তো একদিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু অন্তিমকালে তোমার মতিটি যেমন হবে, গতিটিও হবে তেমনি। সাধু রোজ গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান করেন, পাগলিও রোজ তাঁর কাছে এসে হাসতে হাসতে ঐ একই কথা শুনিয়ে যায়। সাধু জানতেন না, পাগলি জাতিস্মর। তিনি তাকে সাধারণ একটা পাগলি বলেই ধরে নিলেন আর তার কথাটাকে পাগলের প্রলাপ মনে করে তার প্রতি কোনো গুরুত্ব দিলেন না।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর হঠাৎ সাধুর এমন ব্যারাম হল যে তাঁর আর বাঁচবার কোনো আশা রইল না। সাধুর আস্তানার পাশে একঘর চামার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকত। চামার সাধুকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত আর কীভাবে তাঁর একটু সেবা করতে পারে এই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। একদিন সে একজোড়া জুতো তৈরি করে এনে সাধুকে বলেছিল ঃ "সাধুবাবা, আপনার সেবা করবার সৌভাগ্য তো আমার হবে না, তবে আমি খুব যত্ন করে আপনার জন্যে এই জুতোজোড়া তৈরি করেছি. আপনি যদি অন্তত একবারও এই জুতো পায়ে দেন তাহলে আমি কৃতার্থ হব।" চামারের ভক্তি দেখে সাধু জুতো পায়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন এবং চামারকে বলেছিলেন ঘরের এক কোণে জুতোজোড়া রেখে যেতে। এমন মরনাপন্ন অবস্থায় চামারের সেই কথা সাধুর মনে পড়ে গেল আর সেই কথা চিন্তা করতে করতেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

অন্তিম সময়ে চামারের কথা মনে হওয়ায় এবার সাধুর জন্ম হল এক চামারের ঘরে, কিন্তু আগের জন্মে নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন বলে সেই পুণ্যেরফল ব্যর্থ হল না, পূর্বজন্মের কোনো কথা তিনি ভুলে যাননি। তিনি ভাবতে লাগলেন, হায় হায়, এত তপস্যা করেও শেষ সময়ে আমি সাবধান হতে পারলাম না। এখন এই চামারের ঘরে আমি নিজের ধর্ম কেমন করে রক্ষা করব। এই ভেবে চামারের ছেলে ঠিক করল এ শরীর সে রাখবে না, মাতৃস্তন্য পান না করে সে দেহত্যাগ করবে।

ছেলে মায়ের দুধ খাচ্ছে না দেখে চামারপাড়ায় হুলস্থুল পড়ে গেল। কী যে করা উচিত তাই নিয়ে নানাজনে নানারকম পরামর্শ দিতে লাগল, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হল না। তখন এক বুড়ী ছেলের মাকে বলল ঃ "তুই একবার পাগলিকে ডেকে দেখা না কেন, ও অনেকরকম ঝাড়ফুঁক জানে, ও নিশ্চয় পারবে তোর ছেলেকে ভালো করতে।" বুড়ীর কথায় পাগলিকে ডেকে আনা হল। পাগলি তো সেই ছেলেকে দেখে হেসেই অস্থির। হাসি থামলে সে ছেলের মাকে বলল ঃ "তোরা ছেলেকে আমার কোলে দিয়ে সবাই সরে যা। তোদের কোনো ভয় নেই, আমি ঝাড়ফুঁক করে দিলেই ও ভালো হয়ে যাবে, মায়ের দুধও খাবে।" মা তখন ছেলেকে পাগলির কোলে বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্জন ঘরে ছেলেকে কোলে নিয়ে পাগলি হাসতে হাসতে বলল ঃ "কিগো সাধুজী, মনে পড়ে সেই গঙ্গাতীরে তুমি যখন সাধন-ভজন করতে তখন তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম 'তপাসু ক্ষপা, অন্তমতাসু গতা'— এখন তো বেশ তপস্যা করছ, কিন্তু শেষের চিন্তাতেই তোমার গতি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে— মনে পড়ে সে কথা? দেখো ভাই, আমি সাবধান করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিলেও তুমি কিন্তু সাবধান হওনি। মরবার সময় চামারের কথা চিন্তা করে এবার তোমার চামারের ঘরে জন্ম হল। আমারও তো এইভাবে তিন জন্ম কাটল, সাধন-ভজন যা-কিছু করেছিলাম সব বৃথা নষ্ট হয়ে গেল।" পাগলি তখন নিজের তিন জন্মের সমস্ত কথা শুনিয়ে ছেলেটিকে বলল : "তোমারও দুটো জন্ম তো দেখলে, এখনো বলছি তুমি সাবধান হও। কেন মিছিমিছি জীবনটাকে নষ্ট করতে চাইছ? তুমি মায়ের দুধ খাও, তাতে কোনো দোষ হবে না। আমি তোমার মাকে বলে দেব তোমাকে দুধ খাওয়াবার আগে সে যেন তার স্তন গঙ্গাজলে ধুয়ে নেয়।"

এরপর পাগলি নানাভাবে ছেলেটিকে বোঝাতে লাগল : "শরীর যখন ধারণ করেছ তখন তুমি চাও আর না চাও, যতদিন মেয়াদ আছে ততদিন শরীর থাকবে, মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে এক মুহূর্তও এই শরীর থাকবে না, আপনা থেকেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। কর্মফলে তোমার এই শরীর পেয়েছ, কর্মফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত এর ক্ষয় হবে না। দেখো, জেলখানায় যে লোক বন্দী হয়ে আছে সে যদি জেল ভেঙে পালাতে চায়, তবে রাজা তার কয়েদের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। রাজা বললেন, আরে, এ লোকটা তো ভয়ানক বদমায়েশ, জেল ভেঙে পালাতে চাইছে, তিন বছরের বদলে একে দশ বছর জেলে পুরে রাখো। তিনি যে দুনিয়ার রাজা, তাঁর রাজত্ব ছেড়ে পালাবেই বা কোথায়? তোমার এই শরীরটাই হল জেলখানা। এই জেলখানাকে ভাঙতে চাইলে, শরীর নষ্ট করতে চাইলে তোমার দুর্গতি আরও বেড়ে যাবে। আবার দেখো, যে কয়েদী জেলখানায় ভালোভাবে থাকে আর রাজার হুকুম ঠিকমতো মেনে চলে, রাজা খুশি হয়ে তার শাস্তির মেয়াদ কমিয়েও দেন। তাই বলছি সাধুভাই, ঈশ্বরের বিধানে এখন তুমি শরীররূপী জেলখানায় বন্দী হয়েছ, একে তুমি নষ্ট কোরো না। জীবনের ভোগ শেষ করো, ভোগ শেষ হয়ে গেলেই তোমার শরীর আর থাকবে না। তবে আমার এই কথাটা সর্বদা মনে রেখো যে—

ভক্তি বীজ বদ্‌লে নহী, জো যুগ জায় অনন্ত।
উঁচ্ নীচ্ ঘরমে উপ্‌জে হোয় সন্ত কে সন্ত।।

—ভক্তিবীজ একবার যদি উৎপন্ন হয় তাহলে তা কখনো নষ্ট হয় না। ভক্ত অনুসারে যে ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে সন্ত অর্থাৎ ভক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করবে।"

চামারের ছেলে তখন পাগলিকে বলল : "মৃত্যুর সময় আমি সাবধান হতে পারিনি, তাই এবার আমাকে চামারের ঘরে জন্ম নিতে হল। নীচ কুলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্মালেও আমি কোনো হীন কাজ করব না। আমি বুঝতে পেরেছি জোর করে শরীর নষ্ট করা অধর্ম, তা আমি করব না। তুমি এখন যাও, তোমার কথামতো এখন .থকে আমি মায়ের দুধ খাব।" পাগলি চলে গেল, চামারের ছেলেও সেই থেকে মায়ের দুধ খেতে লাগল। চামারের ঘরের এই ছেলেই একদিন সাধক শিরোমণি সন্ত রবিদাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

☆ ☆ ☆

মৃত্যুকালীন ভাবনা বা চিন্তাই মানুষের পরবর্তী জীবন ও পারলৌকিক গতির নিয়ামক হয়ে থাকে। গীতায় শ্রীভগবান সেকথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।

—হে কৌন্তেয়, মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করে মানুষ দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাবে তন্ময় হয়ে থাকার দরুণ মানুষ ঠিক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

কখন যে কার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে তার যখন কোনো স্থিরতা নেই, তখন সর্বদা সৎচিন্তা সৎভাবনা নিয়ে থাকাই হল মনুষ্যজীবনের সর্বপ্রধান কর্তব্য। জপ-তপস্যা সবই বৃথা হয়ে যায় যদি শেষ সময়ে ভগবানের চিন্তা না ফুটে ওঠে।

মায়ার ফাঁদ

ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় বিশাল রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য, সবকিছু ত্যাগ করে তিনি বনে চলে গেলেন তপস্যা করতে। একদিন এক সরোবরের তীরে তিনি চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন এমন সময় এক পূর্ণ গর্ভবতী হরিণী সেই সরোবরে জল খেতে এল। ঠিক তখনই অনতিদূরে এক বাঘের গর্জনে সারা বন যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। হঠাৎ সেই ভয়ংকর শব্দে ভয় পেয়ে তখনই হরিণীর প্রসব হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সরোবরের তীরে সে প্রাণত্যাগ করল। ভরত রাজা চোখ খুলে সেই দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারলেন না, সদ্যোজাত মাতৃহারা হরিণ শিশুটির প্রতি দয়ায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি ভাবলেন, এই হরিণশিশু যদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে এইভাবে পরে থাকে তাহলে এখুনি সে মরে যাবে। তার এই অসহায় অবস্থা দেখেও যদি তাকে এখানে ফেলে রেখে যাই তাহলে তা আমার পক্ষে অধর্মের কাজ হবে। এই ভেবে তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিজের কুটীরে নিয়ে এলেন।

হরিণ শিশুটিকে কুটীরে আনবার পর ভরত রাজা আগে যেমন জপ-তপ করতেন তেমনিই করতে লাগলেন, কিন্তু সব সময় তাঁর মন পড়ে রইল ঐ হরিণ শিশুটির দিকে। তাকে তিনি নিজের হাতে দুধ খাওয়ান, শোবার সময় নিজের কোলের কাছটিতে নিয়ে ঘুমোন, দিনে রাতে কোনো সময়েই তিনি তাকে কাছছাড়া করতে চান না। কিন্তু যখনই তিনি ধ্যান করতে বসে চোখ বোঁজেন, অমনি তাঁর মনে ভয় ঢোকে ঐ বুঝি কোনো জন্তু-জানোয়ার এসে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলল। দিনরাত সেই হরিণের চিন্তাই তখন তাঁর সাধনভজনকে অধিকার করে বসল আর এইভাবে সেই হরিণ-শিশুর মায়ায় তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। এমন সময় তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আমি মরে গেলে এ যে নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে, কে-ই বা একে খেতে দেবে, কে-ই বা অন্য জন্তুর হাত থেকে একে রক্ষা করবে। হরিণ নিয়ে এইসব চিন্তা করতে করতেই ভরত রাজা প্রাণত্যাগ করলেন।

অন্তিম সময়ে হরিণের কথা ভাবছিলেন বলে পরের জন্মে ভরত রাজাকে হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। কিন্তু হরিণ হয়ে জন্ম নিলেও আগের জন্মের তপস্যার পূণ্যফলে তিনি জাতিস্মর হলেন। তাঁর মনে পড়ল আগের জন্মের কথা। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, বিশাল রাজত্ব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলাম তপস্যা করব বলে। মায়ার ফাঁদে পড়ে আজ আমার এ কী অধোগতি হল! দয়া হল মানুষের এক পরম ধর্ম, সর্বজীবে দয়া না করাটাই হল অধর্ম। আমি তো দয়ার বশবর্তী হয়েই হরিণ শিশুটিকে রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু মায়া রাক্ষসী যে দয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে আমাকে এমন বিপাকে ফেলবে তা তো আমি বুঝতে পারিনি। এমন কৌশলে সে আমাকে গ্রাস করল যে আমি তাকে চিনতেই পারলাম না! এখন আর অনুশোচনা করে কী হবে? ভবিষ্যতে আমার যাতে মায়ার ফাঁদে পড়তে না হয় তাঁর জন্যে এখন থেকেই সাবধান হই।

পরবর্তী জন্মে ভরত রাজা ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়েছিলেন এবং সাধনার বলে সিদ্ধিলাভ করে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন।

☆ ☆ ☆

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়ার কাজই হল ভগবানের পথ থেকে জীবকে ভুলিয়ে রাখা। পরাত্মা হলেন বিশ্বজননী, জীব হল তার সন্তান আর অবিদ্যারূপিনী মায়া তাঁর দাসী। এই দাসী নানারকম প্রলোভনের দ্বারা মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, মায়ের কাছে সন্তানকে সহজে যেতে দেয় না। ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং ইন্দ্রিয়সেবার নানারকম উপকরণ যুগিয়ে মায়া মানুষকে নিজের বশীভূত করে রাখে। শুধু তাই নয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে কতরকমের ছলচাতুরী যে তার জানা আছে তারও ইয়ত্তা করা যায় না। মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করবার অসীম ক্ষমতা রয়েছে তার—যেমন এই গল্পটিতে দেখা যায় দয়ার ছদ্মবেশে মায়া কেমন করে ভরত রাজাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দয়া পরম ধর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু দয়ার সঙ্গে 'আমি' 'আমার', এই অহংবোধকে মিশিয়ে ফেলে আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই অহংবোধটি ত্যাগ করতে পারলে মায়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

হিসেবী সেপাই

এক সেপাই দশ টাকা মাইনে পেত। তার এক বন্ধু একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ভাই তুমি তো মোটে দশ টাকা মাইনে পাও। এখানে তোমার খাওয়া-পরার খরচ আছে, দেশে তোমার পরিবার-পরিজন রয়েছে, তাদের জন্যেও বাড়িতে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়, এই ক'টা টাকায় তোমার চলে কী করে?" সেপাই বলল ঃ "তোমার হিসেবটা কেমন শুনি।" সেপাই বলল ঃ "দেখো ভাই, আমি এক পয়সার কাঠে এই বারো বছর ধরে রান্না করছি।" বন্ধু অবাক হয়ে বলল ঃ "এ তুমি কী অসম্ভব কথা বলছ?" সেপাই বলল ঃ "বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে শোনো। বুঝেশুনে চলতে পারলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমি রোজ এক পয়সার কাঠ কিনে তাই দিয়ে রান্না করি। রান্না শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আগুন নিবিয়ে দিই। ঐ পোড়া কাঠ থেকে যে কাঠকয়লা পাই তা স্যাকরার দোকানে বিক্রি করি। স্যাকরা এক পয়সা দিয়ে তা কিনে নেয়। ফের ঐ এক পয়সায় কাঠ কিনে রান্না করি, আবার কাঠকয়লার দরুণ স্যাকরার কাছ থেকে এক পয়সা পাই। এইভাবে বারো বছর ধরে রান্না করছি, এখনো কাঠ কিনবার জন্যে আমার কাছে এক পয়সা মজুদ রয়েছে।" সেপাইয়ের বুদ্ধি দেখে তাঁর বন্ধু অবাক হয়ে গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ ইহজীবনের কারবার নিষ্পন্ন করে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলির সদ্ব্যবহার কেমন করে করতে হয় তা আমাদের জানা নেই। ফলে অসংযত ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্যে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। মহাজনেরা তাই ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলে থাকেন। এই গল্পে সেপাই রান্না শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের আগুন নিবিয়ে দেয়। তা না হলে সেই কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তার থেকে সে আর কাঠকয়লা পেত না। তেমনিভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে দিয়ে শরীর ধারণের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করিয়ে তাদের বিশ্রাম দিতে হয়, ইন্দ্রিয়ের আগুনকে নিবিয়ে দিতে হয়। তাতে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্রাম না দিলে সেই ইন্দ্রিয়ের আগুনে আমাদের সব সদ্‌বৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, ভগবানকে লাভ করা আমাদের ভাগ্যে আর ঘটে উঠবে না। ইন্ধন অর্থাৎ কাঠ বা কয়লা যেমন সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, বুঝে খরচ করতে হয় আগুন জ্বালিয়ে রাখতে, তেমনি ইন্দ্রিয়কেও অযথা তাদের শক্তি অপব্যয় করে নষ্ট করতে নেই, বুঝেশুনে ব্যবহার করতে হয়, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। তাহলে জীবন সুখের হয়, জীবনে কোনো উদ্‌বেগ থাকে না।

যুক্তিতে মুক্তি

একটি লোকের জীবনে একসঙ্গে তিনটি দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছিল। সে অত্যন্ত গরীব, দ্বিতীয়ত সে অন্ধ আর তৃতীয় দুর্ভাগ্য হল সে অল্পায়ু। এই তিন দুর্ভাগ্যকে কাটিয়ে উঠবার জন্যে সে ভগবানের উপাসনায় মন-প্রাণ সঁপে দিল। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান একদিন তাকে দেখা দিয়ে বললেন ঃ "তোমাকে আমি একটি বর দিচ্ছি, সেই বরে তোমার যা ইচ্ছে আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও।" লোকটি তো মহা মুশকিলে পড়ে গেল। ভগবান মোটে একটা বর দিতে চান, তার যে রয়েছে তিনটে দোষ—দারিদ্র, অন্ধত্ব আর অল্প আয়ু। এর কোন্‌টা কাটাবার জন্যে ভগবানের কাছে সে বর চাইবে? লোকটি ছিল খুব সেয়ানা, সে হঠাৎ কিছু চেয়ে বসল না। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে নিয়ে সে ভগবানকে বলল ঃ "হে ভগবান, আপনি আমাকে এই বর দিন যেন আমি দেখতে পাই যে আমার নাতি আমার সামনে বসে সোনার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থালায় ভাত খাচ্ছে।" ভগবান বললেন ঃ "তথাস্তু।" এইভাবে একটিমাত্র বরে লোকটি ভগবানের কাছ থেকে তিনটি বর পেয়ে গেল। দীর্ঘায়ু না হলে নাতিকে দেখা সম্ভব নয়, দারিদ্র না ঘুচলে সোনার থালা জুটবে না আর অন্ধত্ব না কাটলে নাতি যে ভাত খাচ্ছে সেটাই বা সে দেখবে কেমন করে? লোকটির যে তিনটি দোষ ছিল—দারিদ্র, অন্ধত্ব আর অল্প আয়ু, সেই তিনটি দোষই কেটে গেল তার বুদ্ধির দৌলতে।

☆ ☆ ☆

কী সাংসারিক কাজকর্মে, কী পারমার্থিক বিষয়ে নির্বুদ্ধিতার দ্বারা সাফল্য লাভ করা যায় না। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন ঃ "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"—কর্মের কৌশলই হল যোগ। পরামার্থ পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা যদি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে কর্মের এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে এই জীবনেই তাঁদের ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হতে পারে। মোট কথা, কর্মের কৌশল জানা চাই অর্থাৎ বুদ্ধি চাই, যুক্তি চাই। যুক্তিতেই মুক্তি মেলে। তাই গীতার সার উপদেশ ঃ "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ" বুদ্ধির শরণ নাও, বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধিযোগই সব যোগের সার।

সাপ ও গরুড়

ভগবান বিষ্ণু একদিন গরুড়ের পিঠে চড়ে মহাদেবকে দর্শন করতে কৈলাস পর্বতে এসেছেন। মহাদেবের অঙ্গ ঘিরে যেসব সাপ ছিল তারা গুরুড়কে দেখে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। তাই দেখে গরুড় হেসে বলল ঃ "স্থানং প্রধানং, ন চ বলং প্রধানম্। দেখো বাছারা, তোমাদের ক্ষমতার দৌড় যে কত তা আমার জানা আছে। এখন তোমরা মহাদেবের আশ্রয়ে রয়েছ, স্থান-মাহাত্ম্যের জন্যে এখন আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারব না। কিন্তু একবার ঐ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসো দেখি, আমার প্রতাপ যে কতখানি তা তখন বুঝিয়ে দেব।"

কোনো দুর্বল লোক যখন কোনো প্রবল লোকের আশ্রয় নেয় তখন তার সাহস বেড়ে যায়, শত্রুকেও সে তখন ভয় পায় না। তেমনি মানুষ যদি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আশ্রয় নিতে পারে, তাহলে সে নির্ভয় হয়ে যায়, মায়া তার উপরে কোনো দৌরাত্ম্য করতে পারে না। মায়াকে তো জোর করে দূর করা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাবে না, তাকে জব্দ করবার একমাত্র উপায়ই হল ভগবানে শরণাগতি। তখন মায়া আর তাকে ছুঁতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না।

সেরা পছন্দ

এক রাজা তাঁর রাজধানীতে একটা বাজার বসিয়ে তাতে নানারকম দামী জিনিস এনে রেখে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে যার পছন্দ সে যেন হাত দিয়ে সেই জিনিসটাকে শুধু স্পর্শ করে, তাহলেই সে সেই জিনিসটা নিয়ে যেতে পারবে, তার জন্যে তাকে কোনো দাম দিতে হবে না। রাজার ঘোষণা শুনে দলে দলে লোক এসে তাদের পছন্দমতো এক একটি জিনিস বিনামূল্যে নিয়ে যেতে লাগল। একটি লোক ছিল বেশ সেয়ানা। সে ভাবল, একটি জিনিস স্পর্শ করলে ঐ একটি জিনিস নিয়েই তো আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি যেদি কোনো জিনিস স্পর্শ না করে শুধু রাজাকেই স্পর্শ করি তাহলে তো তাঁকেই আমি পেয়ে যাব। লোকটি তখন সারা বাজার ঘুরে বেড়াল, কিন্তু একটিও জিনিস স্পর্শ করল না। রাজা বসেছিলেন বাজার থেকে অনেকটা দূরে। ঘুরতে ঘুরতে লোকটি রাজার কাছে এসে তাঁকে স্পর্শ করে বলল ঃ "রাজামশাই, আপনার বাজারের কোনো জিনিস আমার পছন্দ হল না, তাই আমি আপনাকেই চাই। আপনাকে আমি স্পর্শ করছি, এখন আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আপনি আমার হয়ে যান।" রাজা আর কী করেন, নিজের প্রতিজ্ঞা তো তিনি ঠেলতে পারেন না। তাই তাঁকে লোকটির কাছে ধরা দিতে হল।

☆ ☆ ☆

পরমাত্মারূপী রাজা সংসাররূপী এই বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কতরকম জিনিসই না এই বাজারে সাজানো রয়েছে। মান, যশ, পুত্র-কলত্র, কী না আছে এখানে। যার যেমন খুশী সে তাই নিয়ে মেতে রয়েছে। কিন্তু যে চালাক তার এসবে মন নেই, সে রাজাকে ছাড়া আর কিছু চায় না। তাই সে রাজাকেই ধরে রাখতে চায় আর ভক্তবৎসল রাজাও তখন ভক্তকে ধরা না দিয়ে থাকতে পারেন না। স্বয়ং রাজা যার আপন হয়ে যান, তার কি কোনো অভাব থাকতে পারে? তাই আপন করো রাজাকে, বাজারকে নয়, তাঁর রচিত এই সংসারকে নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সার কথা

এক সাধুর মনে হল মানুষ যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় নানারকম কান্ড করে বসে তা বন্ধ করা দরকার। কিন্তু সেকথা বললেই তো মানুষ শুনবে না। কীভাবে মানুষকে তা বোঝানো যায় তা ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাল। তিনি একখানা কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে দুটি কথা লিখলেন, তারপর কাগজখানা ভাঁজ করে, কাপড় দিয়ে বেশ করে মুড়ে তা সেলাই করে দিলেন। এবার সেই কাপড়ের উপর এক হাজার টাকা দাম লিখে তিনি বাজারে নিয়ে গেলেন বিক্রি করবেন বলে, কিন্তু কেউই তাঁর সেই মোড়কটি কিনল না। একে তো হাজার টাকা দাম, তার উপর মোড়কের ভিতর কী আছে তা-ও কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তাই অত দাম দিয়ে তা নেবেই বা কে? এমন সময় এক ধনী ব্যবসাদার নিছক কৌতূহলবশেই সাধুর কাছ থেকে মোড়কটা কিনে নিল, সাধুও টাকা নিয়ে তাঁর নিজের কাজে চলে গেলেন। ব্যবসাদার ভেবেছিল হয়তো কোনো দামী জিনিস তার কপালে জুটে যাবে, কিন্তু মোড়ক খুলে তো তার চক্ষুস্থির। সে দেখল ভিতরে রয়েছে শুধুই একখানা কাগজ আর তাতে লেখা রয়েছে শুধু দুটি কথা 'বিচার সার'। নিজের এই বোকামির জন্য নিজের উপরেই তার রাগ হতে লাগল, কিন্তু এত দাম দিয়ে কিনেছে আর সাধুর কাছ থেকে পেয়েছে বলে কাগজখানা ফেলে দিতেও তার মন চাইল না। সে নিজের শোবার ঘরের দেয়ালে কাগজখানাকে খুব যত্ন করে টাঙিয়ে রাখল।

কিছুদিন পরে ব্যবসাদার আরও ফলাও করে ব্যবসা করবে বলে স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে ঘরে রেখে বিদেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে সে দিনরাত টাকা রোজগারের চিন্তাতেই মশগুল হয়ে রইল, ঘর-সংসারের কথা তার মনেই রইল না। এইভাবে বহু বছর কেটে যাবার পর সে যখন দেখল যে তার অঢেল টাকা জমেছে, আর টাকা রোজগার না করলেও হেসে খেলে তার দিন কেটে যাবে, তখন তার বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল। সে ঠিক করল বাড়িতে আগে কোনো খবর দেবে না, কিছুই না জানিয়ে হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে বউ আর ছেলেকে সে অবাক করে দেবে।

ব্যবসাদার যখন তার বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। সে চুপিচুপি তার শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় সে দেখতে পেল যে তারই বিছানায় তার বউ এক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জোয়ান লোকের সঙ্গে শুয়ে রয়েছে। দেখেই তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কী, আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী! এই ভেবে সে একটা খড়্গ নিয়ে দুজনকেই কাটতে যাবে এমন সময় দেয়ালে ঝোলানো সাধুর সেই 'বিচার সার' কথাটির দিকে তার নজর পড়ল। সে তখন হাতের খড়্গ নামিয়ে রেখে চিন্তা করতে লাগল, আমি যে এদের খুন করতে যাচ্ছি সেটা কি ঠিক হচ্ছে? প্রাণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যখন আমার নেই, তখন প্রাণ নষ্ট করবার অধিকারই কি আমার আছে? বরং এদের কী বলবার আছে তাই না হয় একবার শোনা যাক।

ব্যবসাদার এইসব ভাবছে এমন সময় দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। স্বামীকে দেখে স্ত্রী তাকে প্রণাম করে ছেলেকে বলল ঃ "একে প্রণাম করো, ইনি তোমার বাবা।" এতক্ষণে ব্যবসাদার বুঝতে পারল তার ছেলেই মায়ের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ছিল, বাইরের কোনো লোক নয়। সে তখন ভাবতে লাগল, সাধুর এই মহাবাক্য 'বিচার সার' যে কী অমূল্য সম্পদ তা এতদিনে আমি উপলব্ধি করলাম। এক হাজার টাকা দিয়ে আমি যখন সাধুর কাছ থেকে এই লেখা কিনেছিলাম, তখন সাধু আমাকে ঠকিয়েছে ভেবে কত বিরক্তই না হয়েছি; কিন্তু এখন বুঝেছি এ মহাবাক্যের তুলনা নেই। আজ যদি আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে খুন করতাম তাহলে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও কি তাদের প্রাণ ফিরে পেতাম? 'বিচার সার' মহাবাক্যই আজ আমাকে সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছে। বিনা বিচারে ঝোঁকের মাথায় কাজ করা যে কী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, আজ আমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

☆ ☆ ☆

কোনো কাজই ঝোঁকের মাথায়, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে করা উচিত নয়। বিচারহীনতাই যত বিপদ ডেকে আনে। কাম-ক্রোধের তাড়নায় মানুষ বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে, রাগের চোটে কখনো খুনও করে বসে। তাই বলা হয় ঃ "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ অবিবেকঃ পরম্ আপদাং পদম্"— সহসা কোনো কাজ কোরো না কারণ অবিবেক অর্থাৎ অবিবেচনাই সব আপদের বা বিপদের মূল। একটু থেমে, ভেবে তবে সব কাজ করা উচিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অষ্টাবক্র ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

অষ্টাবক্র ঋষি জন্মাবধি বিকলাঙ্গ, তাঁর দেহের আট জায়গা বাঁকা, তাই তাঁর মনে বড়ো দুঃখ। তিনি ভাবলেন, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই একবার জিজ্ঞাসা করব কেন তিনি আমাকে এমন বিকলাঙ্গ করে গড়েছেন। এই ভেবে অষ্টাবক্র এক সদ্‌গুরুর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "গুরুদেব, এই সৃষ্টি কোন্ দেবতা রচনা করেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" গুরু তখন তাঁকে ব্রহ্মার মন্ত্র দিলেন আর অষ্টাবক্র তন্ময় হয়ে সেই মন্ত্র জপ করে দিনরাত কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। তাঁর তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। অষ্টাবক্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনি কে? কী আপনার কাজ?" ব্রহ্মা বললেন ঃ "আমি সৃষ্টিকর্তা বহ্মা। এই বিশ্বসংসারে যা-কিছু দেখছ, সব আমি সৃষ্টি করেছি।" ব্রহ্মার কথা শুনে অষ্টাবক্র তাঁকে বললেন ঃ "তুমি কেমন সৃষ্টিকর্তা? তুমি আমার মতো আটটা জায়গায় বাঁকা এইরকম জীব সৃষ্টি করো?" ব্রহ্মা বললেন ঃ "শোনো অষ্টাবক্র, আমি কী করব বলো, তোমার প্রারব্ধই যে এইরকম। তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল অনুসারেই তুমি এইরকম বিকলাঙ্গ হয়েছ।" অষ্টাবক্র বললেন ঃ "দেখো ব্রহ্মা, আমার প্রারব্ধের দরুণই যখন আমার দেহের এই অবস্থা, তখন তুমি আর নিজেকে সৃষ্টিকর্তা বলে বৃথা অহংকার করছ কেন? যাও যাও, তোমাকে আমার আর কোনো দরকার নেই।" ব্রহ্মা লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

অষ্টাবক্র আবার গুরুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "গুরুদেব, এই জগতের পালনকর্তা কে, আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করব।" গুরু তাঁকে বললেন ঃ "বৎস, বিষ্ণু হলেন এই বিশ্বের পালনকর্তা।" অষ্টাবক্র তখন গুরুর কাছে বিষ্ণুমন্ত্র নিয়ে আবার উগ্র তপস্যায় রত হলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে দর্শন দিলেন। অষ্টাবক্র তাঁকে আগের মতো পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বিষ্ণু বললেন ঃ "এই বিরাট বিশ্বের আমি হলাম পালনকর্তা। এখানে যত প্রাণী রয়েছে, আমিই সবাইকে আহার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি।" অষ্টাবক্র বললেন ঃ "আপনি সব প্রাণীকে আহার যুগিয়ে থাকেন বলেছেন, তবে আমি কেন পেট ভরে খেতে পাইনে? মাঝে মাঝে কেন আমাকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়?" বিষ্ণু বললেন ঃ "তা আমি কী করব বলো? তোমার যেমন প্রারব্ধ তেমনি আহারই তো মিলবে। তার চেয়ে বেশি আমি কোথা থেকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেব।" বিষ্ণুর এই কথা শুনে অষ্টাবক্র তাঁকে বললেন ঃ "আমার ভাগ্যে যা মাপা আছে তার চেয়ে বেশি দেবার সামর্থ্য যখন তোমার নেই, তখন তুমিই হলে পালনকর্তা, সমস্ত প্রাণীর আহার যোগাও তুমি, এসব বলে বৃথা গর্বে অমন আস্ফালন করছ কেন? তুমি এখন যেতে পারো, তোমাকে দিয়ে আর আমার কোনো কাজ নেই।"

বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন। অষ্টাবক্র আবার গুরুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "গুরুদেব, বিশ্ব-সংসারের সংহারকর্তা কে?" গুরু বললেন ঃ "বৎস, বিশ্বের সংহারকর্তা হলেন মহেশ্বর।" তখন অষ্টাবক্র বললেন ঃ "তাহলে আমাকে মহেশ্বরের মন্ত্র দিন, আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।" গুরু তখন অষ্টাবক্রকে মহেশ্বরের মন্ত্র দিলেন। আবার অষ্টাবক্র তদ্‌গতচিত্ত হয়ে তপস্যা করতে বসলেন এবং তাঁর দীর্ঘ তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে মহেশ্বর তাঁকে দর্শন দিলেন। অষ্টাবক্র মহেশ্বরকেও প্রশ্ন করলেন ঃ "কে আপনি? কী আপনার কাজ?" মহেশ্বর বললেন ঃ "আমি এই বিশ্ব-সংসারের সংহারকর্তা মহাকাল।" অষ্টাবক্র বললেন ঃ "যাক্, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। আপনি যখন সংহারকর্তা মহাকাল তখন এখনই আমাকে সংহার করুন। এই বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে, এ দেহ আমি আর বইতে পারছিনে।" মহেশ্বর বললেন ঃ "এখন তো তোমাকে আমি সংহার করতে পারব না। তোমার প্রারব্ধ অনুসারে এখনো দীর্ঘকাল তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।" অষ্টাবক্র বললেন ঃ "আমার প্রারব্ধই যখন আমার সকল বিষয়ের একমাত্র কর্তা, তবে আপনি কেন নিজেকে সংহারকর্তা বলে মিথ্যে জাহির করছেন? আর আপনাকে আমার কোনো দরকার নেই, আপনি চলে যেতে পারেন।"

এই কথা শুনে মহেশ্বর অন্তর্ধান করলেন। অষ্টাবক্র তখন গুরুর কাছে এসে বললেন ঃ "গুরুদেব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতারই আমি দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তাঁদের কাউকে দিয়েই আমার অভীষ্ট পূরণ হল না। তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন আমার প্রারব্ধই আমার কর্তা। আমি জন্ম-জন্মান্তরে যেসব কাজ করেছি তারই ফলস্বরূপ আমার প্রারব্ধ ও ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাদি সবকিছু নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঐ প্রারব্ধকে উল্‌টে দেবার বা খন্ডন করবার ক্ষমতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কারুরই নেই। তাহলে তো দেখছি আমিই আমার কর্তা। গুরুদেব, কোন্ সাধনায় আমি 'আমার' দর্শন পাব, 'আমি' কে তা জানতে পারব, এবার আপনি আমাকে সেই সাধনের উপদেশ দিন।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরু দেখলেন বহুকাল ধরে অষ্টাবক্র কঠোর তপস্যা করেছেন আর তার ফলে তাঁর চিত্ত নির্মল পবিত্র হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে এবার ভিতরের দিকে তাঁর দৃষ্টি ফিরেছে। এবার তিনি আত্ম-উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাই দেখে তখন অষ্টাবক্রের প্রার্থনা অনুসারে তাঁর আত্মদর্শন বা আত্মোপলব্ধির জন্যে গুরু তাঁকে ব্রহ্মমন্ত্র দান করলেন এবং অষ্টাবক্রও একাগ্রচিত্ত হয়ে কঠোর তপস্যা করার ফলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করলেন, জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, এই চরম ও পরম তত্ত্বের উপলব্ধিতে তিনি কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

☆ ☆ ☆

জন্ম-জন্মার্জিত শুভাশুভ কর্ম অনুসারে মানুষের অদৃষ্ট রচিত হয়। অর্থাৎ প্রারব্ধই হল বর্তমান জন্মের নিয়ামক। তাহলে পুরুষাকারের কি কোনো সার্থকতা নেই? প্রারব্ধ ও পুরুষাকারের এই দ্বন্দ্ব আবহমান কাল থেকে মানুষের বুদ্ধিকে আন্দোলিত করে এসেছে। এই দ্বন্দ্বের কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা করতে না পেরে মানুষ কৃতকর্মের দোহাই দিয়ে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। সে বুঝতে পারে না যে এই কর্মজাল রচনার উদ্দেশ্য হল আমাদের সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ঠেকে শিখিয়ে শেষে ঘরে ফেরানো বা আত্মোপলব্ধিতে এনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কর্মজাল আমরা নিজেরাই রচনা করেছি, আবার ইচ্ছে করলে নিজেরাই আমরা এই জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি।

আত্মসাক্ষাৎকার বা আত্মোপলব্ধি যা, ভগবৎ উপলব্ধিও তাই। সবই হল সেই একের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই গল্পে সমস্ত দেবতার কাছে ধরনা দিয়ে অষ্টাবক্র শেষকালে ফিরলেন নিজের দিকে, দৃষ্টি দিলেন নিজের অন্তরে। বহু সাধনার দ্বারা তাঁর চিত্তক্ষেত্র নির্মল হয়েছে, তাই তখন তাঁর চিত্তে জেগেছে আত্মোপলব্ধির স্পৃহা। কোনো সাধনাই তাই নিষ্ফল নয়, চিত্তশুদ্ধির জন্যে তা সবকিছুই একান্ত প্রয়োজন। অনেক ঘুরে ফিরে, 'বহূনাং জন্মনাং অন্তে' মানুষের জ্ঞান ফুটলে সে নিজের আত্মাকে খোঁজে, 'জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে'।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শুভাশুভ কর্মই যখন শুভাশুভ ফল দান করে, তখন ঈশ্বরকে ডাকবার দরকার কী? এর সহজ উত্তর হল এই যে ঈশ্বরকে ডাকাও তো শুভকর্ম, এই শুভকর্মের দ্বারা শুভ ফলই মিলবে। তবে ঈশ্বরকে ডাকব না কেন?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যবের বীজ

দুজন লোক দীক্ষা নেবে বলে এক সাধুর কাছে উপস্থিত হল। সাধু বললেন ঃ "বেশ, আমি তোমাদের দীক্ষা দিতে পারি, তবে আমি তো এখন দেশভ্রমণে বেরুচ্ছি, ফিরে এসে তখন দেখা যাবে। তোমরা এখন এক কাজ করো। তোমাদের আমি একটা করে যবের বীজ দিচ্ছি, তোমরা খুব যত্ন করে রেখো যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। আমি ফিরে এলে পর ঐ বীজ আমাকে ফেরত দিয়ো।" এই বলে সাধু দুজনকেই একটা করে যবের দানা দিলেন। লোক দুটি তাই নিয়ে চলে গেল।

বাড়ি এসে প্রথম লোকটি ভাবল, সাধুবাবা ফিরে এলে তাঁকে তো বীজ ফেরত দিতে হবে, তিনি বলেও দিয়েছেন বীজ যেন নষ্ট না হয়। এই ভেবে সে যবের বীজকে কাপড় দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে একটা কৌটোর মধ্যে ভরে রাখল। বাড়ি ফিরে দ্বিতীয় লোকটিরও সেই একই চিন্তা, কীভাবে বীজকে তাজা রাখা যায়। সে ভাবল, সাধু তো দেশভ্রমণে গিয়েছেন, কবে যে ফিরবেন তার কোনো স্থিরতা নেই। যদি তাঁর ফিরতে দেরি হয় তাহলে বীজটাকে এমনি ফেলে রাখলে ওটা তো নষ্ট হয়ে যাবে। লোকটি তখন খানিকটা জমিতে সার দিয়ে যবের দানা তাতে পুঁতে দিল, তারপর প্রতিদিন সেই জমিতে প্রয়োজন মত জল ঢেলে তার পরিচর্যায় লেগে গেল। এইভাবে এক দানা যব থেকে যখন এক অঞ্জলি যব হল তখন সে বড়ো জমিতে সেই সব লাগিয়ে দিল। এবার সেই এক অঞ্জলি যব থেকে সে পেল এক ধামা যব। তখন সে আরও বড়ো জমিতে সেই যব লাগিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করে বস্তা বস্তা যব ফলিয়ে তুলল।

লোকটি ছিল গরীব। তার ছোটো কুঁড়ে ঘরে এত যব সে কোথায় রাখবে? সে তখন বীজের জন্যে কিছু রেখে দিয়ে বাকি সমস্ত যব বিক্রি করে দিল। এইভাবে প্রতি বছর তার যবের ফলন বেড়ে চলল আর যব বিক্রির দরুণ অজস্র টাকা তার হাতে জমে গেল। তখন তার আর কুঁড়েঘর রইল না, সেই টাকায় পাকা বাড়ি বানিয়ে সে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

বহুদিন পর সাধু ফিরে এসে লোক দুটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তারা এলে পর তাদের কাছে তাঁর দেওয়া সেই যবের বীজ ফেরত চাইলেন। প্রথম লোকটি কৌটো থেকে কাপড়ে মোড়া বীজ বের করে সাধুর হাতে দিল। সাধু দেখলেন অনেকদিন ধরে কৌটোয় বন্ধ থাকার দরুণ বীজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটি এক বস্তা যব সাধুর কাছে ঢেলে দিয়ে বলল ঃ "আপনার সেই বীজ থেকে আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তা বস্তা যব পেয়েছি। আপনার আশীর্বাদে আজ আমার কোনো অভাব নেই।" এই বলে কেমন করে সেই একটিমাত্র বীজ থেকে এত যব উৎপন্ন হল, কেমন করে তা বিক্রি করে সে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হল, সমস্ত সে সাধুর কাছে বলতে লাগল। সব শুনে সাধু খুব খুশি হয়ে তাকে বললেন ঃ "তুমিই আমার শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত পাত্র, তোমাকে বীজ মন্ত্র দিলে তা নিষ্ফল হবে না।" এই বলে তিনি প্রথম লোকটিকে বললেন ঃ "দেখো, একই বীজ আমি তোমাদের দুজনকেই দিয়েছি, কিন্তু তুমি সেই বীজের কোনো যত্ন নিলে না, ফেলে রেখে তা নষ্ট করলে। আর একে দেখো, সেই বীজের কেমন যত্ন নিয়ে তার থেকে এত ফসল ঘরে তুলেছে। মন্ত্র নেবার অধিকার তোমাদের জন্মেছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্যেই আমি তোমাদের যবের বীজ দিয়েছিলাম। দেখলাম, শিষ্য হওয়ার যোগ্যতা এখনো তোমার হয়নি। এখন মন্ত্র নিয়ে তুমি কী করবে বলো? এই যবের বীজের মতো ফেলে রেখে তা নষ্ট করবে তো? দেখো বাবা, গুরুদত্ত বীজমন্ত্র হৃদয় জমিতে রোপন করতে হয়, তাতে ভক্তিবারি সিঞ্চন করতে হয়, তবেই না জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অধিকারী হয়ে মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে। দীক্ষা নিলাম, অথচ কাজ করলাম না, এতে কি কোনো লাভ আছে?"

☆ ☆ ☆

বীজ দেন গুরু, কিন্তু তা নিয়ে ফসল ফলানো শিষ্যের দায়িত্ব। গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে যে যত সাধন-ভজন, জপ-তপের পরিশ্রমে মন দেবে, সে তত অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হবে।

বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ

এক রাজা রাত্রিবেলা নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন আর একটা কুকুর এসে তাঁকে কামড়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, কুকুরের কামড়ে সমস্ত শরীর তাঁর জ্বলে যেতে লাগল। সেই যন্ত্রণার উপশমের জন্যে স্বপ্নের মধ্যেই রাজা গেলেন এক বৈদ্যের কাছে। বৈদ্য বলল ঃ "একটা পয়সা দাও, তোমাকে আমি ওষুধ দিচ্ছি, তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা সব দূর হয়ে যাবে।" রাজা তো নিঃস্ব হয়েছেন, তিনি দেখলেন তাঁর কাছে ওষুধ কিনবার মতো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটি পয়সাও নেই। এমন সময় এক সদ্‌গুরুর সঙ্গে রাজার দেখা হয়ে গেল। সদ্‌গুরু বললেন ঃ "বাবা, আমাকে পয়সা-কড়ি কিছু দিতে হবে না, আমি অমনিই ওষুধ দিয়ে তোমাকে ভালো করে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি রাজাকে ওষুধ দিলেন, রাজাও সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেলেন। ঠিক তখনই রাজার ঘুম ভেঙে গেল।

রাজা দেখলেন তার ঘরের দরজার বাইরে সেপাই পাহারা দিচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" সেপাই বলল ঃ "হুজুর, আমি তো বরাবর এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।" রাজার তখন হুঁশ হল যে তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে আমি এমন দীনহীন কাঙাল হয়ে গেলাম যে বৈদ্যকে দেবার মতো একটা পয়সাও আমার জুটল না! এবার রাজার মনে বিচার শুরু হয়ে গেল, কোন্‌টা তাহলে সত্য, আমি রাজা, না কাঙাল? এতবড়ো রাজত্ব আমাকে একটা পয়সা যোগাতে পারল না, সেপাই পাহারা দিচ্ছে, অথচ একটা কুকুরের হাত থেকে আমাকে সে বাঁচাতে পারল না! আমি এ দেশের রাজা, এইতো রানী আমার পাশেই শুয়ে রয়েছে, দরজাতে সেপাই পাহারা দিচ্ছে, এরা তো আমার কোনো কাজেই এল না দেখছি। তাহলে কোন্‌টা সত্য, আমার রাজত্ব সত্য, না স্বপ্নে যে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম, কুকুরে আমাকে কামড়াল, সেইটাই সত্য?

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে বিচার করতে করতে রাজার আত্মবোধ জন্মাল। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি রাজাও নন, কাঙালও নন, তিনি হলেন সকল অবস্থার দ্রষ্টা ও সাক্ষী, তিনিই আত্মা। জন্মান্তরে অনেক কাজ করা ছিল, তাই একটি স্বপ্নকে উপলক্ষ্য করেই রাজার মনে এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হল।

☆ ☆ ☆

উপনিষদ বা বেদান্ত মানুষের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার বিচার করতে বলেছেন বার বার। যার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, সে এইরকম বিচার করতে করতেই উপলব্ধি করে যে জাগ্রত অবস্থাটি একমাত্র বাস্তব ব্যাপার নয়, তিনটি অবস্থাই আপন আপন ক্ষেত্রে সমান বাস্তব। আবার সবগুলিই অবাস্তব, মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন একটা অবস্থা সরে গিয়ে অন্য অবস্থার উদয় হয়। আসলে মানুষ হল তিনটি অবস্থারই দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র, কোনো অবস্থার সঙ্গে তার বাস্তব কোনো সম্পর্ক বা সম্বন্ধ নেই। যখন যে অবস্থার উদয় হচ্ছে, সে শুধু তাই দেখে যাচ্ছে মাত্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান দেন কোথা থেকে?

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী বাস করে। তাদের একটিমাত্র মেয়ে। মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু পয়সার অভাবে তারা মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। এর জন্যে ব্রাহ্মণীর কাছে ব্রাহ্মণকে রোজ গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। ব্রাহ্মণ গরীব হলেও তার একটা গুণ ছিল, সে কথকতা করতে পারত। কিন্তু তাদের ছোটো গ্রাম, পয়সা খরচ করে কে আর কথকতা শুনতে আসবে? ব্রাহ্মণ উপার্জনের কোনো পথই খুঁজে পেল না। মেয়ের বিয়ে দেবার খরচ কীভাবে যোগাড় হবে, কে তাকে টাকা দেবে, এইসব চিন্তায় সে অস্থির হয়ে উঠল। শেষে ব্রাহ্মণীর গঞ্জনা আর সহ্য করতে না পেরে একদিন সে ব্রাহ্মণীকে বলল : "এখানে তো কেউ পয়সা দিয়ে আমার কথকতা শুনবে না, জঙ্গলের মধ্যে শিবঠাকুরের যে মন্দির রয়েছে আমি সেখানে গিয়ে ঠাকুরের কথকতা শোনাব। দেখি, শিবঠাকুর যদি প্রসন্ন হয়ে কিছু টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করে দেন।"

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন জঙ্গলের মধ্যে শিবমন্দিরে যায় আর সেখানে শিবঠাকুরের সামনে বসে কথকতা করে। এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল, আর তিনদিন হলেই কথকতা শেষ হবে। এমন সময় এক বৈশ্য গঙ্গাস্নান সেরে শিবের মাথায় জল ঢালবে বলে সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হল। বৈশ্য শুনতে পেল মহাদেব গণেশকে বলছেন : "দেখো গণেশ, এই যে ব্রাহ্মণ রোজ আমাকে কথা শোনাচ্ছে, পরশু তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে একটি পয়সাও পেল না।" গণেশ বললেন : "পিতা, কেউ তো এর কথকতা শোনেনি, কে একে পয়সা দেবে?' মহাদেব বললেন : "বাইরের কোনো লোক শোনেনি বটে, কিন্তু আমি তো শুনেছি, আমারই উচিত ওকে টাকা দেওয়া। যাই হোক, পরশু ওর কথকতা শেষ হচ্ছে, সেদিন ওকে পাঁচশো টাকা দিতে হবে।" গণেশ বললেন : "আপনার আদেশ শিরোধার্য, আপনি নিশ্চিত থাকুন, পরশুদিন নিশ্চয় আমি ব্রাহ্মণকে পাঁচশো টাকা দেব।"

শিব আর গণেশের কথাবার্তা শুনে বৈশ্য মনে মনে এক ফন্দি এঁটে ব্রাহ্মণকে বলল : "ঠাকুরমশাই, এতদিন ধরে এখানে তো আপনি কথকতা করছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার দরুণ আপনার একটা কানা কড়িও জোটেনি। পরশু আপনার কথকতা শেষ হবে। তাই আমি আপনার কাছে প্রস্তাব করছি যে আমি আপনাকে দুশো টাকা দেব, তার বদলে পরশু আপনি যদি কিছু পান,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেটা আমাকে দিয়ে দেবেন।" বৈশ্য খুব সেয়ানা, সে দেখল গণেশ যখন বলেছে, তখন ব্রাহ্মণ পাঁচশো টাকা পাবেই পাবে। তাই আগে ভাগে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুশো টাকায় চুক্তি করে নিলে তিনশো টাকা অমনিই তার হাতে এসে যাবে। ব্রাহ্মণও দেখল, এতদিন কথকতা করে কিছুই তো মেলেনি, বাকি তিনদিনে কিছু মিলবে কিনা তা-ও অনিশ্চিত, সুতরাং হাতে হাতে যখন দুশো টাকা পাওয়া যাচ্ছে তখন তা ছাড়ি কেন? ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল আর বৈশ্য তখনই তাকে দুশো টাকা দিয়ে দিল।

কথকতা যেদিন শেষ হবে সেদিন বৈশ্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল, পাছে ব্রাহ্মণকে একলা পেয়ে গণেশ তার হাতে গোপনে টাকা তুলে দেয়। এদিকে কথকতা শেষ হয়ে গেল, অথচ টাকার দেখা নেই। গণেশ যে টাকা দেবে ব্রাহ্মণ তার কিছুই জানে না, তাই সে বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। তাই দেখে বৈশ্য তাকে বলল ঃ "আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন ঠাকুরমশাই, আমার মনে হচ্ছে আজ নিশ্চয়ই আপনার বরাতে কিছু জুটবে।" দুজনে মন্দিরে বসে আছে, বেলাও শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু এখনো টাকার দেখা মিলল না। তখন গণেশের উপর বৈশ্যের ভীষণ রাগ হল। সে ভাবল, এতদিন জানতাম মানুষই শুধু মিছে কথা বলে, এখন দেখছি দেবতারাও কোনো অংশে কম নন, নইলে টাকা দেবে বলে এভাবে কথার খেলাপ করে? বৈশ্য আর রাগ সামলাতে পারল না, শিবমূর্তির পাশে গণেশের যে মূর্তি ছিল হঠাৎ তার পেটে সে এক লাথি মেরে বসল। যেমনি লাথি মারা, অমনি গণেশের পেটে বৈশ্যের পা আটকে গেল, শত টানাটানিতেও বৈশ্য তার পা ছাড়াতে পারল না।

এমন সময় শিব আর গণেশের কথাবার্তা আবার বৈশ্যের কানে এল। গণেশকে শিব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "গণেশ, ব্রাহ্মণকে তুমি পাঁচশো টাকা দিয়েছ তো?" গণেশ বললেন ঃ "বৈশ্যের মারফত দুশো টাকা ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে, বাকি তিনশো টাকারও ব্যবস্থা করছি। বৈশ্য যতক্ষণ আরও তিনশো টাকা ব্রাহ্মণকে না দিচ্ছে ততক্ষণ আমার পেটে ওর পা আটকে থাকবে, তার আগে ওকে আমি ছাড়ব না।" বৈশ্য আর কী করে, সে তখন গণেশকে বলল ঃ "দোহাই গণেশ ঠাকুর, এবারকার মতো আমায় মাপ করো বাবা। এখুনি আমি ব্রাহ্মণকে তিনশো টাকা দিচ্ছি, তুমি দয়া করে আমার পা ছেড়ে দাও।" বৈশ্য তখন তিনশো টাকা বের করে ব্রাহ্মণের হাতে দিল আর গণেশও বৈশ্যের আটকানো পা ছেড়ে দিয়ে তাকে মুক্তি দিলেন। পাঁচশো টাকা নগদ হাতে পেয়ে ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে তার মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে লাগল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

ভগবান দেন কোথা থেকে? একজনেরটা নিয়ে, আর একজনকে দেন, নিজের ঘর থেকে কাউকে কিছু দেন না। একজনকে ভাঙেন, আর একজনকে গড়েন, তাই শিবকে বলা হয় ভাঙ-গড় বা ভাঙর। অবশ্য ভাঙরের আভিধানিক অর্থও হল সিদ্ধিখোর যা প্রচলিত সংস্কার অনুসারে শিবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। দয়ারূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে ভগবানই আমাদের দান পরের কল্যানে নিয়োজিত করেন।

এই গল্পটির আরও কিছু তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরুষকার অবলম্বন করেছিল বলেই তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। এখানে তাই পুরুষকার প্রয়োগের যৌক্তিকতা দেখতে পাই। আরও দেখি, শিবের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করে এবং তাঁরই সামনে কথকতা করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ দৈবেরও সাহায্য নিয়েছিল। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলে মানুষের সকল অভাব যে পূর্ণ হয়ে যায়, এখানে তারই দৃষ্টান্ত দেখা গেল। প্রারব্ধের দিক থেকে দেখতে গেলে বলা চলে যে ব্রাহ্মণের কপালে অর্থপ্রাপ্তি ছিল বলেই তা সম্ভব হল। আবার বৈশ্যের করুণ পরিণতিতে এই কথাটাই বোঝানো হয়েছে যে পরকে ঠকাতে গেলে নিজেকেই ঠকতে হয়।

সবচেয়ে মিষ্টি কোন্ জিনিস?

এক রাজা একদিন তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মন্ত্রী সবচেয়ে মিষ্টি কোন্ জিনিস বলতে পার?" মন্ত্রী বললেন ঃ "মহারাজ, মিষ্টি কথাই হল সবচেয়ে মিষ্টি, তার চেয়ে মিষ্টি আর কিছুই নেই।" রাজা তা মানতে রাজী হলেন না, তিনি বললেন ঃ "চিনি, গুড়, মধু রয়েছে, আরও কতরকম সুস্বাদু জিনিস রয়েছে, সেসব ছেড়ে মিষ্টি কথাই সবচেয়ে মিষ্টি হল? না মন্ত্রী, তোমার একথা আমি মানতে পারলাম না।" রাজার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মন্ত্রী চুপ করে রইলেন।

কিছুদিন পর মন্ত্রী একদিন রাজাকে তাঁর বাড়িতে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। নানারকম ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন করা হল। রাজাও পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার সমাধা করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রাজা যখন মন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরুবেন এমন সময় মন্ত্রী হঠাৎ রাজাকে একটা বিশেষ কটু কথা বলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফেললেন। সেই কথা শোনামাত্র রাজার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মন্ত্রীর সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে তিনি প্রাসাদে ফিরে এলেন।

সেদিনটা মন্ত্রী আর রাজবাড়িতে গেলেন না। পরের দিন সকালবেলা তিনি রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজা রেগে গিয়ে বললেন ঃ "তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, তোমার মন্ত্রীপদ আমি খারিজ করে দিলাম, আর তোমাকে মন্ত্রীগিরি করতে হবে না।" মন্ত্রী বললেন ঃ "রাজামশাই, আপনাকে এত ভালো ভালো জিনিস আমি খাওয়ালাম, আপনিও খেয়ে কত খুশি হলেন আর সামান্য কী একটা কথা বলেছি, তাতেই আপনার সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল! আপনিই এবার বিচার করুন মহারাজ, সেদিন যে আপনাকে আমি বলেছিলাম যে মিষ্টি কথাই হল সবচেয়ে মিষ্টি জিনিস, তা কি মিথ্যে বলেছি?"

☆ ☆ ☆

ভগবান মানুষকে যে বলবার শক্তি দিয়েছেন, সেই বচন বা কথনকে যিনি মিষ্টি করে তুলতে পারেন, মিষ্টিভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তিনিই যথার্থ তার সদ্ব্যবহার করে থাকেন। নানারকম মিষ্টি খাইয়ে যে তৃপ্তি দিতে পারা যায় না, তিনি দুটো মিষ্টি কথাতেই শ্রোতার মনে সেই তৃপ্তি এনে দেন। তাই বলা হয় 'বোলি বোল অমোল হ্যায়' অর্থাৎ বচন হল অমূল্য ধন বা সম্পদ, দুনিয়ার সেরা মিষ্টি জিনিস।

কেন শোক ?

এক রাজা, তাঁর এক ছেলে। রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই যুবক ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজকার্য থেকে অবসর নিলেন। ছেলে বেশ দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে লাগল আর তাই দেখে রাজা তাঁর রাজত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। এইভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন রাজপুত্রের অসুখ করল। রাজপুত্রের অসুখ, তাই চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হল না। দেশের বড়ো বড়ো বৈদ্যরা এসে রাজপুত্রের চিকিৎসা করতে লাগলেন, কিন্তু রোগের কোনো উপশম হল না, রাজপুত্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। ছেলের এই অবস্থা দেখে রাজা ঘোষণা করলেন যে রাজপুত্রকে যে ভালো করে দিতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করবেন। সেই ঘোষণা শুনে দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে বৈদ্যরা আসতে লাগল, কিন্তু কেউই রাজপুত্রকে ভালো করতে পারল না।

রাজার যিনি গুরু তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তিনি জানতে পারলেন রাজপুত্রের বাঁচবার কোনো আশাই নেই, তার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। রাজগুরু দেখলেন, ছেলের প্রতি রাজার যেরকম মোহ, তাতে ছেলের মৃত্যু হলে রাজা সে শোক সহ্য করতে পারবে না, ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দেহত্যাগ করবেন। কোন্ উপায়ে রাজার এই মোহ দূর করা যায়, কীভাবে রাজার প্রাণ রক্ষা করা যায়, রাজগুরুর মনে তখন এই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর একদিন তিনি এক বৈদ্যের বেশ ধারণ করে রাজার কাছে এসে বললেন ঃ "আমি আপনার ছেলেকে ভালো করে দিতে পারি, কিন্তু আমার একটা সর্ত আছে, দেখুন আপনি তা পূরণ করতে পারেন কিনা।" রাজা বললেন ঃ "বলুন আপনার কী সর্ত, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।" বৈদ্যরূপী গুরু তখন রাজাকে বললেন ঃ "কোন সুখী লোকের কাছ থেকে আপনি আমাকে একটা পয়সা এনে দিন, তাহলে আমি আপনার ছেলেকে ওষুধ দেব আর তাতেই সে ভালো হয়ে উঠবে।"

রাজা তখন সুখী লোকের সন্ধানে বের হলেন। প্রথমেই তিনি এক সম্পন্ন জমিদারের কাছে গিয়ে ছেলের অসুখের কথা ও বৈদ্য কী বলছে তা জানিয়ে বললেন ঃ "তোমাকে আমি সুখী মানুষ বলেই জানি, তুমিই আমাকে একটা পয়সা দাও, তাহলে হয়তো আমার ছেলে বেঁচে যাবে।" রাজার কথা শুনে জমিদার বললেন ঃ "মহারাজ, আমাকে আপনী সুখী বলছেন! যদি ভিতরের কথা জানতেন তাহলে বুঝতেন আমার মতো দুঃখী খুব কমই আছে। কী আর বলব মহারাজ, আমার স্ত্রীর মতো এমন মুখরা আর ঝগড়াটে মেয়েমানুষ আপনি সারা দুনিয়ায় আর একটিও খুঁজে পাবেন না। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তার অত্যাচারে আমার জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমার মতো দুঃখী আর কে আছে বলুন।"

রাজা এবার গেলেন শেঠের কাছে। সব শুনে শেঠজী বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি জানেন না কীরকম দুশ্চিন্তায় আমার দিন কাটে। সুখ যে কী বস্তু জীবনে আমি তা জানতে পারলাম না। সকালে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জমা-খরচের হিসেব নিয়ে বসতে হয়, কিসে দুপয়সা আসবে, কেমন করে তা বজায় থাকবে, খরচপত্রই বা কীভাবে করতে হবে, এইসব চিন্তাতেই সারাদিন জেরবার হয়ে গেলাম। সুখভোগ কি আমার কপালে আছে মহারাজ?"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাজা এবার মন্ত্রীর কাছে গিয়ে সব কথা শুনিয়ে বললেন ঃ "মন্ত্রী, তোমার মতো সুখী লোক তো কাউকে দেখিনে, তুমিই আমাকে একটা পয়সা দাও।" মন্ত্রী বললেন ঃ "আমার দুঃখের কথা কী আর বলব মহারাজ, পাঁচটা ছেলেই গোল্লায় গিয়েছে। কেউ মাতাল কেউ জোচ্চর, কেউ ব্যভিচারী একটাও মানুষ হল না। এদের জন্য লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, অথচ তাদের শোধরানোর কোনো উপায় আমি দেখতে পাচ্ছিনে। এদের নিয়ে কী অশান্তিতেই যে আছি তা একমাত্র ভগবানই জানেন।"

এইভাবে রাজা সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু এমন কাউকে খুঁজে পেলেন না যাকে সুখী বলা যায়। রাজা আর কী করেন, বৈদ্যের কাছে এসে জানালেন যে সারা রাজ্যে তিনি কোন সুখী লোক খুঁজে পেলেন না। বৈদ্য তখন রাজাকে বললেন ঃ "মহারাজ, সারা রাজ্য ঘুরে তো দেখলেন প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনোভাবে দুঃখ ভোগ করছে, সর্বাংশে সুখী তো কেউ নেই, তবে আপনিই বা কেন নিজের জন্যে পরিপূর্ণ সুখ আশা করেন? ছেলের জন্যে আপনি দুঃখ করবেন না, তার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, এবার তাকে যেতে হবে। আপনি কি তাকে ধরে রাখতে পারবেন? ভবিতব্যকে কেউ রোধ করতে পারে না, যা হবার তা হবেই হবে, কারুর সাধ্য নেই তাকে রোধ করে। একটা কথা জানবেন মহারাজ, মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখনই স্থির হয়ে যায় তার মৃত্যু কবে হবে, কখন হবে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।"

বৈদ্যের বেশে রাজগুরুর এইসব উপদেশ শুনে রাজার মনে তত্ত্বচিন্তার উদয় হল। চিত্তের বিভিন্ন বিকার নিয়ে তন্ন তন্ন করে তিনি বিচারে মগ্ন হলেন। এইভাবে তত্ত্বচিন্তার ফলে ক্রমে তাঁর হৃদয় জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং 'আমার ছেলে' এই অভিমান থেকে তিনি মুক্ত হলেন। গুরু যখন দেখলেন যে তাঁর মোহগ্রস্ত শিষ্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শোক-মোহ কাটিয়ে আবার রাজকার্যে মন দিয়েছেন, তখন তিনি আপন আশ্রমে ফিরে গেলেন।

☆ ☆ ☆

আলো না জ্বালালে যেমন অন্ধকারকে দূর করা যায় না, তেমনি শোক-মোহকে দূর করতে হলে আত্মজ্ঞানের আলো জ্বালাতে হয়। আত্মজ্ঞান লাভের উপায় হল অনবরত বিচার। এই বিচারের ফলে হৃদয়ে জ্ঞানসূর্যের উদয় হয় এবং তারই দীপ্তিতে শোক-মোহরূপ পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর হয়ে যায় ও হৃদয় অপার শান্তিতে ভরে ওঠে। এই বিচার মানুষের মধ্যে জাগিয়ে দেন যিনি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরু। মোহের অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ শিষ্যের তিনিই চোখ ফুটিয়ে দেন।

উপদেশের বিভিন্নতা

এক মহাপুরুষের কাছে তাঁর কয়েকজন শিষ্য থাকত। শিষ্যদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যে কারুর কাছে তারা কিছু চাইতে পারবে না, গৃহস্থের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তারা শুধু বলবে 'গুরু দাতা বন্ধননাশী'। সেই ডাক শুনে কেউ যদি কিছু ভিক্ষে দেয়, তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই নিয়মে ভিক্ষান্নের দ্বারা গুরু ও তাঁর শিষ্যদের আহারের সংস্থান হয়ে যায়।

শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিল পরম গুরুভক্ত। এই গুরুগতপ্রাণ শিষ্যটি প্রাণমন ঢেলে গুরুর সেবা করে, স্বহস্তে তাঁর আহার্য প্রস্তুত করে, সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকে যাতে গুরুর কোনো বিষয়ে কোনো অসুবিধে না হয়। মহাপুরুষকে দর্শন করতে ও তাঁর উপদেশ শুনতে প্রতিদিন অনেক ভক্ত আসত তাঁর কাছে। এই শিষ্যটি লক্ষ্য করল যে তার গুরুদেব সকলকে একরকম উপদেশ দেন না, বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দেন। দেখে তার মনে খটকা লাগল, সে ভাবতে লাগল এর কারণটা কী? গুরু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। শিষ্যের মনের ভাব বুঝতে পেরে তিনি তাকে বললেন : "বৎস, তোমার মনে যে সংশয় উপস্থিত হয়েছে, সে সংশয় ভগবান একদিন মিটিয়ে দেবেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

শিষ্যরা একদিন ভিক্ষের বেরুচ্ছে এমন সময় গুরু তাদের বললেন : "দেখো, তোমরা কোনো গরীব গৃহস্থের বাড়ি ভিক্ষে করতে যেয়ো না, ভিক্ষে দিতে তাদের কষ্ট হয়। অবস্থাপন্ন লোকেদের ঘর থেকে তোমরা ভিক্ষে নিয়ো।" গুরুর কথামতো শিষ্যরা এক জমিদার বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রথা অনুযায়ী হাঁক দিল 'গুরু দাতা বন্ধননাশী'। দরজার পাশে খাঁচাতে একটা ময়না ছিল। শিষ্যদের ডাক শুনে সে তাদের বলল : "তোমাদের গুরু হলেন দাতা, তোমরা বলছ তিনি বন্ধন নাশ করেন। তাঁকে তোমরা একবার জিজ্ঞাসা কোরো আমার এ বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পাব কেমন করে।" শিষ্যরা বলল : "একথা আর গুরুদেবকে কী জিজ্ঞাসা করব, আমরাই বলে দিচ্ছি। ময়না, তুমি 'রাম রাম' বলো।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিষ্যরাও চলে গেল আর ময়নাও সেই থেকে রামনাম বলা শুরু করে দিল, তাই শুনে জমিদারের আর আনন্দ ধরে না। সবাইকে ডেকে তিনি দেখাতে লাগলেন ময়না কেমন ভগবানের নাম করছে। জমিদার তখন চাকরদের হুকুম দিলেন ঃ "ময়নাকে আর কাঠের খাঁচায় রাখিসনে, ওকে লোহার খাঁচায় রাখ আর ওর এক পায়ে শিকল রয়েছে, তার বদলে দু পায়েই শিকল পরিয়ে দে।" ময়না দেখল এ তো ভালো বিপদ হল, রামনাম নিয়ে আমার বাঁধন যে ডবল হয়ে গেল! শিষ্যরা আবার জমিদার বাড়িতে ভিক্ষে করতে এলে ময়না তাদের বলল ঃ "তোমাদের উপদেশ শুনে আমার কী দুর্দশা হয়েছে দেখো, ছিল এক পায়ে শিকল, রামনাম বলায় এরা আমার দু পায়েই শিকল পরিয়ে দিয়েছে। তোমাদের দিয়ে আমার কোন উপকার হবে না। তোমাদের গুরু সিদ্ধপুরুষ, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো ময়নার বন্ধন কিসে ঘুচবে।"

শিষ্যরা ফিরে এসে মহাপুরুষকে বলল ঃ "গুরুদেব, এক ময়না তার বন্ধন দশা কেমন করে ঘুচবে সেই উপদেশ আপনার কাছে জানতে চায়।" শিষ্যদের কথা শোনামাত্র গুরু অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তাঁর হাত পা অসাড় হয়ে গেল, মাথা একপাশে হেলে পড়ল, দেহে জীবনের চিহ্নমাত্রও রইল না। অনেক শুষসার পর গুরুদেব সুস্থ হলেন, শিষ্যরা তাঁকে আর ময়নার কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

আবার একদিন শিষ্যরা এসেছে জমিদার বাড়িতে। তাদের দেখে ময়না জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোমরা কি আমার কথা বলেছিলে তোমাদের গুরুর কাছে?" শিষ্যরা বলল ঃ "না রে ময়না, তোর কথা আর কখনো গুরুদেবের কাছে তুলব না। সেদিন তোর কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদেবের কী যে হল কে জানে, হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, মনে হল তাঁর প্রাণও বুঝি বেরিয়ে গেল।" এই কথা শুনে ময়না পাখা ঝাপটাতে লাগল, তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল আর মড়ার মতো পড়ে রইল খাঁচার মধ্যে। তাই দেখে চাকরের দল হইহই করে ছুটে এল, খবর পেয়ে জমিদারবাবুও হন্তদন্ত হয়ে এসে দেখলেন ময়নার নিথর দেহ খাঁচার মধ্যে পড়ে রয়েছে। অমনি খাঁচা থেকে ময়নাকে বের করে আনা হল, তার পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হল, সকলেই ধরে নিল যে ময়না মরে গিয়েছে। ময়নার জন্য সবাই যখন দুঃখ করছে, এমন সময় সুযোগ বুঝে ময়না হঠাৎ উঠে দু পাখা মেলে উড়ে পালাল।

এতক্ষণে শিষ্যদের খেয়াল হল কেন ময়নার কথা শুনে গুরুদেব অমন অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছিলেন। তারা বুঝতে পারল যে এইভাবে ইঙ্গিত করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি ময়নাকে তাঁর উপদেশ জানিয়ে দিয়েছেন। শিষ্যদের দিয়ে গুরু যদি মুখে তাঁর উপদেশ বলে পাঠাতেন তাহলে জমিদারের চাকররা হয়তো তা শুনে ফেলত। যাতে তারা কিছু বুঝতে না পারে সেইজন্যেই তিনি ময়নাকে মড়ার ভান করে পড়ে থাকবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ইঙ্গিত শিষ্যরা বুঝতে পারেনি, শিষ্যদের মুখে গুরুর অবস্থা শুনে চাকররাও কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দেওয়া, সেই ময়না ঠিক তা বুঝে নিয়েছে।

গুরুগতপ্রাণ যে শিষ্যটির মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল যে গুরুদেব সকলকে কেন একরকম উপদেশ দেন না, তারও সেই সংশয় এখন দূর হয়ে গেল, এতদিনে সে বুঝল যে মানুষের পক্ষে রামনাম যে মুক্তির উপায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই, ভগবানের নাম নিলে ভাববন্ধন সত্যিই মোচন হয়, কিন্তু ময়না চাইছে খাঁচার বাঁধন থেকে মুক্তিলাভ করতে, রামনামে সেই বন্ধন দূর হয় না, তাতে বরং বন্ধন আরোও দৃঢ় হয়। কাজেই সকলের পক্ষে একই নিয়ম কখনো খাটতে পারে না। মানুষের পক্ষে যা মুক্তিপ্রদ, ময়নার পক্ষে সেটাই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাই দেখে শিষ্যের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গেল যে সব মানুষের অবস্থা যখন সমান নয়, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব চরিত্রে যখন মানুষে মানুষে প্রভেদ রয়েছে, তখন প্রতি মানুষের অবস্থা বুঝে যার যেমন অধিকার, সদ্‌গুরু তাকে সেইভাবেই উপদেশ দেন। তাই সকলের ক্ষেত্রে একই উপদেশ প্রযোজ্য নয়।

☆ ☆ ☆

শাস্ত্রে বার বার অধিকারভেদের কথা বলা হয়েছে। গীতায়ও ভগবান 'স্বে স্বে কর্মণি', আপন আপন অধিকার অনুসারে কর্মে নিযুক্ত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, 'পরধর্মো ভয়াবহঃ' বলে সতর্ক করে দিয়েছেন, নিজের অধিকার লঙ্ঘন করে অন্যের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। অধিকার থাকলেই ঠিক ঠিক সংকেত বা তাৎপর্যটি ধরতে পারা যায়, যেমন এখানে পাখিটি বুঝেছিল, শিষ্য বোঝেনি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সদ্‌গুরুর মাহাত্ম্য

এক সাধু, তাঁর দুই শিষ্য। সাধুর আরাধ্য দেবতা নারায়ণ বিগ্রহের সেবা-পুজোতেই তাঁর দিন কেটে যায়। অবসর সময়ে সাধু তাঁর দুই শিষ্যকে নিয়ে শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন থাকেন। শিষ্য দুটিও গুরুগতপ্রাণ। প্রাণপণ যত্নে তারা গুরুর সেবা করে, একমাত্র গুরু ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না, গুরুই তাদের ধ্যান-জ্ঞান, গুরুই তাদের তপস্যা।

এক বৈশাখ মাসের সকালবেলা এক শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে বলল ঃ "গুরুদেব, আজ আমাকে বহু দূরের দেশে রওনা হতে হবে, আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন।" বলতে বলতে শিষ্যের চোখে জল এসে গেল, গুরুর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় সে আকুল হয়ে উঠল। গুরু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ "বৎস, সেখানে যেন বেশি দেরি কোরো না, আশীর্বাদ করি যেন তোমার কোনো বিঘ্ন না ঘটে, তাড়াতাড়ি আমার কাছে আবার তুমি ফিরে এসো।"

দূরের দেশ। প্রশস্ত নদীর বুকে জাহাজে করে শিষ্য চলেছে সেই দেশে। সারাদিন স্বচ্ছন্দ গতিতে জাহাজ চলেছে, কিন্তু সন্ধ্যে হবার আগেই চারিদিক কালো মেঘে ছেয়ে ফেলল। ক্ষণেকের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল কালবৈশাখীর প্রচণ্ড তাণ্ডব। অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় দিক্‌দিগন্ত ঝাপসা হয়ে গেল, বিক্ষুব্ধ নদীর জল ফুলে ফেঁপে উন্মাদগর্জনে ছুটে চলল, মনে হল আর বুঝি জাহাজকে বাঁচানো গেলনা। বিপন্ন যাত্রীরা তখন আর্তকণ্ঠে হাহাকার করছে, শিষ্য তখন একান্তে বসে গুরুদেবের পাদপদ্মের ধ্যানে বিভোর। চোখ তার মুদ্রিত, মুখে শুধু 'গুরু গুরু' নাম।

এদিকে গুরুদেব ঠিক সেই সময় নিজের আশ্রমে নারায়ণের সন্ধ্যা-আরতির আয়োজন করছেন। ফুলের মালা ঠাকুরের গলায় পরাবেন বলে হাতে তুলে নিয়েছেন, কিন্তু মালা তিনি পরাতে পারলেন না, হাতের মালা হাতে নিয়েই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দেহ নিস্পন্দ, শ্বাস রুদ্ধ, সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ অবলুপ্ত, মালা হাতে নিয়ে গুরুদেব কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর যে শিষ্যটি তাঁর কাছে ছিল, সে বলে উঠল ঃ "গুরুদেব, আর কোনো চিন্তা নেই, ঝড় থেমে গিয়েছে, এবার আপনি ঠাকুরের গলায় মালা পরিয়ে দিন।"

শিষ্যের কথা শুনে গুরু চমকে উঠলেন, এ কেমন করে ঝড়ের কথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানতে পারল? তিনি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "বৎস, কী কারণে আমি উন্মনা হয়েছিলাম, কোন্ ভাব আমার মনকে অধিকার করেছিল, তা তুমি কেমন করে জানলে?" শিষ্য বলল : "গুরুদেব, এতো আপনারই কৃপা। আপনার শ্রীচরণ ছাড়া আমার তো অন্য কোনো সাধনা নেই। আপনার চরণকমলই আমার একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসা।" এই বলে শিষ্য গুরুর পায়ে মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করল। গুরু দুহাত দিয়ে শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : "বৎস, তোমার সকল সাধনা আজ সিদ্ধ হয়েছে, এখন থেকে তুমি আর সাধক নও, তুমি সিদ্ধ পুরুষ।"

☆ ☆ ☆

সদ্‌গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যে সম্বন্ধ, তা কেবল শ্রীগুরুর স্থূল দেহটা ঘিরেই সীমাবদ্ধ নয়। দেহেই হোক আর বিদেহ অবস্থাতেই হোক, সদ্‌গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি বা সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া কখনো রুদ্ধ হয় না। এর অজস্র প্রমাণ মহাজনদের জীবন থেকে পাওয়া যায়। এই গল্পে প্রথমে গুরুর সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া দেখানো হয়েছে। প্রিয় শিষ্য জাহাজে ঝড়ে বিপন্ন হওয়ায় গুরু তাঁর আত্মশক্তির প্রভাবে শিষ্যকে অভয় দেন। শিষ্যের সঙ্গে গুরুর আত্মিক যোগ যে সর্বদা বজায় থাকে, সেটিও এখানে দেখতে পাই। সেইসঙ্গে একনিষ্ঠ গুরুভক্তি যে শিষ্যের পক্ষে সিদ্ধিলাভের সহায়ক হতে পারে, তা-ও এই গল্পে দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় শিষ্যের প্রসঙ্গে। শিষ্য যেমন গুরুকৃপায় সব বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পায়, তেমনি গুরুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে একীভূত বা অভিন্নও হয়ে যেতে পারে। তখন গুরু-শিষ্যে আর কোনো ভেদ থাকে না।

দুই পুতুল

এক শিল্পী একজোড়া পুতুল তৈরি করছে। ভারী চমৎকার সে পুতুল, যে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। দলে দলে লোক আসে সেই পুতুল দেখতে, কিনবে বলে দর জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু দাম শুনে সকলেই পিছিয়ে যায়। অত দাম দিয়ে দুটো কাঠের পুতুল কিনতে কেউ রাজী হয় না। নিজের দেশে পুতুল বিক্রি হচ্ছে না দেখে শিল্পী পুতুল নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে অন্য এক রাজ্যে এসে শিল্পী সোজা রাজবাড়িতে তার পুতুল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিয়ে হাজির হল! সে দেশের যুবরাজ তখন রাজা হয়েছেন, তিনি পুতুল দেখে শিল্পীকে বললেন ঃ "এ দুটো পুতুলই আমার চাই। যত টাকা লাগে লাগুক, এ পুতুল তুমি ফেরত নিয়ে যেতে পারবে না।" রাজার কথা শুনে শিল্পী হাত জোড় করে বলল ঃ "হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে। আমি নিজের হাতে এই পুতুল দুটো তৈরি করেছি আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে এই দুটো পুতুলের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ তা যে বলতে পারবে, তাকেই আমি পুতুল বিক্রি করব। এখন এর মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ আপনি বলুন।" নতুন রাজা মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। দুটো পুতুলই অবিকল একরকম দেখতে, এতটুকু তফাত কোথাও কেউ ধরতে পারবে না। কিছুই ঠিক করতে না পেরে তিনি চিন্তিত মুখে মন্ত্রীর দিকে চাইলেন।

বুড়ো মন্ত্রী পাকা লোক, ভালোমন্দ যাচাই করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। রাজাকে তিনি বললেন ঃ "তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, দুটো পুতুলের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ তা আমি এখুনি বলে দিচ্ছি।" এই বলে মন্ত্রী এক ঘটি জল আনালেন, তারপর ঘটির জল একটা পুতুলের কানে খানিকটা ঢেলে দিলেন। এক কানে জল ঢালতেই আর এক কান দিয়ে সেই জল বেরিয়ে গেল। এবার দ্বিতীয় পুতুলটাকে নিয়ে তিনি তারও এক কানে জল ঢাললেন, কিন্তু অন্য কান দিয়ে সে জল বেরুল না, জল গিয়ে আটকে রইল পুতুলের বুকের কাছে। মন্ত্রী তখন রাজাকে বললেন ঃ "রাজা, এই পুতুলটাই হল শ্রেষ্ঠ।"

রাজা অবাক হয়ে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কেমন করে বুঝলেন যে এই পুতুলটাই শ্রেষ্ঠ?" মন্ত্রী তখন বলতে লাগলেন ঃ "দেখো, দুটো পুতুলেরই মানুষের আকৃতি। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যই হল ভগবানের আরাধনা করা আর যে ভগবানের আরাধনা করবে, তাকে সদ্‌গুরুর কাছে উপদেশ শুনতে হবে। যে উত্তম অধিকারী, সে সদ্‌গুরুর উপদেশ শুনে তা হৃদয়ে ধারণ করে রাখে। আর যে অধম, যে নিকৃষ্ট, গুরুর উপদেশ তার এক কান দিয়ে ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। উপদেশ শোনাই তার সার হয়, কিছুই তার কানে আসে না। রাজা, এই শিল্পী প্রকৃতপক্ষে শিল্পী নন, ইনি একজন মহাপুরুষ। তোমার কল্যাণের জন্য তোমাকে সৎকাজে প্রবৃত্ত করতে তিনি এই পুতুলের দৃষ্টান্ত সঙ্গে নিয়ে নিজে শিল্পী সেজে তোমার কাছে এসেছেন। এখুনি তুমি এই সদ্‌গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ো, তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।"

* * *

গুরু নানা কৌশলে প্রথমে যাচাই করে নেন শিষ্য তাঁর উপদেশ সতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্যি হৃদয়ে ধারণ করবে কিনা। যখন বোঝেন তার মধ্যে বিবেক জেগেছে, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, কোন্‌টি নিকৃষ্ট বুঝবার মতো বুদ্ধি ফুটেছে, তখনই নিজের গড়া সম্পদ তাকে দিতে দ্বিধা করেন না। শিষ্যকে এই বিবেক বা বিচারে সাহায্য করে তার মন্ত্রী অর্থাৎ বুদ্ধি।

নিষ্কাম ভক্তের নিঃশঙ্কতা

ভগবান বহুদিন হল গোলোক ছেড়ে মর্ত্যলোকে গিয়ে রয়েছেন দেখে নারদ ঋষি ভাবতে লাগলেন, আমরা এতদিন ধরে তাঁর দর্শনলাভে বঞ্চিত রয়েছি, একবার মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসা যাক কী এমন কাজে তিনি সেখানে আটকে পড়েছেন। এই ভেবে নারদ বৃন্দাবনে এসে দেখলেন ভগবান সেখানে গোপ-গোপীদের সঙ্গে মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। দেখেই তো রাগে নারদের সর্বাঙ্গ জলে গেল, গোলোকের পতি হয়ে প্রভু কিনা এইসব নীচজাতীয় গোয়ালাদের দলে ভিড়ে গেলেন! নারদের ইচ্ছে হল প্রভুকে একবার এর কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু প্রভুকে একান্তে কাছে পাওয়া যায় না, সব সময় তিনি এদের নিয়েই মেতে আছেন। নারদ তাই তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখা করবার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন সুযোগ মিলে গেল। নারদ ভগবানকে বললেন ঃ "প্রভু, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনি তার উত্তর দিয়ে আমার কৌতূহল মিটিয়ে দিন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, নারদের মনের ভাব আগেই বুঝতে পেরেছেন। তাই একটু হেসে তিনি নারদকে বললেন ঃ "কী তোমার প্রশ্ন বলো।" নারদ কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন ঃ "প্রভু, আপনি গোলোকপতি, গোলোক ছেড়ে, লক্ষ্মীদেবীকে ছেড়ে, আমাদের মতো ভক্তদের ছেড়ে আপনি এইসব গোয়ালাদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, এর কারণ আমি কিছু বুঝতে পারছিনে। কৃপা করে আমাকে তা বুঝিয়ে দিন।" ভগবান বললেন ঃ "নারদ, আমি এখন খুব অসুস্থ, ভীষণ জ্বর। আমার সুস্থ হওয়ার একটা ব্যবস্থা আগে করো দেখি, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।" নারদ বললেন ঃ "প্রভু, কিসে আপনার অসুখ সারবে বলে দিন, আমি এখুনি আপনাকে ওষুধ এনে দিচ্ছি।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ "যদি কোনো ভক্তের পদধূলি এনে আমার গায়ে মাখিয়ে দিতে পারো তাহলেই আমার অসুখ সেরে যাবে।" নারদ বললেন ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সে কী কথা প্রভু! আপনার গায়ে মাখাবার জন্যে কোন্ ভক্ত পদধূলি দেবে? পাপের ভয়ে কেউ তা দেবে না।" ভগবান বললেন: "তবু একবার চেষ্টা করেই দেখো না, আমি অসুস্থ জানতে পারলে আমার রোগ সারাতে কোনো ভক্ত পায়ের ধুলো দিতেও তো পারে।" নারদ তখন পদধূলি সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই তিন ভুবন নারদ ঘুরে বেড়ালেন, কোথাও পদধূলি মিলল না। নারদ ফিরে এসে ভগবানকে বললেন: "প্রভু, আমি ত্রিভুবন ঘুরে এলাম, কিন্তু দেবতা কিংবা মানুষ কেউই আপনার জন্যে পায়ের ধুলো দিতে রাজী হল না।" ভগবান বললেন: "ত্রিভুবন তো ঘুরে এলে। তুমি বৃন্দাবনে গোপ-গোপীদের কাছে গিয়েছিলে?" নারদ জানালেন সেখানে তিনি যাননি। ভগবান তখন বললেন: "একবার সেখানে গিয়ে দেখো না কেউ আমার জন্যে পায়ের ধুলো দেয় কিনা।"

নারদ বৃন্দাবনে গিয়ে গোপ-গোপীদের ডেকে বললেন: "শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের খুব অসুখ। তিনি বলেছেন ভক্তদের পায়ের ধুলো গায়ে মাখিয়ে দিলে তাঁর অসুখ সেরে যাবে। তোমরা কি তাঁর জন্যে তোমাদের পদধূলি দিতে পারবে?" শোনামাত্র তারা সবাই বলে উঠল: "নিশ্চয় পারব।" তাদের উৎসাহ দেখে নারদ বললেন: "ওরে মুর্খ, তোরা জানিসনে শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। তোদের পায়ের ধুলো তাঁর গায়ে মাখালে যে তোদের পাপ হবে।" তারা নারদকে জিজ্ঞাসা করল: "ঠাকুর, পাপ হলে আমাদের কী হবে?" নারদ বললেন: "তোদের নরকে গিয়ে পচতে হবে।" তাই শুনে গোপ-গোপীরা বলল: "আমরা নরকে যাব সে-ও ভালো, আমাদের প্রাণের সখা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তো সুস্থ হয়ে উঠবেন। নাও ঠাকুর, আর দেরি কোরো না, কিসে পদধূলি নেবে বলো।" নারদের কাছে পদধূলি নেবার মতো কোনো পাত্র ছিল না। তাই দেখে তারা বলল: "তোমার গায়ের নামাবলীখানাই না হয় খুলে দাও, তাতেই আমরা পদধূলি বেঁধে দিচ্ছি।" নামাবলী খুলতে নারদ ইতস্তত করতে লাগলেন। গোপ-গোপীরা তখন জোর করে তাঁর গা থেকে সেখানা খুলে নিল, তারপর সকলে মিলে নিজের পায়ের ধুলো সেই নামাবলীতে বেঁধে তা নারদের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বলল: "যাও ঠাকুর, তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের প্রিয়তমকে সুস্থ করে তোলো।"

গোপ আর গোপিনীদের ভাব দেখে নারদ তো অবাক। তাদের পদধুলির বোঝা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন: "প্রভু, গোপ-গোপিনীরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপনার জন্যে পদধূলি দিয়েছে, আপনি তা গায়ে মেখে সুস্থ হয়ে আমাকে বলুন কেন আপনি এদের মধ্যে পড়ে রয়েছেন।" শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন ঃ "এখনো তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওনি নারদ? তুমি ত্রিভুবন ঘুরে এলে, আমি সুস্থ হব জেনেও পাপের ভয়ে কেউ তোমাকে পদধূলি দিল না। আর বৃন্দাবনের গোপ-গোপীদের দেখো, আমার জন্যে তারা নরকে পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। এদের মতো নিঃস্বার্থ প্রেমিক ভক্তের টানেই আমাকে গোলোক ছেড়ে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে। তারা যে আমাকে তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় বলে জানে, এমন ভক্তই তো আমার প্রাণ। এদের কি ছেড়ে থাকা যায়? নারদ, এখন বুঝলে তো কেন আমি গোলকপতি, লক্ষ্মীপতি হয়েও পৃথিবীতে এসে রয়েছি। দেখো নারদ, গোলোকপতি হয়েছি বলে আমি কি জগৎপতি নই? জগৎপতি হয়ে আমি কেমন করে জগৎবাসী ছেড়ে থাকব? লক্ষ্মীকেও বরং ছেড়ে থাকা যায়, কিন্তু আমার এইসব নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভক্তকে ছেড়ে থাকা যে আমার পক্ষে অসম্ভব।"

☆ ☆ ☆

ভগবান গোলোকেও থাকেন না, বৈকুণ্ঠেও থাকেন না। বাঁধা থাকেন নিষ্কাম ভক্তের হৃদয়ে, যে-ভক্ত নিজের জন্যে কিছু চায় না, শুধু চায় কেমন করে তাঁর একটু সেবা করবে, তাঁকে সুখে রাখবে। এই যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে, নিজের সমস্ত ভালো-মন্দ বিসর্জন দিয়ে, কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে শুধু আপন প্রিয়তমের জন্যে জীবন উৎসর্গ করা, এরই নাম গোপীপ্রেম, 'কামগন্ধ নাহি যায়', যার মধ্যে কামনার, স্বার্থসিদ্ধির লেশমাত্র দাগ থাকে না।

সুখ ও দুঃখের সহাবস্থান

গ্রীষ্মকাল। দুপুরের কাঠফাটা রোদে এক চাষা মাঠে কাজ করছে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে, আগুনের মতো গরম হাওয়া সে আর সহ্য করতে পারছে না। তবু মাঠের কাজ না করলে নয়। চাষা আকাশের পানে মুখ তুলে চায় আর বলে ঃ "ভগবান, আর যে পারিনে। তুমি আমার দেহটাকে পাষাণের মতো করে দাও, তাহলে রোদের তাপ থেকে বেঁচে যাই।" এমন সময় দৈববাণী হল, "তথাস্তু।"

এতক্ষণ রোদের যে প্রচন্ড তেজ চাষাকে দগ্ধ করে মারছিল, দৈববাণী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষা তা[illegible]ত থেকে রেহাই পেয়ে গেল। মাঠের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে এলে চাষার বউ প্রতিদিনকার মতো নিজের হাতে তেল মাখিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল স্নান করতে। কিন্তু স্নান করে চাষা কোনো আরাম বোধ করল না। স্নান সারা হলে বউ তাকে খেতে দিল, কিন্তু খেতে বসেও চাষা কোনো তৃপ্তি পেল না। সে কেবল ভাবতে লাগল, কোনোদিন তো এমন হয় না, আজ কেন এমন হল। চাষাকে চিন্তিত দেখে বউ তাদের ছোটো ছেলেকে স্বামীর কোলে বসিয়ে দিল। ছোটো ছেলেকে চাষা খুব ভালবাসে, বউ ভাবল ছেলেটাকে কোলে নিলেই তার স্বামীর সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। চাষা ছেলেকে আদর করতে লাগল, কিন্তু তাতেও সে কোনো সুখ পেল না। এইসব দেখে তার ভয়ানক ভাবনা ধরে গেল, আজ আমার এ কী হল, কিছুতেই কোন আনন্দ পাচ্ছিনে কেন?

ভাবনা-চিন্তায় চাষা অস্থির হয়ে উঠেছে এমন সময় আবার সে দৈববাণী শুনতে পেল, "ওরে মুর্খ, আজ যে তুই পাষাণ হবার বর চেয়ে নিয়েছিস, তাই আজ থেকে তোর সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ হবে আর দুঃখ হবে না, এমন পাষাণ আমি তৈরি করতে পারিনে। জেনে রাখিস যার দুঃখ থাকবে না, তার সুখও থাকবে না। কেবল সুখ নেব, দুঃখ নেব না। এমন কোনো উপায় আমার জানা নেই।" চাষা তখন হাত জোড় করে বলতে লাগল ঃ "হে ভগবান, আমি আগে যেমন সুখ-দুঃখ ভোগ করতাম, আমাকে সেইরকম করে দাও। আমি বুঝতে পেরেছি যে যা-কিছু বিধান তুমি আমাদের জন্যে করেছ, তা আমাদের কল্যাণের জন্যেই করেছ। সুখ আর দুঃখ যদি চলে যায় তাহলে আমাদের রইল কী? আমরা যে পাষাণ হয়ে যাব। আমার এই পাষাণের বোঝা নামিয়ে দাও প্রভু।"

আকাশ থেকে দৈববাণী হল, "তথাস্তু।"

☆ ☆ ☆

ভগবান মানুষকে চেতনা দিয়েছেন এবং সেই চেতনায় তার কখনো সুখ, কখনো দুঃখের বোধ হয়ে থাকে। অচেতন পাষাণের মধ্যে সুখ-দুঃখের কোনো বোধ নেই। মানুষ অনেক সময় দুঃখের জ্বালায় তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে অজ্ঞান অচেতন হয়ে যাওয়াই কাম্য মনে করে। কিন্তু সে বোঝে না চেতনা বিলুপ্ত হওয়া মানে তার সমস্ত সত্তা বা অস্তিত্বই হারানো। সৃষ্টির মধ্যে তাই যেমন যেমন চেতনার প্রসার বা বিস্তার ঘটেছে, তেমন তেমন সুখ-দুঃখের বোধও তীব্র হয়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে সুখ-দুঃখ যত গভীর এমন অন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে নয়। মানুষের বিকাশের জন্যেই ভগবান তাকে এই দুঃখের অনুভূতি দিয়েছেন, তারও সার্থকতা আছে। তাই দুঃখ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে অচেতন পাষাণ হয়ে যাওয়া কখনোই কাম্য হতে পারে না।

সংসারীব ভগবৎচিন্তা

নারদ ঋষির মনে বড়ো অহংকার হল যে আমার মতো ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের আর কেউ নেই। এই অহংকার নিয়ে একদিন তিনি বীণা বাজিয়ে হরিগুণগান করতে করতে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। নারদকে আসতে দেখে তাঁর মনের ভাবটি অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের কাছে গোপন রইল না। নারদ প্রণাম করলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অশীর্বাদ করলেন, কিন্তু নারদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে তিনি আনমনা হয়ে বসে রইলেন। তাই দেখে নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "প্রভু, অনেকদিন পরে আপনাকে দর্শন করতে এসেছি. আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন?" শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ নারদ, মর্ত্যালোকের একটি মেয়ে বড়ো ভক্তিমতী, তার মতো আমার ভক্ত আর কেউ নেই। আমি তারই কথা চিন্তা করছিলাম। ভাবছিলাম একবার গিয়ে তাকে দেখে আসি। তাই তুমি আমাকে অমন আনমনা দেখেছ।" নারদ বললেন ঃ "প্রভু, আপনার সেই পরম ভক্তকে দেখবার জন্যে আমারও বড়ো ইচ্ছে করছে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও নারদ দুজনেই মর্ত্যলোকে এসে গ্রামের এক কৃষকের বাড়িতে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন কৃষকের বউ ঘরকন্নার কাজে ভয়নক ব্যস্ত, এতটুকু তার ফুরসত নেই। আড়াল থেকে বউটিকে দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বললেন ঃ "নারদ এই মেয়েটির কথাই তোমাকে বলছিলাম, মেয়েটি আমার পরম ভক্ত।" তাই শুনে নারদ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ আবার পরম ভক্ত হল কেমন করে? এযে দেখছি ঘোর সংসারী, সংসারের কাজ নিয়ে যেরকম ব্যতিব্যস্ত, তাতে ওর ভগবানের নাম নেবার সময়ই বা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ ও নারদ সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। এইভাবে সারাদিন কেটে গেল, বউটির সংসারের কাজ আর ফুরোয় না। তার কাজ যখন শেষ হল তখন গভীর রাত। খাটিয়ায় তার স্বামী শুয়ে ছিল. সে এসে স্বামীর পাশে শোবার সময় তাকে শুধু বলল ঃ 'একবার প্রাণভরে ডাকো 'শ্রীহরি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরি শ্রীহরি'।" এইভাবে ভগবানের নাম স্মরণ করে বউটি ঘুমিয়ে পড়ল।

দেখেশুনে নারদের তো চক্ষুস্থির। হাসতে হাসতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন ঃ "প্রভু, আপনি বললেন এই চাষার বউ আপনার পরম ভক্ত, কিন্তু এর মধ্যে আমি তো ভক্তির কোনো লক্ষণ দেখলাম না। সারা দিনরাতের মধ্যে তিনবার মাত্র আপনার নাম নিয়েছে, বাকি সময়টা তো দেখলাম সংসার নিয়েই মেতে রইল। এতেই আপনি কেন যে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না।" ভগবান বললেন ঃ "নারদ, তা তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব, কিন্তু তুমি তার আগে আমার একটা কাজ করো। আমি তোমাকে এক বাটি সরষের তেল দিচ্ছি, সেই তেলের বাটি নিয়ে তুমি স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতাল ঘুরে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এসো। কিন্তু খুব সাবধান, এর এক ফোঁটা তেল যেন মাটিতে না পড়ে সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য রেখো। তুমি ফিরে এলে পর তোমাকে বুঝিয়ে দেব কৃষকের বউ আমার কেমন ভক্ত।"

তেলের বাটি নিয়ে নারদ রওনা হলেন। প্রভু বলে দিয়েছেন ত্রিভুন ঘুরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে, কিন্তু কানায় কানায় ভরতি তেলের বাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, তেল উপচে পড়বে। এদিকে প্রভুর হুকুম এক ফোঁটা তেলও যেন মাটিতে না পড়ে। নারদ বড়ো মুশকিলে পড়ে গেলেন, অথচ কিছু করবারও নেই। খুব সন্তর্পণে তেলের বাটি নিয়ে নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে নারদ বহুদিন পর সেই কৃষকের বাড়িতে ফিরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তেলের বাটি ফেরত দিয়ে নারদ বললেন ঃ "প্রভু, কানায় কানায় ভরতি এই তেল সামলাতে আমাকে বড়োই বেগ পেতে হয়েছে। আপনি বলে দিয়েছিলেন মাটিতে তেল পড়লে চলবে না, আবার তাড়াতাড়ি ত্রিভুবন ঘুরে আসতে হবে। এই দুদিক সামলাতে গিয়ে আমার যে কী কষ্ট হয়েছে তা আর বলার নয়। যাইহোক, আপনার আদেশ তো পালন করলাম, এখন বলুন এই চাষার বউকে আপনি কেন পরম ভক্ত বলছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন হেসে বললেন ঃ "নারদ, তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওনি? তুমি হলে ঋষি, দিনরাত বীণা বাজিয়ে আমার গুণগান করেই তোমার দিন কাটে। আচ্ছা, বলো তো নারদ, এই যে তেলের বাটি নিয়ে তুমি ত্রিভুবন ঘুরে এলে, এর মধ্যে কতবার তুমি আমার নাম স্মরণ করেছ?" নারদ বললেন ঃ "প্রভু, তেল যাতে না পড়ে, সারাক্ষণ সেদিকেই আমার সমস্ত মনটা পড়ে ছিল, তাই আপনার নাম স্মরণ করবার কথা একবারও মনে পড়েনি।" ভগবান বললেন ঃ "তবেই বুঝে দেখো কে আমার পরম ভক্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নারদ, এই সংসারটাও হল কানায় কানায় ভরা তেলের বাটিরই মতো। যারা এই সংসারে সমস্ত কাজ শেষ করে অন্তত একবারও আমাকে ভালোবেসে ডাকে, সে মধুর ডাকে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। সংসারে কত কাজই না মানুষকে করতে হয়, তবু ভক্ত যারা, তারা আমাকে ভোলে না, দিনান্তে একবারের জন্যে হলেও তারা আমাকে স্মরণ না করে থাকতে পারে না। নারদ, এই যে তুমি অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনরাত কেবল নামগান করে বেড়াচ্ছ, এতে আর বাহাদুরির কী আছে? সংসারের সব দিক সামাল দিয়ে যে একবারও আমার নাম নেয়, আমি তার গোলাম হয়ে থাকি। তার প্রেম, তার ভক্তির কি তুলনা আছে?"

ভক্ত বলে নারদের মনে এতদিন যে অভিমান ছিল, ভগবানের কথাতে এবার তা দূর হল।

☆ ☆ ☆

ভগবান দেখেন আন্তরিকতা। সে-আন্তরিকতার পরীক্ষা হয় যখন সংসারের শত-সহস্র দায়-দায়িত্ব ও কাজকর্মের মধ্যেও কেউ ভগবানকে ভুলে যায় না, দিনান্তেও একবার স্মরণ করে, সব কাজের শেষেও একটু মনে রাখে। যার সংসারের কোনো ঝামেলা নেই, অখণ্ড যার অবসর, সে নারদের মতো দিনরাত ভগবানের নাম গেয়ে বেড়াবে, এতে তার কোনো কৃতিত্ব নেই। ভগবান কদর দেন তাকেই যে সহস্র কর্মবন্ধনের মধ্যে থেকেও একটু ফাঁক পেলেই তাঁর নাম করে, তাঁকে স্মরণ করে। তার সেই আন্তরিকতা, সেই একান্ত নিষ্ঠাই তাঁকে মুগ্ধ করে, তার একবারের ডাকেই তিনি তার কাছে চলে আসনে, তার দুয়ারে চিরদিনের জন্যে বাঁধা পড়ে যান।

ব্যর্থ গুরুর সার্থক শিষ্য

আত্মজ্ঞান অধিগত নয় এমন একজন লোক গুরুপদ লাভ করল, দু-চারজন শিষ্যও তার জুটে গেল। তাদের মধ্যে একজন গুরুকে দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে আর গুরুসেবায় যাতে কোনো ত্রুটি না হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখে। একবার শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে গুরু তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছে। নানা জায়গা ঘুরে একদিন তারা এক নদীর ধারে এসে পৌছল। সেখানে কোনো নৌকা দেখতে না পেয়ে গুরু-শিষ্য দুজনেরই চিন্তা হল কেমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

করে নদী পার হওয়া যায়। শিষ্য ভাবল, গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করে আমাকে তো ভবসমুদ্র পার হতে হবে, তাঁরই পাদপদ্ম স্মরণ করে এই সামান্য নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয় পারব। এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে শিষ্য চোখ বুঁজে তার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করল, চিত্ত স্থির হওয়ার ফলে তার শরীরস্থ বায়ু স্থির হয়ে গেল এবং বায়ু স্থির হওয়ায় তার শরীরও সেইসঙ্গে এত হালকা হয়ে গেল যে সে 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব' বলতে বলতে অনায়াসে জলের উপর দিয়ে হেঁটে নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছল।

ওপারে গিয়ে শিষ্য গুরুকে ডাকতে লাগল ঃ "গুরুদেব, আপনি আর মিছিমিছি দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি এপারে চলে আসুন।" জ্ঞানহীন গুরু অহংকারে মত্ত হয়ে ভাবল, আমার নামের এমনই মহিমা যে আমার নাম নিয়ে শিষ্য অবলীলাক্রমে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। এই ভেবে গুরু জলে নেমে 'জয় আমি, জয় আমি' বলে এগিয়ে যেতে লাগল। গুরু যতই এগোয় ততই সে গভীর জলে ডুবে যেতে লাগল। গতিক সুবিধে নয় বুঝে গুরু তখন শিষ্যকে ডাক দিয়ে বলল ঃ "তুমি তো আমার নাম নিয়ে বেশ নদী পার হলে, কিন্তু আমার নাম নিয়ে আমি জলে ডুবে মরছি।" শিষ্য দেখল গুরুদেব অগাধ জলে হাবুডুব খাচ্ছে। দেখেই সে আগেকার মতো শরীরের বায়ুকে স্থির করে গুরুর নাম নিয়ে গুরুর কাছে এগিয়ে এল এবং তাকে উদ্ধার করে ওপারে এনে তুলল।

☆ ☆ ☆

গুরু যেমনই হোক না কেন, শিষ্য যদি অকপটে গুরুকে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে পারে, তাহলে শিষ্যের কল্যাণলাভের পথ কেউ রোধ করতে পারে না, এ কথাই মহাজনেরা বলে থাকেন। গুরুর যা গতি হবার তা হবে, শিষ্যের তা দেখবার দরকার নেই। তার কর্তব্য হল গুরুকে ভক্তি করা, তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করা। গুরুসেবার দ্বারাই শিষ্যের সিদ্ধিলাভের পথ সুগম হয়। এই গল্পে দেখা যায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা শিষ্য তার আমিত্ব বোধকে বিসর্জন দিয়েছিল গুরুতে, তাই সে অনায়াসে সংসার-সমুদ্র পার হয়ে গেল। আর গুরু অহংকারে স্ফীত হয়ে 'আমি আমি' করে নিজের ভরাডুবি ডেকে আনলেন, তলিয়ে গেলেন অতলে। শেষে শিষ্যই তাঁকে উদ্ধার করে দেখাল গুরুনামের মহিমা, গুরুতে শরণাগতির সার্থকতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিঙাপন্থী সাধু

এক সাধু গঙ্গার তীরে কুটীর বানিয়ে নির্জনে সাধন-ভজনে দিন কাটান। কিন্তু নির্জনতা তিনি বেশিদিন রক্ষা করতে পারলেন না, দলে দলে লোক এসে তাঁকে বিরক্ত করতে লাগল। কেউ বলে দীক্ষা দাও, কেউ বলে আমার উদ্ধারের পথ বাতলে দাও, এমনি নানাজনের নানান আবদারে সাধু অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এইসব উপদ্রবে সাধন-ভজনে বিঘ্ন হচ্ছে দেখে সাধু বিরক্তি হয়ে তার কুটীরের দরজা বন্ধ করে দিলেন, বাইরের লোকজনদের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাতও বন্ধ হয়ে গেল।

একজন লোক ছিল নাছোড়বান্দা। সাধু যখন প্রাতঃকৃত্যের জন্যে কুটীর থেকে বেরুতেন, এই লোকটিও প্রত্যহ সেই সময় তাঁর অনুসরণ করত আর বলত ঃ "হে গুরুদেব, আপনাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানিনে, আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র ভরসা, দয়া করে আমাকে দীক্ষা দিন।" রোজ এই এক কথা শুনতে শুনতে সাধু একদিন বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন ঃ 'যা, তুই গিয়ে শিং শিং' জপ কর।" লোকটি কৃতার্থ হয়ে চলে গেল।

একাগ্র মনে পরম ভক্তিভরে সেই 'শিং শিং' মন্ত্র জপ করতে করতে লোকটির মনে যা-কিছু কালিমা সব নিঃশেষে দূর হয়ে গেল, পরমাত্মার দিব্য প্রকাশে তার অন্তরের অন্তস্থল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। গুরুভক্ত সাধক সিদ্ধিলাভ করলেন। এই সিদ্ধপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়ে যারা সাধুজীবন যাপন করতে লাগল, তারাই ক্রমে শিঙাপন্থী সম্প্রদায় নামে এদেশে পরিচিত হয়ে উঠল।

☆ ☆ ☆

গুরুর উপর একান্ত ভক্তি থাকলে, তাঁর মুখ থেকে যদি বিরক্তি সহকারেও কোনো শব্দ বেরিয়ে আসে আর সেটিকেই মন্ত্র ব'লে যদি শিষ্য আঁকড়ে ধরে তাহলে সেই অনর্থক শব্দও সার্থক হয়ে ওঠে এবং তাকে সিদ্ধি এনে দেয়। মূল কথা হল গুরুতে নিষ্ঠা, তিনি ছাড়া আমার কেউ নেই, এই বোধ নিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফোঁস করবে, কামড়াবে না

নারাদ ঋষি বীণা বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে পথ দিয়ে চলেছেন এমন সময় একটা সাপ ফণা তুলে তাঁকে ছোবল মারতে এগিয়ে এল। সাপটাকে ওভাবে আসতে দেখে নারদ তাকে বললেন ঃ "ওরে মূর্খ, আমার উপর হঠাৎ তুই রেগে গেলি কেন? তুই কি জানিসনে, ক্রোধ যে করে তাকে নরকে যেতে হয়? তুই আমার কথা শোন, ক্রোধ ত্যাগ কর, তাতে তোর কল্যাণ হবে।" নারদের কথা শুনে সাপ ফণা নামিয়ে তাঁকে বলল ঃ "ঠাকুর, আমি ক্রোধের বশে অনেক লোককেই যে কামড়েছি, আমার কী গতি হবে? আমাকেও কি তাহলে নরকে যেতে হবে?" নারদ বললেন ঃ "তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি তোকে হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছি, সেই মন্ত্র জপ করতে থাক, তাহলেই সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।" নারদ সাপকে মন্ত্র দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন ঃ "দেখিস, আর কারুর যেন অনিষ্ট করিসনে।"

নারদ চলে গেলে পর সাপ রাস্তার ধারে মড়ার মতো পড়ে রইল আর মনে মনে হরিনাম করতে লাগল। এইভাবে দু-চারদিন কেটে গেল। ছেলের দল একদিন খেলা করতে সেখানে এসে দেখল একটা সাপ মড়ার মতো পড়ে রয়েছে। সেটা মরা না জ্যান্ত ঠিক করতে না পেরে তারা কাঠি দিয়ে সাপটাকে খোঁচা মারতে লাগল। সাপ মন্ত্র নিয়েছে, হিংসা ছেড়ে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাই অতি কষ্টে এই অত্যাচার সহ্য করেও সে স্থির হয়ে পড়ে রইল। ছেলেরা দেখল সাপটা মরেনি, অথচ তাদের দিকে তেড়েও আসছে না। তাই দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেল। তখন কেউ তাকে খোঁচা মারতে থাকে, কেউ ঢ্যালা ছুড়ে মারে, কেউবা তার ল্যাজ ধরে ঘুরপাক দিয়ে মাটিতে আছাড় দেয়। ছেলেদের এইসব অত্যাচারে সাপ ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ল। তখন বাঁচবার আর কোনো উপায় না দেখে অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে সে বনের আড়ালে চলে গেল।

বহুদিন পর নারদ একদিন সেখানে ফিরে এলেন। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখে সাপ আবার পথের ধারে এসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। নারদ কাছে এসে সাপের এই কঙ্কালসার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এত রোগা হয়ে গেলি কী করে?" সাপ বলল ঃ "ঠাকুর, তুমি তো আমাকে কারুর প্রতি ক্রোধ না করতে বলেছ, কাউকে কামড়াতে মানা করেছ। তারই সুযোগ নিয়ে ছেলের দল আমার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে। সেই অত্যাচারেই আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাপের কথা শুনে নারদ বললেন ঃ "কী বোকা রে তুই! আমি তো তোকে ক্রোধ দমন করতে বলেছি, কাউকে কামড়াতে বারণ করেছি, কিন্তু ভয় দেখাবার জন্যে ফোঁস করতে তো বারণ করিনি।, যাইহোক, যা হবার তা হয়েছে, এখন থেকে কেউ তোর কাছে এলেই তুই ফোঁস করে উঠবি। তাতেই কেউ আর তোর কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।" এই বলে নারদ চলে গেলেন।

সাপকে দেখে ছেলেরা আবার তাকে জ্বালাতন করতে এল। কিন্তু এখন তাদের দেখলেই সাপ ফোঁস করে গর্জে ওঠে আর তাই দেখে ছেলের দলও ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ছেলেরা যখন দেখল যে সাপকে নিয়ে আর তাদের খেলা করা চলবে না, তখন তারা প্রাণের ভয়ে সেদিকে আসাই ছেড়ে দিল। সাপও সেই থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে একমনে ভগবানের নাম করতে লাগল।

☆ ☆ ☆

সংসারে থাকতে গেলে নানারকম লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এমন লোকও সংসারে আছে যাদের স্বভাব হল অহেতুক পরের অনিষ্ট করা। তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে সংসারীকে সতর্ক থাকতে হয়, তাদের প্রতি ক্রোধের একটা ভান করতে হয়। তা না হলে সংসারে চলা যায় না, লোকের কাছে মানও থাকে না। তাই মহাজনদের উপদেশ হল এই যে সাপের মতো ফোঁস করবে, কিন্তু কাউকে কামড়াবে না। সে যদি তোমার অনিষ্ট করতে চায়, তাকে বাধা দেবে, ভয় দেখাবে, কিন্তু রাগের মাথায় তার কোনো ক্ষতি করে বোসো না। অহিংসা হওয়া মানে অন্যায় অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, আত্মতেজের দ্বারা, নিজস্ব তেজের আভাস দিয়ে কারো কোনো ক্ষতিসাধন না করে সে অন্যায়কে নিরস্ত করা, দূরে হটিয়ে দেওয়া।

লোভের মুখে ছাই

রাজার কাছে এক সাধু ভিক্ষে চাইতে এসেছেন। সাধুর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁকে সসম্মানে রাজসভায় নিয়ে এসে বললেন ঃ "সাধুজী, আপনি কী চান বলুন, আপনাকে আমার অদেয় কিছু নেই। রাজ্য চান, তাতেও আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।" সাধু হেসে বললেন ঃ "মহারাজ, আমি সাধু, রাজ্য নিয়ে আমি কী করব?" আমার কাছে এই সামান্য একখানা হাড় রয়েছে, এর সমান ওজনের

Dr. Urmila Sharma Collection; Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিছু পেলেই আমি খুশি হব।" সাধুর কথা শুনে রাজার হাসি পেল, তিনি বললেন ঃ "সাধুজী এটার আর কী ওজন করব, কতই বা এর ওজন হবে, আপনি বরং আমার কাছ থেকে বেশি করে কিছু নিয়ে যান।" সাধু তাতে রাজী হলেন না, তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি দাঁড়িপাল্লা আনিয়ে এর সমান ওজনের কিছু আমাকে দিন, তার বেশি আমি আর কিছু নেব না।"

দাঁড়িপাল্লার এক দিকে হাড়খানা রেখে অন্য দিকে রাজা তাঁর রাজকোষের ধন-রত্ন চাপাতে লাগলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল, তবু ওজনে তার হাড়ের সমান হল না, হাড়খানা যেমন ছিল তেমনি নিচেই পড়ে রইল। পাত্র-মিত্র সবাইকে নিয়ে রাজা তখন দাঁড়িপাল্লায় উঠে বসলেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। রাজা তখন হাত জোড় করে সাধুকে বললেন ঃ "সাধুজী, আমি বুঝতে পারছি আপনি কোনো সাধারণ সাধু নন, নিশ্চয় আপনি কোনো সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার কাছে হার স্বীকার করছি। দয়া করে বলুন কিসে আমার সংকল্প পূর্ণ হবে, কোন্ জিনিস দাঁড়িপাল্লায় চাপালে তা ওজনে হাড়ের সমান হবে।" সাধু একটু হেসে বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি একটা কাজ করলেই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আপনি কাউকে বলুন রান্নাঘরে গিয়ে খানিকটা ছাই নিয়ে আসতে।" রাজার হুকুমে একজন লোক দৌড়ে গিয়ে ছাই নিয়ে এল। খানিকটা ছাই নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সাধু তা হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে লাগলেন আর দেখতে দেখতে হাড়ের দিকে পাল্লাটা উপরে উঠে গেল। এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখে রাজা, মন্ত্রী, সভাসদেরা সকলেই অবাক হয়ে গেলেন।

রাজা তখন সাধুকে প্রণাম করে বললেন ঃ "প্রভু, এই অলৌকিক ব্যাপারের কী তাৎপর্য তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।" সাধু বললেন ঃ "রাজা এই যে হাড় দেখছ, এ হল লোভী হাড়। লোভ জিনিসটা অত্যন্ত খারাপ, তাকে তুমি যত জিনিসই দাও না কেন, কিছুতেই তার পেট ভরাতে পারবে না। সে যত পাবে, ততই তার লোভ আরও বেড়ে যাবে। লোভকে শান্ত করার একমাত্র উপায় হল তার মুখে ছাই দেওয়া। সেজন্যই আমি লোভী হাড়ের মুখে ছাই দিয়ে দিলাম। দেখলে তো, তাতেই সে কেমন জব্দ হয়ে গেল, নইলে হাজার জিনিস দিয়েও তুমি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারতে না। দেখো রাজা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে নিতে আসিনি, এসেছি তোমাকে উপদেশ দিতে। লোভ যে কী ভয়ানক জিনিস এখন তো তা দেখলে, তাই বলছি লোভকে কখনো প্রশ্রয় দিয়ো না। আমার এখানকার কাজ শেষ হল, এবার আমি আসি।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

শাস্ত্র বলেন ঃ 'মা গৃধঃ, লোভ কোরো না, কারণ 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ততে, কামনা বা লোভকে কখনো ভোগ দিয়ে, নিরস্ত করা যায় না, সে যত পায় তত চায়। আগুনে ঘি ঢাললে সে আরও দাউ দাউ করে জ্বলেই ওঠে, কখনো নিভে যায় না। তাই তার মুখে ছাই দিতে হয়, অর্থাৎ ভোগ থেকে বঞ্চিত করতে হয়, বৈরাগ্য অভ্যাস করতে হয়। তবেই কামনার, লোভের বা ভোগের আগুন নেভে।

লোভ জব্দ ত্যাগীর কাছে

এক রাজা সাধু-সজ্জনদের খাওয়াতে খুব ভালোবাসেন। শুধু খাওয়ানো নয়, খাওয়ার শেষে প্রত্যেককে তিনি দক্ষিণা-সহ সসম্মানে বিদায় দেন। রাজার ইচ্ছে হল একদিন দেশ-বিদেশের সাধু-সজ্জন, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের তিনি পেট ভরে লাড্ডু খাওয়াবেন এবং প্রতিটি লাড্ডুর জন্যে এক একটি করে টাকা দক্ষিণা দেবেন। রাজার এই সংকল্পের কথা দেশ-দেশান্তরে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল। সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবরা দলে দলে রাজধানীতে এসে জুটল। রাজা তখন এইসব অতিথিদের জন্যে তাদের ইচ্ছেমতো লাড্ডু সরবরাহের হুকুম দিলেন।

প্রতিটি লাড্ডুর জন্যে এক টাকা করে দক্ষিণা, এমন সৌভাগ্য তো কখনো হয় না, তাই লোভে পড়ে যে যত পারে একটার পর একটা লাড্ডু খেয়ে চলল। খেতে খেতে পেটে আর ধরে না, তবু খাওয়ার যেন বিরাম নেই। এদের মধ্যে একটি সাধু যৎসামান্য আহারের পর আচমন করে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন, অনেক সাধ্য-সাধনাতেও আর একটি লাড্ডুও তাঁকে খাওয়ানো গেল না। রাজা নিজে এসে হাত জোড় করে অনুরোধ করলেন ঃ "সাধুজী, আপনি আর দু-চারটে লাড্ডু খান, প্রতি লাড্ডুর জন্যে আপনার এক টাকা করে দক্ষিণা মিলবে।" সাধু বললেন ঃ "রাজামশাই, আমার আচমন হয়ে গিয়েছে, আর তো আমার খাওয়া চলবে না।" রাজা বললেন ঃ "লাড্ডু প্রতি আমি দশ টাকা দক্ষিণা দিচ্ছি, আপনি আরও কটা লাড্ডু খান।" সাধু বললেন ঃ "দশ টাকা কী বলছেন? আমার আচমন হয়ে গিয়েছে, লাখ টাকা দিলেও আমি লাড্ডু খাব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না।'' রাজা তবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন ঃ ''আপনি অন্তত আর একটা লাড্ডু খান, আমি অর্ধেক রাজত্ব আপনাকে দক্ষিণা দেব।'' সাধু এবার বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ ''কেন মিছে জ্বালাতন করছ, বলেছি তো আমার আচমন হয়ে গিয়েছে, তোমার সারা রাজত্ব দিলেও লাড্ডুর একটা দানাও আর আমি মুখে দেব না।'' রাজা তখন রেগে গিয়ে সাধুকে বললেন ঃ ''দেখো সাধু, আমার মতো এমন দাতা তুমি কোথায় পাবে?'' এবার সাধু, হেসে ফেলে বললেন ঃ ''আরে রাজা, আমার মতো ত্যাগীও তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। তুমি দাতা হতে পারো, কিন্তু আমি হলাম ত্যাগী। তুমি নিজেকে দাতা বলে বড়াই করছ, কিন্তু এ বড়াই করা চলে কার কাছে? যে গ্রহণ করে তার কাছে। ত্যাগীর কাছে এসব অহংকার শোভা পায় না।'' এই বলে সাধু সেখান থেকে চলে গেলেন।

☆ ☆ ☆

গল্পটিতে একদিকে দেখা গেল ত্যাগের মহিমা, আর অন্যদিকে সংকল্পের দৃঢ়তা, হাজারো প্রলোভনেও যাকে টলানো গেল না। যার মধ্যে যথার্থ ত্যাগ ফুটে উঠেছে তার যাচাই হয় এইভাবেই। সমস্ত ভোগের উপকরণ তার সামনে সাজানো, বার বার তার কাছে অনুরোধ-উপরোধ আসছে তা ভোগ করবার জন্যে, তবে সে সেদিকে দৃক্‌পাতও করে না। ভোগী রাজাও এইভাবে হার মানেন ত্যাগী সাধুর কাছে, ভোগের দিকে তাঁকে টেনে আনতে পারেন না কিছুতেই, উল্‌টে নিজেকে মস্তবড়ো দাতা ব'লে তাঁর মিথ্যা অভিমান ও অহংকার, তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ভারতবর্ষ তাই চিরকালই বলে এসেছে, ত্যাগের দ্বারাই অমৃত্ব লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নয়—'ত্যাগেন অমৃতত্বমানশূঃ'।

বন্দী সিংহ

এক ব্রাহ্মণ বনের পথ ধরে চলতে চলতে দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড সিংহ খাঁচায় বন্দী হয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণকে দেখে সিংহ কাতর স্বরে বলল ঃ ''ঠাকুরমশাই দয়া করে আমাকে প্রাণে বাঁচাও, আমি চিরকাল তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।'' ব্রাহ্মণ প্রাণের ভয়ে কাছে না গিয়ে দূর থেকেই সিংহকে বলল ঃ ''আমি খাঁচা খুলে তোমাকে বের করে দিলেই তো তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে, ও আমি পারব না।'' সিংহ বলল ঃ ''সে কী কথা! তুমি আমার ভালো করবে, প্রাণ বাঁচাবে, আর আমি তোমার মন্দ করব,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ-ও কি সম্ভব? আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কোনো অনিষ্টই আমি করব না।"

বোকা ব্রাহ্মণ ভাবল, সিংহ যখন প্রতিজ্ঞা করছে, তখন নিশ্চয়ই সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবে, আমার কোনো ক্ষতি সে করবে না। এই ভেবে সে কাছে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিল। জাতের স্বভাব যাবে কোথায়? ছাড়া পেয়েই সিংহ ভীষণ গর্জন করে ব্রাহ্মণকে বলল ঃ "আমি অনেকদিন অনাহারে রয়েছি, আমি ক্ষুধার্ত। আহারের সন্ধানে কোথায় আর এখন ঘুরে মরব, তার চেয়ে তুমি যখন সামনেই রয়েছ আর তোমার সঙ্গে যখন আমার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, তখন তোমাকে খেয়েই এখন পেট ভরানো যাক।" ব্রাহ্মণ ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সিংহকে বলল ঃ "সিংহ ভাই, আমি তোমার উপকার করলাম, আর তুমি আমার অনিষ্ট করবে?" সিংহ বলল ঃ "সেইটাই তো সংসারের রীতি। সংসারে কেউ কারুর ভালো করলে উল্‌টে সে তার অপকারই করে।" ব্রাহ্মণ বলল ঃ "তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করতে পারল্যাম না। আমি তিনজনকে সাক্ষী মানতে চাই। সাক্ষীরা যদি বলে তোমার কথাই ঠিক, তখন না হয় তুমি আমাকে খেয়ো।"

ব্রাহ্মণ আর সিংহ একটা গাছের কাছে গেল। ব্রাহ্মণ গাছকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ওহে গাছ, তুমি বলো দেখি, যদি কেউ কারুর উপকার করে তাহলে সে কি কখনো তার অনিষ্ট করতে পারে?" গাছ হেসে বলল ঃ "হ্যাঁ ভাই, সংসারের নিয়মই তো তাই। এই আমাকেই দেখো না, মানুষের কত উপকার করছি আমি। তাদের আমি ফুল দিই, ফল দিই, ছায়া দিয়ে রোদের তাপ থেকে তাদের বাঁচাই, আর তার বদলে বেইমান মানুষ আমার সঙ্গে কী নিষ্ঠুর ব্যবহারই না করে। তারা আমার ডাল ভাঙে, নির্মমভাবে কুড়ুল দিয়ে আঘাত ক'রে আমায় যে কত কষ্ট দেয় তা আর কী বলব। তাহলেই বুঝে দেখো, সংসারে কারুর ভালো করতে গেলে মন্দটাই পেতে হয়।" গাছের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ বলে উঠল ঃ "দেখলে তো ঠাকুর, আমার কথা ঠিক কিনা, এবার তাহলে তোমাকে খেতে পারি।" ব্রাহ্মণ বলল ঃ "একজন সাক্ষী তোমার কথায় সায় দিয়েছে, এখনো দুজন বাকি। তুমি আর একটু অপেক্ষা করো।"

এবার তারা গেল এক সরোবরের কাছে। ব্রাহ্মণ সরোবরকে সেই একই প্রশ্ন করলে সরোবর বলল ঃ "উপকারীর অপকার করাই তো মানুষের রীতি। দেখো না কেন, আমার জলে স্নান ক'রে তারা আরাম পায়, শরীর ঠাণ্ডা রাখে, আমার জল খেয়ে প্রাণে বাঁচে, অথচ সেই আমারই জলে তারা যত আবর্জনা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মল-মূত্র ধুয়ে আমার জলকে নোংরা করে তুলছে।" সিংহ বলল ঃ "ঠাকুর, এখন আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হল তো?" ব্রাহ্মণ বলল ঃ "আমার এখনো এক সাক্ষী বাকি রয়েছে, সে তোমার কথায় সায় দিলেই তুমি আমাকে খেতে পারবে। তখন আর আমি আপত্তি করব না।"

এবার ব্রাহ্মণের সাক্ষী হল এক শেয়াল। ব্রাহ্মণ আর সিংহের কাছ থেকে সব ব্যাপারটা শুনে নিয়ে শেয়াল ব্রাহ্মণকে বলল ঃ "ঠাকুরমশাই, আপনার প্রশ্নের জবাব আমি পরে দেব, কিন্তু আপনি সামান্য মানুষ হয়ে পশুরাজ সিংহকে উদ্ধার করেছেন, এটাই যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে। আপনি যদি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন সিংহ কীভাবে বন্দী হয়ে খাঁচার মধ্যে ছিল, কিভাবেই বা আপনি তাকে উদ্ধার করলেন, তবেই আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করতে পারি, নইলে, নয়।"

শেয়ালের কথা শুনে তিনজনেই তখন খাঁচার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। খাঁচা দেখে শেয়াল বলল ঃ "এ যে অসম্ভব ব্যাপার দেখছি। এতটুকু খাঁচায় পশুরাজের অতবড়ো দেহখানা ঢুকতে পারে, সেটাই তো আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে।" শেয়ালের বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে সিংহ খাঁচার মধ্যে ঢুকে শেয়ালকে বলল ঃ "এই দেখো, এইভাবে আমি খাঁচায় বন্দী ছিলাম।" শেয়াল বলল ঃ "খাঁচার দরজা তো বন্ধ হয় না দেখছি, তবে তুমি বন্দী ছিলে বলছ কী করে?" সিংহ তখন ব্রাহ্মণকে বলল ঃ "তুমি একবার দরজাটা বন্ধ করে শেয়ালকে দেখিয়ে দাও তো যে সত্যিই আমি খাঁচায় বন্দী ছিলাম।" সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ খাঁচার দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল। শেয়াল তখন ব্রাহ্মণকে বলল ঃ ঠাকুরমশাই, আপনি এত বোকা আপনার জানা উচিত ছিল যে সিংহ আপনার যজমান নয় যে আপনি তাকে যা বলবেন সে তাই শুনবে। আপনি খুব বেঁচে গেলেন। যান, এবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যান।

☆ ☆ ☆

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির অসীম ক্ষমতা, সিংহের মতোই তারা বলবান। উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়রূপী সিংহ মানুষের সদ্‌বৃত্তিরূপী ব্রাহ্মণকে ধ্বংস করে ফেলে তাই তাদের খাঁচায় বন্দী করতে হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়দের একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে হয়। জোর-জবরদস্তি করে তা করা যায় না, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কৌশলের দ্বারা তাদের বশীভূত করা যায়। গল্পের শেয়াল হল মন ও বুদ্ধির প্রতীক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রিয়দের ধ্বংস করে ফেললে সংসারের কাজ চলে না, তাই আমাদের কতর্ব্য হল তাদের সংযত করা। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নয়, দরকার ইন্দ্রিয় সংযম। প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখতে চেষ্টা করে। যোগী যোগপথ অবলম্বন করেন, জ্ঞানী অবলম্বন করেন বিচারের পথ, কর্মী তাঁর কাজের মধ্যে ইন্দ্রিয়দের নিয়োজিত করেন আর ভক্ত ও প্রেমিক যাঁরা, তাঁরা ভগবানের সেবায় ইন্দ্রিয়দের নিযুক্ত রেখে দেন।

এছাড়া গল্পে এ শিক্ষাও দেওয়া হল যে জগতের স্বাভাবিক রীতিই হল উপকারের বদলে অপকার করা। গাছ ও সরোবর মুখ বুঁজে কেবল উপকারই করে যায়। তারা তো কোনো প্রতিবাদ করবে না, তাই জেনে নির্বিবাদে সকলে তাদের অপকারই করে যায় উপকারের বিনিময়ে। শেয়ালের মতো যার বুদ্ধি ফুটেছে, সে-ই তাদের অপকারের প্রতিশোধ নিতে পারে। তাই বলা হয় ঃ 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। অন্য মানুষের হিংস্র স্বভাব সম্বন্ধে সজাগ থেকে কেমনভাবে না ঠকে জীবনে চলতে হয়, গল্পটিতে এই জাগতিক শিক্ষাও যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি এতে এই পারমার্থিক শিক্ষাও পাই যে কৌশলে কেমন করে ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু

রাজা-রানীর বয়স হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁদের কোনো সন্তানাদি হয়নি, তাই তাঁদের মনে সুখ নেই। ঠাকুর-দেবতার দুয়োরে ধরনা দিয়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে সাধু-সন্যাসীদের সেবা করে অবশেষে সকলের আশীর্বাদে তাঁদের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে হল। রাজা-রানীর মনে আনন্দ ধরে না। তাঁরা দেশের বড়ো বড়ো দৈবজ্ঞদের ডেকে মেয়ের জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করালেন, কিন্তু জন্মকুণ্ডলী দেখে তাঁদের সব আনন্দ মন থেকে মুছে গেল। দৈবজ্ঞরা বললেন মেয়ের কপালে অকালবৈধব্যের যোগ রয়েছে।

রাজা স্থির করলেন মেয়ের বিয়ে দেবন না। তিনি শ্বেতপাথরের এক মন্দির তৈরি করিয়ে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর কষ্টিপাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। মেয়ে যখন একটু বড়ো হল তখন রাজা তাকে বললেন ঃ "মা, এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তোমার স্বামী, তুমি মনপ্রাণ দিয়ে এঁর সেবা কোরো।" এই বলে তিনি তাকে পূজোর মন্ত্র ও পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বালিকা মনের আনন্দে তার এই দেবতা-স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করল।

এইভাবে দিন যায়। রাজকুমারী এখন বালিকা বয়স অতিক্রম করেছে, দু-চারজন সঙ্গিনীও জুটেছে তার। সখীদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা নিজেদের স্বামী সম্বন্ধে নানারকম গল্প করে তার কাছে। তাদের সেইসব গল্প শুনে রাজকুমারী ভাবতে থাকে, ওদের স্বামীরা ওদের কত ভালোবাসে, কত কথা কয় ওদের স্বামীদের মতো আমার স্বামী তো আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন না, ওদের স্বামীদের মতো আমাকে তো আদরও করে না। রাজকুমারী সরল অন্তঃকরণ দুঃখে ভরে গেল। একদিন সে ফুলের মালা বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে সজল কণ্ঠে বলল ঃ "ঠাকুর, তুমি আমার স্বামী, তবে কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না, কেন আমাকে আদর করো না? আমার সেবায় কি কোনো ত্রুটি হয়েছে? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? তুমি বলে দাও কী করলে তুমি সুখী হবে, আমি সেইভাবেই তোমার সেবা করব। ঠাকুর, তুমি চুপ করে থেকো না, কথা কও, কথা কও।"

পাষাণ বিগ্রহ পাষাণের মতোই নীরব হয়ে রইল, কোনো কথাই শোনা গেল না বিগ্রহের মুখ থেকে। চোখের জলে রাজকুমারী পূজো শেষ করে ভোগ ধরে দিল বিগ্রহের সামনে, কিন্তু নিজে সে প্রসাদ গ্রহণ করল না, অনাহারে, অভিমানে দেবতার পায়ের কাছে পড়ে রইল। এইভাবে সাত দিন সাত রাত কেটে গেল। দুঃখে রাজকুমারীর বুক ফেটে যাচ্ছে, ঠাকুর এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম। এই নিশ্ছিদ্র নীরবতার পাষাণভার অভিমানিনী আর সহ্য করতে পারে না। সে স্থির করল আর পূজো নয়, যেমন করে হোক ওঁকে আমি জব্দ করবই, দেখি কেমন করে উনি আমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারেন।

বাজার থেকে খানিকটা তুলো আনিয়ে রাজকুমারী নিজের কাছে রেখে দিল, তারপর ঠাকুরের পূজো সেরে ভোগ নিয়ে মিনতির স্বরে বলল ঃ "স্বামী, এখনো তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না? তবে শোনো, যদি কথা না বলো তবে তোমার এমন অবস্থা করব যে তখন চুপ করে থাকার ফল তুমি বুঝতে পারবে।" পাষাণ দেবতা তখনো নিরুত্তর। তাই দেখে রাজকুমারী বলল ঃ "তবু চুপ করে রইলে? বেশ, তবে আমার অপরাধ নিয়ো না, শুধু দেখে যাও আমি কী করি।" এই বলে খানিকটা তুলো নিয়ে রাজকুমারী বিগ্রহের নাকে গুঁজে দিতে গেল। তার ইচ্ছেটা, নাক বন্ধ করলেই দম নেবার জন্যে ঠাকুরকে বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হবে। যেই না সে নাকের কাছে তুলো নিয়ে গিয়েছে অমনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাষাণ দেবতা সজীব হয়ে রাজকুমারীর দুহাত ধরে বললেন ঃ "সখী, এ কী করছ তুমি? দম বন্ধ হয়ে আমি যে মরে যাব।"

শোনামাত্র রাজকুমারী ঠাকুরের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বলল ঃ "হে নিষ্ঠুর, এতদিনে তোমার কথা বলবার সময় হল, আগে কেন কথা কওনি ঠাকুর?" ভগবান বললেন ঃ "প্রিয় সখী আমার, এতদিন যে তোমার বিশ্বাসে ত্রুটি ছিল, তাইতো আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। পাষাণ বিগ্রহ হলেও আমি যে সজীব, আমারও যে প্রাণ আছে, একথা এতদিন তো তুমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারনি। আজ তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে বলেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে পাষাণ হলেও আমি চিন্ময়। তাইতো তুমি আমার দম বন্ধ করে আমাকে কথা বলাতে চেয়েছিলে। তোমার এই অকপট বিশ্বাসের জন্যেই আমি কথা না বলে থাকতে পারলাম না। সখী, কেন আমাকে নিষ্ঠুর বলে অপবাদ দিচ্ছ? মানুষ আমাকে যেমনভাবে গড়ে তোলে, আমিও যে সেইভাবেই তার কাছে ধরা দিই। আজ তোমার হৃদয়ের মধ্যে তুমি আমাকে সজীব করে তুলেছ, তাইতো আমি তোমার কাছে সজীব হয়ে উঠলাম।" এই বলে ভগবান দুহাত দিয়ে রাজকুমারীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

☆ ☆ ☆

আমরা যে বিগ্রহের সেবা-পূজা করে থাকি, তা পাথর দিয়ে গড়া বা কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি। তার উপাদান তাই জড়, কাদা মাটিতে গড়া প্রতিমার মতো। জড়বস্তুতে তৈরি এই প্রতিমা বা বিগ্রহের মধ্যে কোনো প্রাণ নেই বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু তাতে যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে যখন দেবতা এসে অধিষ্ঠান করেন, তখন যে তা চিন্ময় হয়ে ওঠে, তা আমরা খেয়াল করি না। মনে মনে দেবতা বলে বিশ্বাস করলেও বিগ্রহটি সজীব বা প্রাণবন্ত, তা আমরা ভাবতে পারি না, তাই দেবতাকে ডেকেও আমরা কোনো সাড়া পাই না। মীরাবাঈ বা মহাপ্রভুর মতো যাঁরা, তাঁরাই গিরধরলালের মূর্তিতে বা জগন্নাথের কাঠের প্রতিমাতে সাক্ষাৎ তাঁকে দর্শন করে থাকেন। এ যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণের ভবতারিণী পূজায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবায় এই পাষাণ-প্রতিমায় তাঁর সাক্ষাৎ সাড়া দেওয়ার অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য মেলে। মূল কথা হল সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিকী ভক্তি। তাই বলা হয় ঃ "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'। গল্পটিতে আমরা দেখলাম সরল বিশ্বাসের কাছে তাঁকে হার মানতেই হয়, শেষে সাড়া দিতেই হয়, যদিও আমাদের কাছে তা একান্ত অসম্ভব বা আজগুবি মনে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কপাল ভাঙলে সব যায়

এক বুড়ীর সাত ছেলে, কিন্তু বুড়ীর এমনই কপাল যে একে একে তার সাতটা ছেলেই মরে গেল। বুড়ী ঠিক করল যে সে যমরাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে কেন তিনি তার সাতটা ছেলেকেই নিয়ে নিলেন। তার নিজের দু-একটিকে নিয়ে যাদের ঘরে বেশি ছেলে রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে দু-একটি করে নিলেও তো পারতেন। এই ভেবে বুড়ী যমরাজের কাছে হাজির হয়ে বলল ঃ "ধর্মরাজ, এ তোমার কেমন বিচার, আমার সাত সাতটা ছেলেকেই তুমি নিয়ে নিলে? কেন, আর কি কারুর ছেলে ছিল না? আমার দু-একটিকে নিয়ে অন্য ঘর থেকেও না হয় দু-একটি করে নিতে। কেন আমার উপর এত অবিচার করলে তার জবাব দাও, নইলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।" যমরাজ বুড়ীকে বললেন ঃ "বুড়ীমা, একটু স্থির হও। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু বিশ্রাম করে সামনের ঐ পুকুরটাতে স্নান করে এসো। পাশে ঐ যে ঘরখানা দেখছ, ওখানে অনেক মিষ্টি রয়েছে, স্নান করে, ইচ্ছেমতো মিষ্টি খেয়ে তুমি আবার আমার কাছে এসো, তখন আমি তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো।"

যমরাজের কথামতো পুকুরে স্নান করে বুড়ী খাবার ঘরে ঢুকে দেখল সেখানে থরে থরে মিষ্টির হাঁড়ি সাজানো রয়েছে। সবকটা হাঁড়িই মিষ্টিতে ভরতি, কেবল একটা হাঁড়ি প্রায় খালি, তাতে কয়েকটা মাত্র মিষ্টি পড়ে রয়েছে। বুড়ী ভাবল ভরা হাঁড়ি আর ভাঙি কেন, এই হাঁড়িতে যা মিষ্টি রয়েছে তাতেই আমার পেট ভরে যাবে। এই ভেবে ভরা হাঁড়ি না ভেঙে খোলা হাঁড়িতে যে কটা মিষ্টি ছিল বুড়ী তা খেয়ে নিল আর তাতেই তার পেট ভরে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে পর বুড়ী আবার যমরাজের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল কেন তিনি তার সাতটি ছেলেকে গ্রাস্ করেছেন। বুড়ীর প্রশ্ন শুনে যমরাজ বললেন ঃ "বুড়ীমা, পরে আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, আগে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। ঘরে তো মিষ্টি ভরতি অতগুলো হাঁড়ি ছিল, তা সত্ত্বেও সেসব হাঁড়ি থেকে মিষ্টি না নিয়ে তুমি খোলা হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেলে কেন?" বুড়ী বলল ঃ " ভরা হাঁড়ি আমি ভাঙতে যাব কেন বাবা? খোলা হাঁড়িতে যে ক'টা মিষ্টি ছিল তাতেই আমার পেট ভরে গেল, তাই আর ভরা হাঁড়ি ভাঙিনি।" যমরাজ বললেন ঃ "দেখো বুড়ীমা, তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি নিজেই কিন্তু বলে দিলে। তুমি যেমন ভরা হাঁড়ি ভাঙোনি, আমিও তেমনি ভরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘর ভাঙিনে, ভাঙা ঘরকেই আমি ভেঙে দিই।”

☆ ☆ ☆

বিশ্ববিধানের রহস্য বড়ো বিচিত্র, যুক্তি দিয়ে তাকে সব সময় বোঝা যায় না। সংসারে দেখা যায় যখন কোনো মানুষের কপাল ফেরে, তখন সব দিক দিয়েই তার বাড়-বাড়ন্ত হতে থাকে। টাকা-পয়সা, নাম-যশ, সাংসারিক সুখ-শান্তি সব যেন আপনা থেকেই তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। আবার কপাল যখন ভাঙে, তখন সব দিক দিয়েই মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। পুত্রশোক, বিত্তনাশ, ব্যাধির আক্রমণ, সাংসারিক অশান্তি, সব যেন একসঙ্গে চারিদিক থেকে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই কথায় বলে, দুর্ভাগ্য কখনো একলা আসে না। বিধাতার এই বিচিত্র বিধানের কার্যকারণ নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন একমাত্র অদৃষ্ট বা প্রারব্ধেই দোহাই দেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো গতি থাকে না।

গ্রহের ফের

নারদ ঋষি বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন ভগবান বিষ্ণু শুয়ে রয়েছেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁর পদসেবা করছেন। নারদ ব্যস্ত হয়ে বিষ্ণুকে বললেন ঃ “প্রভু, আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে রয়েছেন, এদিকে যে আপনার ঘোর বিপদ উপস্থিত, শনিগ্রহ এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। শনির কোপ তো আপনি জানেন, বারো বছর না ভুগিয়ে সে ছাড়ে না।” নারদের কথা শুনে বিষ্ণু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভেবে ভেবে একটা উপায় স্থির করে তিনি নারদকে বললেন ঃ “দেখো নারদ, শনির কোপ এড়াতে আমি না হয় এক কাজ করি। বারো বছর আমি পাথর হয়ে বসে থাকব, তাহলেই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বারো বছর কেটে গেলে পর আবার আমি বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করব।”

বারো বছর বিষ্ণু পাথর হয়ে রইলেন। গ্রহের ফের কেটে যাবার পর তিনি শনিগ্রহকে ডেকে বললেন ঃ “কিগো শনিঠাকুর, তুমি তো আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারলে না।” শনি হেসে বললেন ঃ “প্রভু, আপনি স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান হয়ে আমার ভয়ে যে বারো বছর পাথর হয়ে রইলেন, তাতেই তো আমার কাজ সিদ্ধ হল। আপনি আগে থাকতেই তো বারো বছর পাথর হয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বসে থেকে আমার কোপের সময়টা স্থির করে দিলেন।" বিষ্ণুও তখন হাসতে হাসতে বললেন ঃ "হ্যাঁ, তা তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি গোলকপতি হয়েও তোমার ভয়ে পাথর হয়ে রইলাম। পাথর হবার বুদ্ধিটা আমাকে যোগাল কে? এখন বেশ বুঝতে পারছি যে প্রথমেই তুমি আমার বুদ্ধিটাকে নষ্ট করে দিয়েছিলে, তাইতো আগে থাকতে পাথর হয়ে আমিই তোমার কোপের কাল নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম।"

☆ ☆ ☆

গ্রহের প্রভাব কেউ এড়াতে পারে না, ভগবানের পর্যন্ত তা থেকে নিস্তার নেই। গ্রহশান্তির জন্যে মহাজনেরা তাই গ্রহদেবতার পূজো, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। তাতে রুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হন। মানুষের শুভাশুভ কর্মই তার সুখ-দুঃখের কারণ, নইলে গ্রহদেবতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো কাউকে সুখ-দুঃখ দিতে পারেন না। তাই মানুষকে সর্বদা শুভ চিন্তা নিয়ে থাকতে হয়। জ্ঞানী হোক, অজ্ঞানী হোক, সকলের ক্ষেত্রেই পাপের ফল যথাসময়ে ফলবে, কেউ তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। ভোগের কাল প্রত্যেকের নির্দিষ্ট হয়েই আছে, তা বারো বছরই হোক আর বারো দিনই হোক। সেই কালটুকু ভোগ ভুগতেই হবে, কাল পূর্ণ হলে ভোগ থেকে মুক্তি, সংসার থেকে ছুটি। সব সময় তাই কালের মুখ চেয়ে থাকতে হয়, 'কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃত্যকো যথা'— ভৃত্য যেমন মনিবের নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনি কালের নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে হয়। বিশ্বে সবকিছু যিনি ঘটাচ্ছেন, সৃষ্টিতে এই কালই সেই ভগবানের অনুস্যূত সর্বাত্মক রূপ।

সাধু মহাত্মার কুষ্ঠব্যাধি

পরম তপস্বী মহাজ্ঞানী এক মহাত্মার অনেক শিষ্য। শিষ্যরা গুরুর কাছে থাকে, তাঁর সেবা করে এবং তাঁর নির্দেশে সাধন-ভজনে নিরত থেকে পরম আনন্দে দিন কাটায়।

একদিন গুরুদেব ধ্যানে বসে দেখলেন এক বীভৎস ছায়ামূর্তি তাঁর সামনে ঘোরাফেরা করছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে তুমি? কী চাও এখানে?" ছায়ামূর্তি বলল ঃ "প্রভু, আমি কুষ্ঠব্যাধি। বারো বছরের জন্যে আপনার শরীরে আমি অধিষ্ঠান করব, কিন্তু আপনার এই পুণ্য শরীরে প্রবেশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতে আমি সাহস পাচ্ছিনে।" মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তবে এখন তুমি কি করবে?" ছায়ামূর্তি বলল ঃ "অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। আপনার মতো তপস্বীর দেহে আমি প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু আমার হাত থেকে আপনি নিস্তার পাবেন না, কুষ্ঠরোগ ভোগ করবার জন্যে দেহান্তে আবার আপনাকে জন্ম নিতে হবে।" মহাত্মা বললেন ঃ "তুমি যখন আমাকে ছাড়বেই না বলছ, তখন আর পরের জন্মের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ কী? তুমি আমার এই দেহটাকে আক্রমণ করো। আমি সাধন-ভজন সব ত্যাগ করছি, তাতেই আমার যা-কিছু তেজ, যা-কিছু পুণ্য সব নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তুমি অনায়াসে আমার দেহটাকে আক্রমণ করতে পারবে। আমি এখন কাশীধামে চললাম। মণিকর্ণিকার ঘাটে এক কুটীর বানিয়ে তাতেই থাকব, তুমি সেখানে গিয়ে আমার দেহে ভর কোরো।"

ছায়ামূর্তিকে তখনকার মতো বিদায় দিয়ে মহাত্মা শিষ্যদের ডেকে বললেন ঃ "আমি আজই কাশী চলে যাব, তোমরা এখানেই থাকো আর যেমন সাধন-ভজন করছ তেমনি করে যাও।" গুরুর কথা শুনে শিষ্যরা হায় হায় করে উঠল ঃ "কেন আপনি আমাদের অনাথ করে চলে যাচ্ছেন? আমাদের কি কোনো অপরাধ হয়েছে? আপনি গেলে কে আমাদের দেখবে? না গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারব না, আপনি যেখানেই যান না কেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।" শিষ্যদের নিবৃত্ত করতে গুরু অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। শিষ্যরা গুরুর সঙ্গে সঙ্গে কাশীধামে এসে পৌঁছল।

মহাত্মা মণিকর্ণিকার ঘাটে কুটীর নির্মান করে তাতে বাস করতে লাগলেন। স্নান, দান, সন্ধ্যাবন্দনা, সাধন-ভজন কিছুই আর তিনি করেন না। তাই দেখে শিষ্যরা মনে করল গুরুদেব বুঝি আচারভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। তারা তাঁকে ত্যাগ করে দলে দলে চলে যেতে লাগল, দু-চারজন মাত্র রয়ে গেল তাঁর কাছে। এইভাবে আপন ইচ্ছায় ভ্রষ্টাচার হওয়ার দরুন মহাত্মার সাধনলব্ধ তেজ ক্ষয় হয়ে গেল এবং সুযোগ বুঝে কুষ্ঠব্যাধি তখন তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। গুরুকে গলিতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হতে দেখে দু-চারজন শিষ্য যারা তখনো তাঁর কাছে ছিল, তারাও একে একে সরে পড়ল, কেবল একটিমাত্র শিষ্য গুরুকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী হল না। মহাত্মা তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন, কিন্তু শিষ্য গুরুর কথা শুনল না, সে প্রাণপণ যত্নে গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করল। এদিকে ব্যাধির প্রকোপ ভয়ানক বেড়ে গেল, কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরুর প্রতি শিষ্যের নিষ্ঠা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ঘৃণা ভয় সব ত্যাগ করে সে আগেকার মতোই অনলসভাবে গুরুর শুশ্রূষা করে যেতে লাগল।

শিষ্যের এই ঐকান্তিক পরিচর্যায় গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু একদিন পরীক্ষাচ্ছলে শিষ্যকে পদাঘাত করে তিনি কপট ক্রোধ দেখিয়ে বললেন ঃ "দূর হয়ে যাও এখান থেকে। তোমাকে কে বলেছে আমার সেবা করতে? এখুনি আমার সামনে থেকে বিদেয় হও।" শিষ্য হাত জোড় করে বলল ঃ "গুরুদেব, আপনার কাছে যে আর কেউ নেই, আমি চলে গেলে কে আপনার সেবা করবে? এমন নিষ্ঠুর আদেশ আপনি করবেন না, আপনাকে এমন অবস্থায় ফেলে রেখে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।" শিষ্যের গুরুভক্তি দেখে মহাত্মা মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তাঁর সেই কপট ক্রোধের মূর্তি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

একদিন গুরুদেবের সেবা পরিচর্যার পর শিষ্য গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে। অদূরে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হর আর পার্বতী। শিষ্যকে দেখে পার্বতী মহাদেবকে বললেন ঃ "দেবাদিদেব, গুরুগতপ্রাণ এই শিষ্যকে তোমার বর দেওয়া উচিত।" মহাদেব হেসে বললেন ঃ " তুমিই কেন ওকে বর দাও না পার্বতী।" ছদ্মবেশী পার্বতী শিষ্যকে কাছে ডেকে বললেন ঃ "কুষ্ঠরোগী গুরুকে নিয়ে দিনরাত পড়ে রয়েছ কেন? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? যা ছোঁয়াচে রোগ, তোমারও তো ঐ রোগ হতে পারে। নিজের ভালো চাও তো পালিয়ে যাও।" পার্বতীর কথা শুনে শিষ্য রেগে গিয়ে বলল ঃ "কে তুমি? কেন তুমি আমাকে এমন অধর্মের কথা শোনাচ্ছ?" পার্বতী বললেন ঃ "রাগ করছ কেন? আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।" শিষ্য বিরক্ত হয়ে বলল ঃ "তোমাকে আমার ভালো করতে হবে না, অমন বাজে কথা আর মুখে এনো না।"

নানাভাবে পার্বতী শিষ্যকে পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু গুরুভক্ত এই শিষ্যের নিষ্ঠা তাকে একটুও টলাতে পারলেন না। তখন তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে শিষ্যকে বললেন ঃ "বৎস, তোমার গুরুভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার কাছ থেকে তুমি ইচ্ছেমতো বর চেয়ে নাও।" শিষ্য বলল ঃ "মা, তুমি যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকো তাহলে আমার গুরুদেবকে রোগমুক্ত করে দাও।" দেবী বললেন ঃ "তথাস্তু। আজই তোমার গুরু রোগমুক্ত হয়ে দিব্যকান্তি ধারণ করবেন। বৎস, তোমার মতো গুরুনিষ্ঠা জগতে দুর্লভ। তুমি বলো তুমি কি চাও। স্বর্গ হোক, মোক্ষ হোক, যা তুমি চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব।" শিষ্য বলল ঃ "মা, স্বর্গ মোক্ষ কিছুই আমি চাইনে, শুধ্ এই বর দাও যেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিরকাল গুরুদেবের চরণসেবায় আমি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি। আমার অন্য কোনো কামনা নেই।"

দেবীর বরে মহাত্মা রোগমুক্ত হলেন। সেইসঙ্গে বারো বছরও পূর্ণ হয়ে গেল। দেবীর আশীর্বাদে সদ্‌গুরু ও তাঁর নিষ্কাম শিষ্য পরম শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দেহান্তে কৈলাসধামে গমন করলেন।

☆ ☆ ☆

এই গল্পটিতে একদিকে যেমন দেখানো হয়েছে যে প্রারব্ধকে খন্ডন করা যায় না, তেমনি অপরদিকে নিষ্কাম ভক্তের আদর্শ গুরুভক্তির রূপটিও এখানে উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা ঘটবার তা ঘটবেই। দেহের নানা নিদারুণ ভোগ সাধু-মহাত্মা নির্বিশেষে সকলকেই ভুগতে হয়। কিন্তু সব দুঃখের মধ্যেও যে-শিষ্য গুরুসেবায় তাঁর পরিচর্যার পরম ভক্তিতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, সেই আদর্শ শিষ্যই শেষ অবধি মুক্তিলাভ ক'রে ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

জেলের বৈরাগ্য

এক জেলে মাছ ধরছে এমন সময় সে দেখতে পেল একদল সেপাই হইহই করে ছুটে আসছে। জেলে জানত এই সেপাইরা যাকে হাতের কাছে পায়, তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটায়, কাজ করে কেউ তাদের কাছে থেকে একটা পয়সাও আদায় করতে পারে না। জেলে ভাবল, আমাকে দেখতে পেলেই তো ওরা এসে ধরবে, এখন ওদের হাত থেকে বাঁচি কী করে? হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তাড়াতাড়ি তার জাল গুটিয়ে নিয়ে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে ধুলো নিয়ে বেশ করে গায়ে মেখে নিল। তারপর রাস্তার ধারে সাধুদের মতো চোখ বুঁজে বসে রইল।

সেপাইরা হাঁকডাক করতে করতে সেখানে এসে দেখে এক সাধু বসে রয়েছে। সাধুকে দেখে তারা প্রত্যেকে একটা করে টাকা তার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে চলে গেল। জেলে যখন বুঝল যে ধারে কাছে কেউ নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন সে আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখল তার সামনে একগাদা টাকা পড়ে রয়েছে। গরীব বেচারার তখন মনে হতে লাগল, আমি সাধুর ভান করে বসেছিলাম, তাতেই আমার পায়ের কাছে এতগুলো টাকা এসে পড়ল। যদি সত্যিকারের সাধু হতে পারতাম, তাহলে না জানি কী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফোঁস করবে, কামড়াবে না

নারদ ঋষি বীণা বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে পথ দিয়ে চলেছেন এমন সময় একটা সাপ ফণা তুলে তাঁকে ছোবল মারতে এগিয়ে এল। সাপটাকে ওভাবে আসতে দেখে নারদ তাকে বললেন ঃ "ওরে মূর্খ, আমার উপর হঠাৎ তুই রেগে গেলি কেন? তুই কি জানিসনে, ক্রোধ যে করে তাকে নরকে যেতে হয়? তুই আমার কথা শোন, ক্রোধ ত্যাগ কর, তাতে তোর কল্যাণ হবে।" নারদের কথা শুনে সাপ ফণা নামিয়ে তাঁকে বলল ঃ "ঠাকুর, আমি ক্রোধের বশে অনেক লোককেই যে কামড়েছি, আমার কী গতি হবে? আমাকেও কি তাহলে নরকে যেতে হবে?" নারদ বললেন ঃ "তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি তোকে হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছি, সেই মন্ত্র জপ করতে থাক, তাহলেই সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।" নারদ সাপকে মন্ত্র দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন ঃ "দেখিস, আর কারুর যেন অনিষ্ট করিসনে।"

নারদ চলে গেলে পর সাপ রাস্তার ধারে মড়ার মতো পড়ে রইল আর মনে মনে হরিনাম করতে লাগল। এইভাবে দু-চারদিন কেটে গেল। ছেলের দল একদিন খেলা করতে সেখানে এসে দেখল একটা সাপ মড়ার মতো পড়ে রয়েছে। সেটা মরা না জ্যান্ত ঠিক করতে না পেরে তারা কাঠি দিয়ে সাপটাকে খোঁচা মারতে লাগল। সাপ মন্ত্র নিয়েছে, হিংসা ছেড়ে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাই অতি কষ্টে এই অত্যাচার সহ্য করেও সে স্থির হয়ে পড়ে রইল। ছেলেরা দেখল সাপটা মরেনি, অথচ তাদের দিকে তেড়েও আসছে না। তাই দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেল। তখন কেউ তাকে খোঁচা মারতে থাকে, কেউ ঢ্যালা ছুড়ে মারে, কেউবা তার ল্যাজ ধরে ঘুরপাক দিয়ে মাটিতে আছাড় দেয়। ছেলেদের এইসব অত্যাচারে সাপ ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ল। তখন বাঁচবার আর কোনো উপায় না দেখে অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে সে বনের আড়ালে চলে গেল।

বহুদিন পর নারদ একদিন সেখানে ফিরে এলেন। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখে সাপ আবার পথের ধারে এসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। নারদ কাছে এসে সাপের এই কঙ্কালসার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এত রোগা হয়ে গেলি কী করে?" সাপ বলল ঃ "ঠাকুর, তুমি তো আমাকে কারুর প্রতি ক্রোধ না করতে বলেছ, কাউকে কামড়াতে মানা করেছ। তারই সুযোগ নিয়ে ছেলের দল আমার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে। সেই অত্যাচারেই আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাপের কথা শুনে নারদ বললেন ঃ "কী বোকা রে তুই! আমি তো তোকে ক্রোধ দমন করতে বলেছি, কাউকে কামড়াতে বারণ করেছি, কিন্তু ভয় দেখাবার জন্যে ফোঁস করতে তো বারণ করিনি।, যাইহোক, যা হবার তা হয়েছে, এখন থেকে কেউ তোর কাছে এলেই তুই ফোঁস করে উঠবি। তাতেই কেউ আর তোর কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।" এই বলে নারদ চলে গেলেন।

সাপকে দেখে ছেলেরা আবার তাকে জ্বালাতন করতে এল। কিন্তু এখন তাদের দেখলেই সাপ ফোঁস করে গর্জে ওঠে আর তাই দেখে ছেলের দলও ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ছেলেরা যখন দেখল যে সাপকে নিয়ে আর তাদের খেলা করা চলবে না, তখন তারা প্রাণের ভয়ে সেদিকে আসাই ছেড়ে দিল। সাপও সেই থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে একমনে ভগবানের নাম করতে লাগল।

☆ ☆ ☆

সংসারে থাকতে গেলে নানারকম লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এমন লোকও সংসারে আছে যাদের স্বভাব হল অহেতুক পরের অনিষ্ট করা। তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে সংসারীকে সতর্ক থাকতে হয়, তাদের প্রতি ক্রোধের একটা ভান করতে হয়। তা না হলে সংসারে চলা যায় না, লোকের কাছে মানও থাকে না। তাই মহাজনদের উপদেশ হল এই যে সাপের মতো ফোঁস করবে, কিন্তু কাউকে কামড়াবে না। সে যদি তোমার অনিষ্ট করতে চায়, তাকে বাধা দেবে, ভয় দেখাবে, কিন্তু রাগের মাথায় তার কোনো ক্ষতি করে বোসো না। অহিংসা হওয়া মানে অন্যায় অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, আত্মতেজের দ্বারা, নিজস্ব তেজের আভাস দিয়ে কারো কোনো ক্ষতিসাধন না করে সে অন্যায়কে নিরস্ত করা, দূরে হটিয়ে দেওয়া।

লোভের মুখে ছাই

রাজার কাছে এক সাধু ভিক্ষে চাইতে এসেছেন। সাধুর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁকে সসম্মানে রাজসভায় নিয়ে এসে বললেন ঃ "সাধুজী, আপনি কী চান বলুন, আপনাকে আমার অদেয় কিছু নেই। রাজ্য চান, তাতেও আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।" সাধু হেসে বললেন ঃ "মহারাজ, আমি সাধু, রাজ্য নিয়ে আমি কী করব?" আমার কাছে এই সামান্য একখানা হাড় রয়েছে, এর সমান ওজনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিছু পেলেই আমি খুশি হব।" সাধুর কথা শুনে রাজার হাসি পেল, তিনি বললেন ঃ "সাধুজী এটার আর কী ওজন করব, কতই বা এর ওজন হবে, আপনি বরং আমার কাছ থেকে বেশি করে কিছু নিয়ে যান।" সাধু তাতে রাজী হলেন না, তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি দাঁড়িপাল্লা আনিয়ে এর সমান ওজনের কিছু আমাকে দিন. তার বেশি আমি আর কিছু নেব না।"

দাঁড়িপাল্লার এক দিকে হাড়খানা রেখে অন্য দিকে রাজা তাঁর রাজকোষের ধন-রত্ন চাপাতে লাগলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল, তবু ওজনে তার হাড়ের সমান হল না, হাড়খানা যেমন ছিল তেমনি নিচেই পড়ে রইল। পাত্র-মিত্র সবাইকে নিয়ে রাজা তখন দাঁড়িপাল্লায় উঠে বসলেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। রাজা তখন হাত জোড় করে সাধুকে বললেন ঃ "সাধুজী, আমি বুঝতে পারছি আপনি কোনো সাধারণ সাধু নন, নিশ্চয় আপনি কোনো সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার কাছে হার স্বীকার করছি। দয়া করে বলুন কিসে আমার সংকল্প পূর্ণ হবে, কোন্ জিনিস দাঁড়িপাল্লায় চাপালে তা ওজনে হাড়ের সমান হবে।" সাধু একটু হেসে বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি একটা কাজ করলেই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আপনি কাউকে বলুন রান্নাঘরে গিয়ে খানিকটা ছাই নিয়ে আসতে।" রাজার হুকুমে একজন লোক দৌড়ে গিয়ে ছাই নিয়ে এল। খানিকটা ছাই নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সাধু তা হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে লাগলেন আর দেখতে দেখতে হাড়ের দিকে পাল্লাটা উপরে উঠে গেল। এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখে রাজা, মন্ত্রী, সভাসদেরা সকলেই অবাক হয়ে গেলেন।

রাজা তখন সাধুকে প্রণাম করে বললেন ঃ "প্রভু, এই অলৌকিক ব্যাপারের কী তাৎপর্য তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।" সাধু বললেন ঃ "রাজা এই যে হাড় দেখছ, এ হল লোভী হাড়। লোভ জিনিসটা অত্যন্ত খারাপ, তাকে তুমি যত জিনিসই দাও না কেন, কিছুতেই তার পেট ভরাতে পারবে না। সে যত পাবে, ততই তার লোভ আরও বেড়ে যাবে। লোভকে শান্ত করার একমাত্র উপায় হল তার মুখে ছাই দেওয়া। সেজন্যই আমি লোভী হাড়ের মুখে ছাই দিয়ে দিলাম। দেখলে তো, তাতেই সে কেমন জব্দ হয়ে গেল, নইলে হাজার জিনিস দিয়েও তুমি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারতে না। দেখো রাজা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে নিতে আসিনি, এসেছি তোমাকে উপদেশ দিতে। লোভ যে কী ভয়ানক জিনিস এখন তো তা দেখলে, তাই বলছি লোভকে কখনো প্রশ্রয় দিয়ো না। আমার এখানকার কাজ শেষ হল, এবার আমি আসি।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

☆ ☆ ☆

শাস্ত্র বলেন ঃ 'মা গৃধঃ, লোভ কোরো না, কারণ 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ততে, কামনা বা লোভকে কখনো ভোগ দিয়ে, নিরস্ত করা যায় না, সে যত পায় তত চায়। আগুনে ঘি ঢাললে সে আরও দাউ দাউ করে জ্বলেই ওঠে, কখনো নিভে যায় না। তাই তার মুখে ছাই দিতে হয়, অর্থাৎ ভোগ থেকে বঞ্চিত করতে হয়, বৈরাগ্য অভ্যাস করতে হয়। তবেই কামনার, লোভের বা ভোগের আগুন নেভে।

লোভ জব্দ ত্যাগীর কাছে

এক রাজা সাধু-সজ্জনদের খাওয়াতে খুব ভালোবাসেন। শুধু খাওয়ানো নয়, খাওয়ার শেষে প্রত্যেককে তিনি দক্ষিণা-সহ সসম্মানে বিদায় দেন। রাজার ইচ্ছে হল একদিন দেশ-বিদেশের সাধু-সজ্জন, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের তিনি পেট ভরে লাড্ডু খাওয়াবেন এবং প্রতিটি লাড্ডুর জন্যে এক একটি করে টাকা দক্ষিণা দেবেন। রাজার এই সংকল্পের কথা দেশ-দেশান্তরে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল। সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবরা দলে দলে রাজধানীতে এসে জুটল। রাজা তখন এইসব অতিথিদের জন্যে তাদের ইচ্ছেমতো লাড্ডু সরবরাহের হুকুম দিলেন।

প্রতিটি লাড্ডুর জন্যে এক টাকা করে দক্ষিণা, এমন সৌভাগ্য তো কখনো হয় না, তাই লোভে পড়ে যে যত পারে একটার পর একটা লাড্ডু খেয়ে চলল। খেতে খেতে পেটে আর ধরে না, তবু খাওয়ার যেন বিরাম নেই। এদের মধ্যে একটি সাধু যৎসামান্য আহারের পর আচমন করে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন, অনেক সাধ্য-সাধনাতেও আর একটি লাড্ডুও তাঁকে খাওয়ানো গেল না। রাজা নিজে এসে হাত জোড় করে অনুরোধ করলেন ঃ "সাধুজী, আপনি আর দু-চারটে লাড্ডু খান, প্রতি লাড্ডুর জন্যে আপনার এক টাকা করে দক্ষিণা মিলবে।" সাধু বললেন ঃ "রাজামশাই, আমার আচমন হয়ে গিয়েছে, আর তো আমার খাওয়া চলবে না।" রাজা বললেন ঃ "লাড্ডু প্রতি আমি দশ টাকা দক্ষিণা দিচ্ছি, আপনি আরও কটা লাড্ডু খান।" সাধু বললেন ঃ "দশ টাকা কী বলছেন? আমার আচমন হয়ে গিয়েছে, লাখ টাকা দিলেও আমি লাড্ডু খাব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না।" রাজা তবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন ঃ "আপনি অন্তত আর একটা লাড্ডু খান, আমি অর্ধেক রাজত্ব আপনাকে দক্ষিণা দেব।" সাধু এবার বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ "কেন মিছে জ্বালাতন করছ, বলেছি তো আমার আচমন হয়ে গিয়েছে, তোমার সারা রাজত্ব দিলেও লাড্ডুর একটা দানাও আর আমি মুখে দেব না।" রাজা তখন রেগে গিয়ে সাধুকে বললেন ঃ "দেখো সাধু, আমার মতো এমন দাতা তুমি কোথায় পাবে?" এবার সাধু, হেসে ফেলে বললেন ঃ "আরে রাজা, আমার মতো ত্যাগীও তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। তুমি দাতা হতে পারো, কিন্তু আমি হলাম ত্যাগী। তুমি নিজেকে দাতা বলে বড়াই করছ, কিন্তু এ বড়াই করা চলে কার কাছে? যে গ্রহণ করে তার কাছে। ত্যাগীর কাছে এসব অহংকার শোভা পায় না।" এই বলে সাধু সেখান থেকে চলে গেলেন।

☆ ☆ ☆

গল্পটিতে একদিকে দেখা গেল ত্যাগের মহিমা, আর অন্যদিকে সংকল্পের দৃঢ়তা, হাজারো প্রলোভনেও যাকে টলানো গেল না। যার মধ্যে যথার্থ ত্যাগ ফুটে উঠেছে তার যাচাই হয় এইভাবেই। সমস্ত ভোগের উপকরণ তার সামনে সাজানো, বার বার তার কাছে অনুরোধ-উপরোধ আসছে তা ভোগ করবার জন্যে, তবে সে সেদিকে দৃক্‌পাতও করে না। ভোগী রাজাও এইভাবে হার মানেন ত্যাগী সাধুর কাছে, ভোগের দিকে তাঁকে টেনে আনতে পারেন না কিছুতেই, উল্‌টে নিজেকে মস্তবড়ো দাতা ব'লে তাঁর মিথ্যা অভিমান ও অহংকার, তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ভারতবর্ষ তাই চিরকালই বলে এসেছে, ত্যাগের দ্বারাই অমৃত্ব লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নয়—'ত্যাগেন অমৃতত্বমানশূঃ'।

বন্দী সিংহ

এক ব্রাহ্মণ বনের পথ ধরে চলতে চলতে দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড সিংহ খাঁচায় বন্দী হয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণকে দেখে সিংহ কাতর স্বরে বলল ঃ "ঠাকুরমশাই দয়া করে আমাকে প্রাণে বাঁচাও, আমি চিরকাল তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।" ব্রাহ্মণ প্রাণের ভয়ে কাছে না গিয়ে দূর থেকেই সিংহকে বলল ঃ "আমি খাঁচা খুলে তোমাকে বের করে দিলেই তো তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে, ও আমি পারব না।" সিংহ বলল ঃ "সে কী কথা! তুমি আমার ভালো করবে, প্রাণ বাঁচাবে, আর আমি তোমার মন্দ করব,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ-ও কি সম্ভব? আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কোনো অনিষ্টই আমি করব না।"

বোকা ব্রাহ্মণ ভাবল, সিংহ যখন প্রতিজ্ঞা করছে, তখন নিশ্চয়ই সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবে, আমার কোনো ক্ষতি সে করবে না। এই ভেবে সে কাছে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিল। জাতের স্বভাব যাবে কোথায়? ছাড়া পেয়েই সিংহ ভীষণ গর্জন করে ব্রাহ্মণকে বলল ঃ "আমি অনেকদিন অনাহারে রয়েছি, আমি ক্ষুধার্ত। আহারের সন্ধানে কোথায় আর এখন ঘুরে মরব, তার চেয়ে তুমি যখন সামনেই রয়েছ আর তোমার সঙ্গে যখন আমার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, তখন তোমাকে খেয়েই এখন পেট ভরানো যাক।" ব্রাহ্মণ ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সিংহকে বলল ঃ "সিংহ ভাই, আমি তোমার উপকার করলাম, আর তুমি আমার অনিষ্ট করবে?" সিংহ বলল ঃ "সেইটাই তো সংসারের রীতি। সংসারে কেউ কারুর ভালো করলে উল্টে সে তার অপকারই করে।" ব্রাহ্মণ বলল ঃ "তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি তিনজনকে সাক্ষী মানতে চাই। সাক্ষীরা যদি বলে তোমার কথাই ঠিক, তখন না হয় তুমি আমাকে খেয়ো।"

ব্রাহ্মণ আর সিংহ একটা গাছের কাছে গেল। ব্রাহ্মণ গাছকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "ওহে গাছ, তুমি বলো দেখি, যদি কেউ কারুর উপকার করে তাহলে সে কি কখনো তার অনিষ্ট করতে পারে?" গাছ হেসে বলল ঃ "হ্যাঁ ভাই, সংসারের নিয়মই তো তাই। এই আমাকেই দেখো না, মানুষের কত উপকার করছি আমি। তাদের আমি ফুল দিই, ফল দিই, ছায়া দিয়ে রোদের তাপ থেকে তাদের বাঁচাই, আর তার বদলে বেইমান মানুষ আমার সঙ্গে কী নিষ্ঠুর ব্যবহারই না করে। তারা আমার ডাল ভাঙে, নির্মমভাবে কুড়ুল দিয়ে আঘাত ক'রে আমায় যে কত কষ্ট দেয় তা আর কী বলব। তাহলেই বুঝে দেখো, সংসারে কারুর ভালো করতে গেলে মন্দটাই পেতে হয়।" গাছের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ বলে উঠল ঃ "দেখলে তো ঠাকুর, আমার কথা ঠিক কিনা, এবার তাহলে তোমাকে খেতে পারি।" ব্রাহ্মণ বলল ঃ "একজন সাক্ষী তোমার কথায় সায় দিয়েছে, এখনো দুজন বাকি। তুমি আর একটু অপেক্ষা করো।"

এবার তারা গেল এক সরোবরের কাছে। ব্রাহ্মণ সরোবরকে সেই একই প্রশ্ন করলে সরোবর বলল ঃ "উপকারীর অপকার করাই তো মানুষের রীতি। দেখো না কেন, আমার জলে স্নান ক'রে তারা আরাম পায়, শরীর ঠাণ্ডা রাখে, আমার জল খেয়ে প্রাণে বাঁচে, অথচ সেই আমারই জলে তারা যত আবর্জনা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মল-মূত্র ধুয়ে আমার জলকে নোংরা করে তুলছে।" সিংহ বলল ঃ "ঠাকুর, এখন আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হল তো?" ব্রাহ্মণ বলল ঃ "আমার এখনো এক সাক্ষী বাকি রয়েছে, সে তোমার কথায় সায় দিলেই তুমি আমাকে খেতে পারবে। তখন আর আমি আপত্তি করব না।"

এবার ব্রাহ্মণের সাক্ষী হল এক শেয়াল। ব্রাহ্মণ আর সিংহের কাছ থেকে সব ব্যাপারটা শুনে নিয়ে শেয়াল ব্রাহ্মণকে বলল ঃ "ঠাকুরমশাই, আপনার প্রশ্নের জবাব আমি পরে দেব, কিন্তু আপনি সামান্য মানুষ হয়ে পশুরাজ সিংহকে উদ্ধার করেছেন, এটাই যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে। আপনি যদি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন সিংহ কীভাবে বন্দী হয়ে খাঁচার মধ্যে ছিল, কিভাবেই বা আপনি তাকে উদ্ধার করলেন, তবেই আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করতে পারি, নইলে, নয়।"

শেয়ালের কথা শুনে তিনজনেই তখন খাঁচার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। খাঁচা দেখে শেয়াল বলল ঃ "এ যে অসম্ভব ব্যাপার দেখছি। এতটুকু খাঁচায় পশুরাজের অতবড়ো দেহখানা ঢুকতে পারে, সেটাই তো আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে।" শেয়ালের বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে সিংহ খাঁচার মধ্যে ঢুকে শেয়ালকে বলল ঃ "এই দেখো, এইভাবে আমি খাঁচায় বন্দী ছিলাম।" শেয়াল বলল ঃ "খাঁচার দরজা তো বন্ধ হয় না দেখছি, তবে তুমি বন্দী ছিলে বলছ কী করে?" সিংহ তখন ব্রাহ্মণকে বলল ঃ "তুমি একবার দরজাটা বন্ধ করে শেয়ালকে দেখিয়ে দাও তো যে সত্যিই আমি খাঁচায় বন্দী ছিলাম।" সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ খাঁচার দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল। শেয়াল তখন ব্রাহ্মণকে বলল ঃ ঠাকুরমশাই, আপনি এত বোকা আপনার জানা উচিত ছিল যে সিংহ আপনার যজমান নয় যে আপনি তাকে যা বলবেন সে তাই শুনবে। আপনি খুব বেঁচে গেলেন। যান, এবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যান।

☆ ☆ ☆

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির অসীম ক্ষমতা, সিংহের মতোই তারা বলবান। উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়রূপী সিংহ মানুষের সদ্‌বৃত্তিরূপী ব্রাহ্মণকে ধ্বংস করে ফেলে তাই তাদের খাঁচায় বন্দী করতে হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়দের একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে হয়। জোর-জবরদস্তি করে তা করা যায় না, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কৌশলের দ্বারা তাদের বশীভূত করা যায়। গল্পের শেয়াল হল মন ও বুদ্ধির প্রতীক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রিয়দের ধ্বংস করে ফেললে সংসারের কাজ চলে না, তাই আমাদের কতর্ব্য হল তাদের সংযত করা। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নয়, দরকার ইন্দ্রিয় সংযম। প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখতে চেষ্টা করে। যোগী যোগপথ অবলম্বন করেন, জ্ঞানী অবলম্বন করেন বিচারের পথ, কর্মী তাঁর কাজের মধ্যে ইন্দ্রিয়দের নিয়োজিত করেন আর ভক্ত ও প্রেমিক যাঁরা, তাঁরা ভগবানের সেবায় ইন্দ্রিয়দের নিযুক্ত রেখে দেন।

এছাড়া গল্পে এ শিক্ষাও দেওয়া হল যে জগতের স্বাভাবিক রীতিই হল উপকারের বদলে অপকার করা। গাছ ও সরোবর মুখ বুঁজে কেবল উপকারই করে যায়। তারা তো কোনো প্রতিবাদ করবে না, তাই জেনে নির্বিবাদে সকলে তাদের অপকারই করে যায় উপকারের বিনিময়ে। শেয়ালের মতো যার বুদ্ধি ফুটেছে, সে-ই তাদের অপকারের প্রতিশোধ নিতে পারে। তাই বলা হয় ঃ 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। অন্য মানুষের হিংস্র স্বভাব সম্বন্ধে সজাগ থেকে কেমনভাবে না ঠকে জীবনে চলতে হয়, গল্পটিতে এই জাগতিক শিক্ষাও যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি এতে এই পারমার্থিক শিক্ষাও পাই যে কৌশলে কেমন করে ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু

রাজা-রানীর বয়স হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁদের কোনো সন্তানাদি হয়নি, তাই তাঁদের মনে সুখ নেই। ঠাকুর-দেবতার দুয়োরে ধরনা দিয়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবা করে অবশেষে সকলের আশীর্বাদে তাঁদের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে হল। রাজা-রানীর মনে আনন্দ ধরে না। তাঁরা দেশের বড়ো বড়ো দৈবজ্ঞদের ডেকে মেয়ের জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করালেন, কিন্তু জন্মকুণ্ডলী দেখে তাঁদের সব আনন্দ মন থেকে মুছে গেল। দৈবজ্ঞরা বললেন মেয়ের কপালে অকালবৈধব্যের যোগ রয়েছে।

রাজা স্থির করলেন মেয়ের বিয়ে দেবন না। তিনি শ্বেতপাথরের এক মন্দির তৈরি করিয়ে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর কষ্টিপাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। মেয়ে যখন একটু বড়ো হল তখন রাজা তাকে বললেন ঃ "মা, এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তোমার স্বামী, তুমি মনপ্রাণ দিয়ে এঁর সেবা কোরো।" এই বলে তিনি তাকে পূজোর মন্ত্র ও পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বালিকা মনের আনন্দে তার এই দেবতা-স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করল।

এইভাবে দিন যায়। রাজকুমারী এখন বালিকা বয়স অতিক্রম করেছে, দু-চারজন সঙ্গিনীও জুটেছে তার। সখীদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা নিজেদের স্বামী সম্বন্ধে নানারকম গল্প করে তার কাছে। তাদের সেইসব গল্প শুনে রাজকুমারী ভাবতে থাকে, ওদের স্বামীরা ওদের কত ভালোবাসে, কত কথা কয় ওদের স্বামীদের মতো আমার স্বামী তো আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন না, ওদের স্বামীদের মতো আমাকে তো আদরও করে না। রাজকুমারী সরল অন্তঃকরণ দুঃখে ভরে গেল। একদিন সে ফুলের মালা বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে সজল কণ্ঠে বলল ঃ "ঠাকুর, তুমি আমার স্বামী, তবে কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না, কেন আমাকে আদর করো না? আমার সেবায় কি কোনো ত্রুটি হয়েছে? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? তুমি বলে দাও কী করলে তুমি সুখী হবে, আমি সেইভাবেই তোমার সেবা করব। ঠাকুর, তুমি চুপ করে থেকো না, কথা কও, কথা কও।"

পাষাণ বিগ্রহ পাষাণের মতোই নীরব হয়ে রইল, কোনো কথাই শোনা গেল না বিগ্রহের মুখ থেকে। চোখের জলে রাজকুমারী পূজো শেষ করে ভোগ ধরে দিল বিগ্রহের সামনে, কিন্তু নিজে সে প্রসাদ গ্রহণ করল না, অনাহারে, অভিমানে দেবতার পায়ের কাছে পড়ে রইল। এইভাবে সাত দিন সাত রাত কেটে গেল। দুঃখে রাজকুমারীর বুক ফেটে যাচ্ছে, ঠাকুর এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম। এই নিশ্ছিদ্র নীরবতার পাষাণভার অভিমানিনী আর সহ্য করতে পারে না। সে স্থির করল আর পূজো নয়, যেমন করে হোক ওঁকে আমি জব্দ করবই, দেখি কেমন করে উনি আমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারেন।

বাজার থেকে খানিকটা তুলো আনিয়ে রাজকুমারী নিজের কাছে রেখে দিল, তারপর ঠাকুরের পূজো সেরে ভোগ নিয়ে মিনতির স্বরে বলল ঃ "স্বামী, এখনো তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না? তবে শোনো, যদি কথা না বলো তবে তোমার এমন অবস্থা করব যে তখন চুপ করে থাকার ফল তুমি বুঝতে পারবে।" পাষাণ দেবতা তখনো নিরুত্তর। তাই দেখে রাজকুমারী বলল ঃ "তবু চুপ করে রইলে? বেশ, তবে আমার অপরাধ নিয়ো না, শুধু দেখে যাও আমি কী করি।" এই বলে খানিকটা তুলো নিয়ে রাজকুমারী বিগ্রহের নাকে গুঁজে দিতে গেল। তার ইচ্ছেটা, নাক বন্ধ করলেই দম নেবার জন্যে ঠাকুরকে বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হবে। যেই না সে নাকের কাছে তুলো নিয়ে গিয়েছে অমনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাষাণ দেবতা সজীব হয়ে রাজকুমারীর দুহাত ধরে বললেন ঃ "সখী, এ কী করছ তুমি? দম বন্ধ হয়ে আমি যে মরে যাব।"

শোনামাত্র রাজকুমারী ঠাকুরের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বলল ঃ "হে নিষ্ঠুর, এতদিনে তোমার কথা বলবার সময় হল, আগে কেন কথা কওনি ঠাকুর?" ভগবান বললেন ঃ "প্রিয় সখী আমার, এতদিন যে তোমার বিশ্বাসে ত্রুটি ছিল, তাইতো আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। পাষাণ বিগ্রহ হলেও আমি যে সজীব, আমারও যে প্রাণ আছে, একথা এতদিন তো তুমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারনি। আজ তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে বলেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে পাষাণ হলেও আমি চিন্ময়। তাইতো তুমি আমার দম বন্ধ করে আমাকে কথা বলাতে চেয়েছিলে। তোমার এই অকপট বিশ্বাসের জন্যেই আমি কথা না বলে থাকতে পারলাম না। সখী, কেন আমাকে নিষ্ঠুর বলে অপবাদ দিচ্ছ? মানুষ আমাকে যেমনভাবে গড়ে তোলে, আমিও যে সেইভাবেই তার কাছে ধরা দিই। আজ তোমার হৃদয়ের মধ্যে তুমি আমাকে সজীব করে তুলেছ, তাইতো আমি তোমার কাছে সজীব হয়ে উঠলাম।" এই বলে ভগবান দুহাত দিয়ে রাজকুমারীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

☆ ☆ ☆

আমরা যে বিগ্রহের সেবা-পূজা করে থাকি, তা পাথর দিয়ে গড়া বা কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি। তার উপাদান তাই জড়, কাদা মাটিতে গড়া প্রতিমার মতো। জড়বস্তুতে তৈরি এই প্রতিমা বা বিগ্রহের মধ্যে কোনো প্রাণ নেই বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু তাতে যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে যখন দেবতা এসে অধিষ্ঠান করেন, তখন যে তা চিন্ময় হয়ে ওঠে, তা আমরা খেয়াল করি না। মনে মনে দেবতা বলে বিশ্বাস করলেও বিগ্রহটি সজীব বা প্রাণবন্ত, তা আমরা ভাবতে পারি না, তাই দেবতাকে ডেকেও আমরা কোনো সাড়া পাই না। মীরাবাঈ বা মহাপ্রভুর মতো যাঁরা, তাঁরাই গিরধরলালের মূর্তিতে বা জগন্নাথের কাঠের প্রতিমাতে সাক্ষাৎ তাঁকে দর্শন করে থাকেন। এ যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণের ভবতারিণী পূজায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবায় এই পাষাণ-প্রতিমায় তাঁর সাক্ষাৎ সাড়া দেওয়ার অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য মেলে। মূল কথা হল সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিকী ভক্তি। তাই বলা হয় ঃ "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'। গল্পটিতে আমরা দেখলাম সরল বিশ্বাসের কাছে তাঁকে হার মানতেই হয়, শেষে সাড়া দিতেই হয়, যদিও আমাদের কাছে তা একান্ত অসম্ভব বা আজগুবি মনে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কপাল ভাঙলে সব যায়

এক বুড়ীর সাত ছেলে, কিন্তু বুড়ীর এমনই কপাল যে একে একে তার সাতটা ছেলেই মরে গেল। বুড়ী ঠিক করল যে সে যমরাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে কেন তিনি তার সাতটা ছেলেকেই নিয়ে নিলেন। তার নিজের দু-একটিকে নিয়ে যাদের ঘরে বেশি ছেলে রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে দু-একটি করে নিলেও তো পারতেন। এই ভেবে বুড়ী যমরাজের কাছে হাজির হয়ে বলল ঃ "ধর্মরাজ, এ তোমার কেমন বিচার, আমার সাত সাতটা ছেলেকেই তুমি নিয়ে নিলে? কেন, আর কি কারুর ছেলে ছিল না? আমার দু-একটিকে নিয়ে অন্য ঘর থেকেও না হয় দু-একটি করে নিতে। কেন আমার উপর এত অবিচার করলে তার জবাব দাও, নইলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।" যমরাজ বুড়ীকে বললেন ঃ "বুড়ীমা, একটু স্থির হও। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু বিশ্রাম করে সামনের ঐ পুকুরটাতে স্নান করে এসো। পাশে ঐ যে ঘরখানা দেখছ, ওখানে অনেক মিষ্টি রয়েছে, স্নান করে, ইচ্ছেমতো মিষ্টি খেয়ে তুমি আবার আমার কাছে এসো, তখন আমি তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো।"

যমরাজের কথামতো পুকুরে স্নান করে বুড়ী খাবার ঘরে ঢুকে দেখল সেখানে থরে থরে মিষ্টির হাঁড়ি সাজানো রয়েছে। সবকটা হাঁড়িই মিষ্টিতে ভরতি, কেবল একটা হাঁড়ি প্রায় খালি, তাতে কয়েকটা মাত্র মিষ্টি পড়ে রয়েছে। বুড়ী ভাবল ভরা হাঁড়ি আর ভাঙি কেন, এই হাঁড়িতে যা মিষ্টি রয়েছে তাতেই আমার পেট ভরে যাবে। এই ভেবে ভরা হাঁড়ি না ভেঙে খোলা হাঁড়িতে যে কটা মিষ্টি ছিল বুড়ী তা খেয়ে নিল আর তাতেই তার পেট ভরে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে পর বুড়ী আবার যমরাজের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল কেন তিনি তার সাতটি ছেলেকে গ্রাস করেছেন। বুড়ীর প্রশ্ন শুনে যমরাজ বললেন ঃ "বুড়ীমা, পরে আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, আগে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। ঘরে তো মিষ্টি ভরতি অতগুলো হাঁড়ি ছিল, তা সত্ত্বেও সেসব হাঁড়ি থেকে মিষ্টি না নিয়ে তুমি খোলা হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেলে কেন?" বুড়ী বলল ঃ " ভরা হাঁড়ি আমি ভাঙতে যাব কেন বাবা? খোলা হাঁড়িতে যে ক'টা মিষ্টি ছিল তাতেই আমার পেট ভরে গেল, তাই আর ভরা হাঁড়ি ভাঙিনি।" যমরাজ বললেন ঃ "দেখো বুড়ীমা, তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি নিজেই কিন্তু বলে দিলে। তুমি যেমন ভরা হাঁড়ি ভাঙোনি, আমিও তেমনি ভরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘর ভাঙিনে, ভাঙা ঘরকেই আমি ভেঙে দিই।"

☆ ☆ ☆

বিশ্ববিধানের রহস্য বড়ো বিচিত্র, যুক্তি দিয়ে তাকে সব সময় বোঝা যায় না। সংসারে দেখা যায় যখন কোনো মানুষের কপাল ফেরে, তখন সব দিক দিয়েই তার বাড়-বাড়ন্ত হতে থাকে। টাকা-পয়সা, নাম-যশ, সাংসারিক সুখ-শান্তি সব যেন আপনা থেকেই তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। আবার কপাল যখন ভাঙে, তখন সব দিক দিয়েই মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। পুত্রশোক, বিত্তনাশ, ব্যাধির আক্রমণ, সাংসারিক অশান্তি, সব যেন একসঙ্গে চারিদিক থেকে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই কথায় বলে, দুর্ভাগ্য কখনো একলা আসে না। বিধাতার এই বিচিত্র বিধানের কার্যকারণ নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন একমাত্র অদৃষ্ট বা প্রারব্ধেরই দোহাই দেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো গতি থাকে না।

গ্রহের ফের

নারদ ঋষি বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন ভগবান বিষ্ণু শুয়ে রয়েছেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁর পদসেবা করছেন। নারদ ব্যস্ত হয়ে বিষ্ণুকে বললেন ঃ "প্রভু, আপনি এমন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে রয়েছেন, এদিকে যে আপনার ঘোর বিপদ উপস্থিত, শনিগ্রহ এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। শনির কোপ তো আপনি জানেন, বারো বছর না ভুগিয়ে সে ছাড়ে না।" নারদের কথা শুনে বিষ্ণু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভেবে ভেবে একটা উপায় স্থির করে তিনি নারদকে বললেন ঃ "দেখো নারদ, শনির কোপ এড়াতে আমি না হয় এক কাজ করি। বারো বছর আমি পাথর হয়ে বসে থাকব, তাহলেই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বারো বছর কেটে গেলে পর আবার আমি বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করব।"

বারো বছর বিষ্ণু পাথর হয়ে রইলেন। গ্রহের ফের কেটে যাবার পর তিনি শনিগ্রহকে ডেকে বললেন ঃ "কিগো শনিঠাকুর, তুমি তো আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারলে না।" শনি হেসে বললেন ঃ "প্রভু, আপনি স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান হয়ে আমার ভয়ে যে বারো বছর পাথর হয়ে রইলেন, তাতেই তো আমার কাজ সিদ্ধ হল। আপনি আগে থাকতেই তো বারো বছর পাথর হয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বসে থেকে আমার কোপের সময়টা স্থির করে দিলেন।" বিষ্ণুও তখন হাসতে হাসতে বললেন ঃ "হ্যাঁ, তা তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি গোলকপতি হয়েও তোমার ভয়ে পাথর হয়ে রইলাম। পাথর হবার বুদ্ধিটা আমাকে যোগাল কে? এখন বেশ বুঝতে পারছি যে প্রথমেই তুমি আমার বুদ্ধিটাকে নষ্ট করে দিয়েছিলে, তাইতো আগে থাকতে পাথর হয়ে আমিই তোমার কোপের কাল নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম।"

☆ ☆ ☆

গ্রহের প্রভাব কেউ এড়াতে পারে না, ভগবানের পর্যন্ত তা থেকে নিস্তার নেই। গ্রহশান্তির জন্যে মহাজনেরা তাই গ্রহদেবতার পূজো, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। তাতে রুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হন। মানুষের শুভাশুভ কর্মই তার সুখ-দুঃখের কারণ, নইলে গ্রহদেবতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো কাউকে সুখ-দুঃখ দিতে পারেন না। তাই মানুষকে সর্বদা শুভ চিন্তা নিয়ে থাকতে হয়। জ্ঞানী হোক, অজ্ঞানী হোক, সকলের ক্ষেত্রেই পাপের ফল যথাসময়ে ফলবে, কেউ তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। ভোগের কাল প্রত্যেকের নির্দিষ্ট হয়েই আছে, তা বারো বছরই হোক আর বারো দিনই হোক। সেই কালটুকু ভোগ ভুগতেই হবে, কাল পূর্ণ হলে ভোগ থেকে মুক্তি, সংসার থেকে ছুটি। সব সময় তাই কালের মুখ চেয়ে থাকতে হয়, 'কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃত্যকো যথা'— ভৃত্য যেমন মনিবের নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনি কালের নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে হয়। বিশ্বে সবকিছু যিনি ঘটাচ্ছেন, সৃষ্টিতে এই কালই সেই ভগবানের অনুস্যূত সর্বাত্মক রূপ।

সাধু মহাত্মার কুষ্ঠব্যাধি

পরম তপস্বী মহাজ্ঞানী এক মহাত্মার অনেক শিষ্য। শিষ্যরা গুরুর কাছে থাকে, তাঁর সেবা করে এবং তাঁর নির্দেশে সাধন-ভজনে নিরত থেকে পরম আনন্দে দিন কাটায়।

একদিন গুরুদেব ধ্যানে বসে দেখলেন এক বীভৎস ছায়ামূর্তি তাঁর সামনে ঘোরাফেরা করছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে তুমি? কী চাও এখানে?" ছায়ামূর্তি বলল ঃ "প্রভু, আমি কুষ্ঠব্যাধি। বারো বছরের জন্যে আপনার শরীরে আমি অধিষ্ঠান করব, কিন্তু আপনার এই পুণ্য শরীরে প্রবেশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতে আমি সাহস পাচ্ছিনে।" মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তবে এখন তুমি কি করবে?" ছায়ামূর্তি বলল ঃ "অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। আপনার মতো তপস্বীর দেহে আমি প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু আমার হাত থেকে আপনি নিস্তার পাবেন না, কুষ্ঠরোগ ভোগ করবার জন্যে দেহান্তে আবার আপনাকে জন্ম নিতে হবে।" মহাত্মা বললেন ঃ "তুমি যখন আমাকে ছাড়বেই না বলছ, তখন আর পরের জন্মের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ কী? তুমি আমার এই দেহটাকে আক্রমণ করো। আমি সাধন-ভজন সব ত্যাগ করছি, তাতেই আমার যা-কিছু তেজ, যা-কিছু পুণ্য সব নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তুমি অনায়াসে আমার দেহটাকে আক্রমণ করতে পারবে। আমি এখন কাশীধামে চললাম। মণিকর্ণিকার ঘাটে এক কুটীর বানিয়ে তাতেই থাকব, তুমি সেখানে গিয়ে আমার দেহে ভর কোরো।"

ছায়ামূর্তিকে তখনকার মতো বিদায় দিয়ে মহাত্মা শিষ্যদের ডেকে বললেন ঃ "আমি আজই কাশী চলে যাব, তোমরা এখানেই থাকো আর যেমন সাধন-ভজন করছ তেমনি করে যাও।" গুরুর কথা শুনে শিষ্যরা হায় হায় করে উঠল ঃ "কেন আপনি আমাদের অনাথ করে চলে যাচ্ছেন? আমাদের কি কোনো অপরাধ হয়েছে? আপনি গেলে কে আমাদের দেখবে? না গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারব না, আপনি যেখানেই যান না কেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।" শিষ্যদের নিবৃত্ত করতে গুরু অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। শিষ্যরা গুরুর সঙ্গে সঙ্গে কাশীধামে এসে পৌঁছল।

মহাত্মা মণিকর্ণিকার ঘাটে কুটীর নির্মান করে তাতে বাস করতে লাগলেন। স্নান, দান, সন্ধ্যাবন্দনা, সাধন-ভজন কিছুই আর তিনি করেন না। তাই দেখে শিষ্যরা মনে করল গুরুদেব বুঝি আচারভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। তারা তাঁকে ত্যাগ করে দলে দলে চলে যেতে লাগল, দু-চারজন মাত্র রয়ে গেল তাঁর কাছে। এইভাবে আপন ইচ্ছায় ভ্রষ্টাচার হওয়ার দরুন মহাত্মার সাধনলব্ধ তেজ ক্ষয় হয়ে গেল এবং সুযোগ বুঝে কুষ্ঠব্যাধি তখন তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। গুরুকে গলিতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হতে দেখে দু-চারজন শিষ্য যারা তখনো তাঁর কাছে ছিল, তারাও একে একে সরে পড়ল, কেবল একটিমাত্র শিষ্য গুরুকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী হল না। মহাত্মা তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন, কিন্তু শিষ্য গুরুর কথা শুনল না, সে প্রাণপণ যত্নে গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করল। এদিকে ব্যাধির প্রকোপ ভয়ানক বেড়ে গেল, কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরুর প্রতি শিষ্যের নিষ্ঠা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ঘৃণা ভয় সব ত্যাগ করে সে আগেকার মতোই অনলসভাবে গুরুর শুশ্রূষা করে যেতে লাগল।

শিষ্যের এই ঐকান্তিক পরিচর্যায় গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু একদিন পরীক্ষাচ্ছলে শিষ্যকে পদাঘাত করে তিনি কপট ক্রোধ দেখিয়ে বললেন ঃ "দূর হয়ে যাও এখান থেকে। তোমাকে কে বলেছে আমার সেবা করতে? এখুনি আমার সামনে থেকে বিদেয় হও।" শিষ্য হাত জোড় করে বলল ঃ "গুরুদেব, আপনার কাছে যে আর কেউ নেই, আমি চলে গেলে কে আপনার সেবা করবে? এমন নিষ্ঠুর আদেশ আপনি করবেন না, আপনাকে এমন অবস্থায় ফেলে রেখে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।" শিষ্যের গুরুভক্তি দেখে মহাত্মা মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তাঁর সেই কপট ক্রোধের মূর্তি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

একদিন গুরুদেবের সেবা পরিচর্যার পর শিষ্য গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে। অদূরে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হর আর পার্বতী। শিষ্যকে দেখে পার্বতী মহাদেবকে বললেন ঃ "দেবাদিদেব, গুরুগতপ্রাণ এই শিষ্যকে তোমার বর দেওয়া উচিত।" মহাদেব হেসে বললেন ঃ " তুমিই কেন ওকে বর দাও না পার্বতী।" ছদ্মবেশী পার্বতী শিষ্যকে কাছে ডেকে বললেন ঃ "কুষ্ঠরোগী গুরুকে নিয়ে দিনরাত পড়ে রয়েছ কেন? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? যা ছোঁয়াচে রোগ, তোমারও তো ঐ রোগ হতে পারে। নিজের ভালো চাও তো পালিয়ে যাও।" পার্বতীর কথা শুনে শিষ্য রেগে গিয়ে বলল ঃ "কে তুমি? কেন তুমি আমাকে এমন অধর্মের কথা শোনাচ্ছ?" পার্বতী বললেন ঃ "রাগ করছ কেন? আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।" শিষ্য বিরক্ত হয়ে বলল ঃ "তোমাকে আমার ভালো করতে হবে না, অমন বাজে কথা আর মুখে এনো না।"

নানাভাবে পার্বতী শিষ্যকে পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু গুরুভক্ত এই শিষ্যের নিষ্ঠা তাকে একটুও টলাতে পারলেন না। তখন তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে শিষ্যকে বললেন ঃ "বৎস, তোমার গুরুভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার কাছ থেকে তুমি ইচ্ছেমতো বর চেয়ে নাও।" শিষ্য বলল ঃ "মা, তুমি যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকো তাহলে আমার গুরুদেবকে রোগমুক্ত করে দাও।" দেবী বললেন ঃ "তথাস্তু। আজই তোমার গুরু রোগমুক্ত হয়ে দিব্যকান্তি ধারণ করবেন। বৎস, তোমার মতো গুরুনিষ্ঠা জগতে দুর্লভ। তুমি বলো তুমি কি চাও। স্বর্গ হোক, মোক্ষ হোক, যা তুমি চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব।" শিষ্য বলল ঃ "মা, স্বর্গ মোক্ষ কিছুই আমি চাইনে, শুধু এই বর দাও যেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিরকাল গুরুদেবের চরণসেবায় আমি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি। আমার অন্য কোনো কামনা নেই।"

দেবীর বরে মহাত্মা রোগমুক্ত হলেন। সেইসঙ্গে বারো বছরও পূর্ণ হয়ে গেল। দেবীর আশীর্বাদে সদ্‌গুরু ও তাঁর নিষ্কাম শিষ্য পরম শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দেহান্তে কৈলাসধামে গমন করলেন।

☆ ☆ ☆

এই গল্পটিতে একদিকে যেমন দেখানো হয়েছে যে প্রারব্ধকে খন্ডন করা যায় না, তেমনি অপরদিকে নিষ্কাম ভক্তের আদর্শ গুরুভক্তির রূপটিও এখানে উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা ঘটবার তা ঘটবেই। দেহের নানা নিদারুণ ভোগ সাধু-মহাত্মা নির্বিশেষে সকলকেই ভুগতে হয়। কিন্তু সব দুঃখের মধ্যেও যে-শিষ্য গুরুসেবায় তাঁর পরিচর্যার পরম ভক্তিতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, সেই আদর্শ শিষ্যই শেষ অবধি মুক্তিলাভ ক'রে ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

জেলের বৈরাগ্য

এক জেলে মাছ ধরছে এমন সময় সে দেখতে পেল একদল সেপাই হইহই করে ছুটে আসছে। জেলে জানত এই সেপাইরা যাকে হাতের কাছে পায়, তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটায়, কাজ করে কেউ তাদের কাছে থেকে একটা পয়সাও আদায় করতে পারে না। জেলে ভাবল, আমাকে দেখতে পেলেই তো ওরা এসে ধরবে, এখন ওদের হাত থেকে বাঁচি কী করে? হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তাড়াতাড়ি তার জাল গুটিয়ে নিয়ে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে ধুলো নিয়ে বেশ করে গায়ে মেখে নিল। তারপর রাস্তার ধারে সাধুদের মতো চোখ বুঁজে বসে রইল।

সেপাইরা হাঁকডাক করতে করতে সেখানে এসে দেখে এক সাধু বসে রয়েছে। সাধুকে দেখে তারা প্রত্যেকে একটা করে টাকা তার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে চলে গেল। জেলে যখন বুঝল যে ধারে কাছে কেউ নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন সে আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখল তার সামনে একগাদা টাকা পড়ে রয়েছে। গরীব বেচারার তখন মনে হতে লাগল, আমি সাধুর ভান করে বসেছিলাম, তাতেই আমার পায়ের কাছে এতগুলো টাকা এসে পড়ল। যদি সত্যিকারের সাধু হতে পারতাম, তাহলে না জানি কী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবারও যেমন এক মুঠো নিতে যাবেন, অমনি সুদামা বলে উঠলেন ঃ "রক্ষে করো সখা, আর তোমাকে চিড়ে খেতে হবে না। ঐ যে এক গ্রাস খেয়েছ, তাতেই আমার ত্রিলোকের সাম্রাজ্য আর জন্ম-জন্মান্তরের অন্ন জুটে যাবে।"

ভক্তের আনা চিড়ে খেয়ে কৃষ্ণের আনন্দের সীমা রইল না, কিন্তু তিনি দেখলেন চিড়ে এনেছেন বলে সুদামা এখনো লজ্জায় আরক্তবদনে বসে রয়েছেন। সখার সেই লজ্জা দূর করতে কৃষ্ণ বললেন ঃ "সখা, আমি চিড়ে খেতে ভালোবাসি বলে আমার প্রিয় সখী তোমার হাত দিয়ে কেমন চমৎকার চিড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। কী তার সুগন্ধ, কী তার স্বাদ ! মনে হল যেন অমৃত খেলাম। তুমি নিজেই একটু খেয়ে দেখো না।" এই বলে তিনি সুদামা, রুক্মিনী ও সত্যভামা, তিনজনকেই চিড়ে খেতে দিলেন। ভগবান নিজে খেয়ে প্রসাদ করে দিয়েছেন, তাই সামান্য চিড়েতেই সকলে অমৃতের আস্বাদ পেলেন।

মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ এবার নিজের গলা থেকে বৈজয়ন্তী মালা খুলে সুদামার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ "সখা, এইযে বৈজয়ন্তী মালা তোমাকে দিলাম, এর কাছে তিনবার তুমি যা চাইবে, মালার প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। স্বর্গরাজ্য চাও তাই পাবে, বিপুল ঐশ্বর্য চাও তাই পাবে, তোমাকে অদেয় এর কিছুই থাকবে না।" সুদামা বললেন ঃ "সখা, তুমি অন্তর্যামী, আমার অন্তরের কথা তুমি তো সব জানো। স্বর্গ, ঐশ্বর্য কিছুই আমি চাইনে। তোমাকে কী আর বলব, তোমার চরণকমল ছাড়া আর যে কিছুই আমার চাইবার নেই। ও মালা তুমি ফিরিয়ে নাও। একান্তই যদি আমাকে কিছু দিতে চাও তাহলে আমার হৃদয়পদ্মে তোমার চরণকমল চিরকালের মতো স্থাপন করো, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। সখা, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু সামান্য ধন-দৌলত দিয়ে আমাকে তুমি ভোলাতে চেয়ো না।" এই বলে সুদামা ভগবানের চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে সুদামাকে মাটি থেকে তুলে দুহাত দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "সখা, এই বৈজয়ন্তী মালা তোমাকে আমার প্রেমের দান। আমার প্রেমকে তুমি অবজ্ঞা কোরো না। তোমার মনের ভাব কি আমি জানিনে সখা? জানি, তুমি আমাকে ছাড়া আর কিছুই চাও না, কিন্তু আমার সখী যে ভোগ-সুখের কাঙাল, পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্যে সে লালায়িত। আমার সখীর জন্যেই এ মালা তোমাকে নিতে হবে, এর জন্যে তুমি কুণ্ঠিত হোয়ো না।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় সুদামা আর দ্বিরুক্তি করলেন না, তিনি বৈজয়ন্তী মালা গলায় পরে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পথ চলতে চলতে সুদামা দেখলেন একটি ছেলে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে আর তার বুড়ো বাপ-মা তার সামনে আকুল হয়ে কাঁদছে। এই দৃশ্য দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। নিজের দারিদ্রদশা ভুলে গিয়ে তিনি বৈজয়ন্তী মালার উদ্দেশে বললেন ঃ "তুমি তোমার প্রভুর আদেশমতো আমার কথা শোনো, এখুনি এই ছেলেটিকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।" বলবার সঙ্গে সঙ্গে মরা ছেলে বেঁচে উঠল. সুদামাও আনন্দিত মনে পথে পা বাড়ালেন।

পথের ধারে এক প্রকাণ্ড সরোবর। সুদামার ইচ্ছে হল সরোবরে তিনি স্নান করে নেবেন। গ্রামের কিছু মানুষ সেই সরোবরে স্নান করছিল, হঠাৎ এক কুমির একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গভীর জলে ডুব দিল। ছেলেটির সঙ্গে ছিল তার বুড়ী ঠাকুমা। চোখের নিমেষে নাতিকে কুমিরে টেনে নিয়ে যেতে দেখে বুড়ী চিৎকার করে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় সুদামা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন ঃ "মা, তুমি উতলা হোয়ো না, আমি তোমার নাতিকে এখুনি ফিরিয়ে আনছি।" সুদামা বৈজয়ন্তী মালাকে নির্দেশ দিলেন ছেলেটিকে উদ্ধার করে আনতে। সঙ্গে সঙ্গে নাতি জল থেকে উঠে তার ঠাকুমার কাছে এসে দাঁড়াল।

পর পর দুটি বালক ও একটি বৃদ্ধার জীবন রক্ষা করে সুদামা এগিয়ে চলেছেন। এবার দেখলেন রাস্তার ধারে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিসের জটলা জানবার জন্যে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন সামনে এক চিতার উপর একটি মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে আর সতীদাহের প্রথা অনুসারে মৃতের স্ত্রী চিতার দিকে এগিয়ে আসছে। তাই দেখে সুদামা স্ত্রীলোকটিকে বললেন ঃ "মা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, তোমার স্বামী জীবন লাভ করে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবেন।" সুদামার নির্দেশে মালার প্রভাবে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হল। এমন সময় বৈজয়ন্তী মালা সুদামাকে বলল ঃ "আমার প্রভুর নির্দেশ ছিল আপনার তিনটি হুকুম আমি পালন করব। তিনটি হুকুম শেষ হয়েছে, এবার আমাকে প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে।" বলবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মালা সুদামার গলা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুদামা চিন্তা করতে লাগলেন, ব্রাহ্মণী অর্থের জন্যে লালায়িত। ঘরে ফিরলেই তো তিনি জানতে চাইবেন তোমার সখা তোমাকে কী দিল, তখন তাঁকে বলবই বা কী? কিছু দেননি বললে সে তো মিথ্যে বলা হবে। বৈজয়ন্তী মালার কথা বলব তাঁকে? ব্রাহ্মণ কিছু স্থির করতে পারলে না, শুধু ভাবলেন, যাই হোক, ভগবানের কৃপায় চারটি প্রাণ তো রক্ষা পেয়েছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুদামার পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি, ঠাকুর তাঁকে আরও পরীক্ষা করতে চান। সুদামা পথ ধরে চলেছেন, দেখলেন পথের মাঝখানে সোনার মোহর ভরতি একটা থলি পড়ে রয়েছে। গরীব ব্রাহ্মণ একবার থলিটার পানে চেয়ে দেখেলেন, একবার ভাবলেন থলিটা নিয়ে যাই, ব্রাহ্মণীকে বলব সখা তাঁর জন্যে থলি ভরতি সোনার মোহর দিয়েছেন। আর থলিটা নিলে দোষটাই বা কী? আমি তো আর চুরি করছিনে, পথে পড়ে রয়েছে, আমি শুধু কুড়িয়ে নিয়েছি মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। ছি ছি, পরের জিনিস না বলে নেওয়া, সে তো চুরি করারই সামিল। ক্ষণিকের এই দুর্বলতায় নিজের উপর সুদামার ধিক্কার জন্মাল। তিনি ভাবতে লাগলেন, কেন আমার এমন মতিভ্রম হল? যুগ-যুগান্ত ধরে দারিদ্র্য ভোগ করব সে-ও ভালো, তবু যেন কখনো পরের জিনিসের প্রতি লোভ না হয়। এতে যদি প্রাণ যায় যাক, তবু চুরি বা মিথ্যেভাষণে যেন কখনো প্রবৃত্তি না হয়।

ভগবান প্রিয় সখাকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু এই গরীব ব্রাহ্মণ কোনো প্রলোভনেই ভুললেন না। তাই দেখে ভগবান লক্ষ্মীস্বরূপিনী রুক্মীনী দেবীকে বললেন ঃ "তুমি এখনই সুদামার ঘরে যাও, তুমি গেলে তার দারিদ্র্যদশা দূর হবে। লোভের বশে আমাকে না দিয়ে সখা একদিন ক্ষীরের নাড়ু খেয়েছিল, তারই ফলে তার এই অভাব অনটন। আজ লোভকে সে জয় করেছে, সে আজ সম্পূর্ণ নির্লোভ, তাই অভাবের জ্বালা আর তাকে সইতে হবে না।" ভগবানের আদেশে লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূত হলেন দরিদ্রের কুটীরে। মুহূর্তের মধ্যে সেই পর্ণকুটীর অদৃশ্য হয়ে গেল, সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াল বিশাল অট্টালিকা। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিতা ব্রাহ্মণীকে লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন বহুমূল্য পট্টবাস, তাঁর অলংকারবর্জিত দেহ সজ্জিত হল নানাবিধ রত্নালংকারে। দাসদাসী লোকজনের আনাগোনায় সুদামার গৃহ গমগম করতে লাগল।

এদিকে সুদামা ফিরে এসে নিজের সেই পর্ণকুটীর আর খুঁজে পান না। কোথায় গেল তাঁর কুড়ে ঘরখানি, ব্রাহ্মণীই বা কোথায় গেলেন? এখানে এই রাজবাড়িই বা কে বানাল? হায় কৃষ্ণ, হায় সখা, তোমার দর্শন পাওয়া সত্ত্বেও আজ আমার এ কী দুর্দশা হল! আমার ঘর গেল, ব্রাহ্মণী গেলেন, এখন আমি কী নিয়ে থাকব, কোথায় থাকব? সুদামা এইসব আকাশপাতাল ভাবছেন এমন সময় লক্ষ্মী এসে তাঁর হাত ধরে অট্টালিকার ভিতর নিয়ে যেতে যেতে বললেন ঃ "সখা, তোমার দারিদ্র্য এখন দূর হয়েছে, এই অট্টালিকা তোমার, ধান-দৌলত ঐশ্বর্য যা কিছু দেখছ তা সবকিছু এখন তুমি ভোগ করো।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লক্ষ্মীর কথায় সুদামা খুশি হতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ "সখী, আমি তো এই ঐশ্বর্য চাইনি, আমি চাই আমার সখা কৃষ্ণচন্দ্রকে। এই ধন-দৌলত, এই সচ্ছলতা দিয়ে ভগবানের চিন্তা থেকে তুমি আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছ, কিন্তু তা আমি চাইনে। বিলাসের এই অজস্র উপকরণে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। দীন দরিদ্র হয়েই সর্বদা আমি সখার চরণকমল ধ্যান করে কৃতার্থ হতে চাই।"

লক্ষ্মীদেবী সুদামাকে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ "সখা, তোমার চিন্তা কিসের, ভগবান যে তোমার ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়ে আছেন। আমার কৃপার দান গ্রহণ করতে তুমি দ্বিধাবোধ কোরো না। এই ঐশ্বর্য তোমার ভক্তিকে কখনো মলিন করতে পারবে না, নির্ভয়ে তুমি তা ভোগ করো। সখা, তুমি স্থির জেনো অন্তিমে বৈকুণ্ঠলোকে তোমার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেখানে অবিচ্ছেদ্য মিলনে বাঁধা রইবে তুমি আর তোমার সখা।" সুদামাকে আশীর্বাদ করে লক্ষ্মী অন্তর্হিত হলেন। পরম আনন্দে সুদামার দিন কাটতে লাগল।

গল্পটিতে কয়েকটি জিনিস সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

প্রারব্ধ যে খণ্ডন করা যায় না, কর্মফল যে ভোগ না করে উপায় নেই, তা প্রকাশ পেয়েছে সুদামার দারিদ্র্যের মধ্যে।

ভগবানকে কিছু না দিলে তিনিও কাউকে কিছু দিতে পারেন না। এ-ও তাঁর লোকশিক্ষার নিদর্শন। সর্বধর্মে দানের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সেবার মনোভাব নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দান করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এতে কল্যাণ হয় আমাদেরই। তিনি তো উজাড় করে দেবেন বলে বসেই আছেন, অপেক্ষা শুধু আমাদের এক কণা দানের। ভগবান বা সদ্‌গুরুকে সন্তুষ্ট করতে হলে যে বিপুল ঐশ্বর্য তাঁদের পায়ে ঢেলে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সামান্য একটু চিড়ে বা একটুকরো ছেঁড়া কাপড়েই সুদামা বা দ্রৌপদীর ভগবৎকৃপা লাভের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়।

☆ ☆ ☆

যথার্থ নিষ্কাম ভক্তকে কোনো প্রলোভনেই ভোলানো যায় না, সে চায় শুধু তাঁকেই। যদি সে তাঁর কাছ থেকে বৈজয়ন্তী মালার মতো দিব্য ঐশ্বর্যও লাভ করে, তা-ও সে নিজের ভোগে না লাগিয়ে পরের উপকারেই নিয়োজিত ক'রে নিজে যে নিঃস্ব অকিঞ্চন, তাই থেকে যায়। প্রসিদ্ধ এই গল্পটিতে আদর্শ ভক্তের অমলিন ছবিটি বড়ো সুন্দর ফুটে উঠেছে সুদামার চরিত্রে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ কথিত
নিজ জীবনের কাহিনী

পুতুল পুজো

কে জি গুপ্ত আর পাইকপাড়ার রাজার ম্যানেজার একদিন আমার কাছে এসেছিলেন। দুজনেই ব্রাহ্ম, মূর্তিপূজা মানেন না। আমাকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মহারাজ, পুতুল পুজো করা উচিত কি অনুচিত?" আমি তাঁদের বললাম ঃ "খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনারা, তবে এর জবাব আমি নিজে দেব না। মায়ীর (কে জি গুপ্তর স্ত্রী) সঙ্গে আমি একটু কথা বলব, তাতেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।" এই বলে মায়ীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মায়ী, তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তুমি পুতুল খেলা করতে, না করতে না?" মায়ী বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, পুতুল নিয়ে খেলতাম বইকি। ছোট ছোট মেয়েরা সবাই তো পুতুল খেলে।" তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "এখনো কি তুমি পুতুল নিয়ে খেলা করো?" মায়ী বললেন ঃ "না বাবা, এখন আর খেলিনে।"—"কেন খেলো না?" মায়ী বললেন ঃ "এখন সংসারের আসল খেলা নিয়ে যে মেতে আছি, তাই নকল খেলা ছাড়তে হয়েছে।" কে জি গুপ্তকে তখন আমি বললাম ঃ "বাবু, এবার আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তো?" তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, আমি এই বুঝলাম যে যতদিন না আসল খেলায় মাতি, ততদিন নকল খেলা নিয়ে থাকতে হয়। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ, আপনি কেন এইসব দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন? এখনো কি আপনি পুতুল পুজো করেন, না করেন না?" ভাবখানা এই যে তিনি যেন জানতে চান আমার আসল বস্তু লাভ হয়েছে কিনা। আমি তখন হাসতে হাসতে তাঁকে বললাম ঃ "বাবু এর উত্তরও আপনাকে মায়ীই দেবেন।" তাঁকে এই কথা বলে আমি আবার মায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মায়ী, তুমি তো এখন আসল খেলা নিয়ে আছ, পুতুল খেলা ছেড়ে দিয়েছ। আচ্ছা বলো তো, ছোট ছোট মেয়েরা যখন তোমাকে এসে বলে 'মা, কেমন করে পুতুল খেলতে হয় শিখিয়ে দাও', তখন তুমি তাদের সঙ্গে পুতুল খেলো তো?" মায়ী বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, ছোটো মেয়েদের শেখাবার জন্যে তাদের সঙ্গে খেলতে হয় বইকি। নইলে তারা শিখবে কী করে?" তখন আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কে জি গুপ্তকে বললাম ঃ "বাবু, মায়ী আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে দিলেন, শুনলেন তো? দেখুন বাবু, পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্যে মায়ীর মতো আমাকেও এই পুতুল পুজো নিয়ে থাকতে হয়।"

আমার কথা শুনে কে জি গুপ্ত একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরে তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, এই পুতুল পুজো নিয়ে আমি কত জায়গায় তর্ক-বিতর্ক করেছি। আজ আপনি এত সহজে যা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে।"

☆ ☆ ☆

মহারাজ কথিত নিজ জীবনের কাহিনী

দুই মহারাজ—বালানন্দ ও যতীন্দ্রমোহন

একবার কলকাতায় গিয়ে জয় মিত্রের কালীবাড়িতে আমি কিছুদিন ছিলাম। সেই সময় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁকে বললাম ঃ "আপনি হলেন রাজা। লাটসাহেবের বাড়ির ছাদে যেমন ঝাণ্ডা ওড়ে, আপনার বাড়ির ছাদেও তেমনি ঝাণ্ডা ওড়ে। সবাই আপনাকে বলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কতবড়ো লোক আপনি, আপনাকে আমি এই উপদেশ দিচ্ছি আপনি রাজা হবেন না, ম্যানেজার হয়ে যান।" রাজা তখন বললেন ঃ "স্বামীজী, আপনি এক কথায় যা বললেন তাকেই একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন।" আমি তখন তাঁকে বললাম ঃ "আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন তো আপনি কার রাজা। আপনার জন্মের আগে থেকেই এই রাজা-এস্টেট ছিল, আপনার মৃত্যুর পরেও এই এস্টেট থাকবে। শুধু দুদিনের জন্যে আপনি রাজা হয়েছেন বই তো নয়। তাই বলি, এই রাজার অভিমান আপনি ছেড়ে দিন। সর্বদা বিচার করতে থাকুন, তাহলেই এই অভিমান চলে যাবে, আপনিও শান্তি পাবেন। রাজা না হয়ে আপনি ম্যানেজার হয়ে যান। ম্যানেজার কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে জমিদারির দেখাশুনো করে, কিন্তু মনে মনে সে ঠিক জানে এ সম্পত্তি তার নয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জমিদারের। আপনিও তেমনি কাজকর্ম যেমন করছেন করে যান, কিন্তু আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করুন। "আমার আমার করেই মানুষ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। সেইজন্যই বলছি, আপনি নিজেকে রাজা ভাববেন না, আপনি ম্যানেজার হয়ে যান, তাহলেই আর আপনাকে বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হবে না।

"আবার দেখুন, আপনি হয়তো নিজেকে বড়োলোক বলে মনে করেন। কিসের বড়লোক আপনি? সাড়ে তিন হাতের চেয়ে তো বড়ো নন। এক একবারে দশ-বিশ সেরের ভাত যদি খেতে পারেন, একসঙ্গে দশ-বিশখানা কাপড় যদি পড়তে পারেন, দশ-বিশ হাত জমিতে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে শুতে পারেন, তবে তো বুঝি আপনি বড়লোক। তা যখন সম্ভব নয় তখন আপনি বড়োলোক হলেন কেমন করে?

"আপনার সঙ্গে গরীব মানুষের তফাতটা কোথায়? আপনি যা করেন, গরীব মানুষেও তাই করে। গরীব মানুষ শাক আর ছাতু খায়, আপনি না হয় পোলাও কালিয়া খান, কিন্তু উদ্দেশ্য সেই একই, পেট ভরানো। আপনি শাল-দোশালা গায়ে জড়ান, গরীব মানুষ কম্বল গায় জড়ায়। আপনার দোশালা দামে ভারি, ওদের কম্বল ওজনে ভারি। কিন্তু দোশালাই বলুন আর কম্বলই বলুন, দুয়ের একই কাজ, শীত নিবারণ। আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা রয়েছে, গরীবদেরও তাই আছে। তবে আপনি গরীবদের চেয়ে বেশি কী করলেন?

"সূর্যদেব আপনাকে আর গরীবদের একই রকম আলো দেন। আপনাকে বেশি, তাদের কম, তা করেন না। বায়ু আর জল গরীব আর আমিরকে সমান তৃপ্তি দেয়। আপনি রাজা হয়ে কোন্ জিনিসটা বেশি করে ভোগ করতে পারেন আমাকে বলুন দেখি। আপনি হয়তো বলবেন আমি চার ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করি। কিন্তু দেখুন, আপনার কোচম্যান আপনার চেয়ে উঁচু জায়গাতে বসে থাকে। আপনি কিন্তু রয়েছেন ওর হাতের মুঠোর মধ্যে। ও ইচ্ছে করলেই আপনার গাড়িশুদ্ধ আপনাকে খানায় ডোবায় ফেলে দিতে পারে। ও তো আপনার অধীন নয়, আপনিই বরং রাজা হয়ে গরীব কোচম্যানের কাছে পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

"আপনার মোসাহেব যখন আপনার পাশে একই গদিতে বসে থাকে, তখন রাজা ব'লে আপনি কি গদির আরামটা তার চেয়ে বেশি উপভোগ করেন? তা তো হয় না, গদির আরাম আপনার যেমন, তারও তেমনি। আপনার প্রজারা আপনাকে মহারাজা বলে, কিন্তু যারা আপনাকে চেনে না, তারা তো আপনাকে মহারাজা বলবে না, কোনো রাজসম্মানও দেবে না আপনাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"নিজের শরীরের উপরই কি আপনার কোনো অধিকার আছে? সে অধিকার যদি থাকত তাহলে শরীরে জরা আসতে দেন কেন? রোগ হতে দেন কেন? কোন্ জিনিসটার উপর আপনার অধিকার রয়েছে? আপনি কার মহারাজা? রাজাসাহেব, একবার ভালো করে বিচার করে দেখুন, তাহলেই সবকিছু বুঝতে পারবেন আর তখনই 'আমি মহারাজা', 'আমার রাজত্ব', এইসব অভিমান দূর হয়ে যাবে।"

এইসব কথাবার্তার পর রাজা যতীন্দ্রমোহনকে হঠাৎ আমি প্রশ্ন করে বসলাম ঃ "আচ্ছা রাজাসাহেব, আপনার আয় কত?" রাজা বললেন ঃ "আমার যত্র আয় তত্র ব্যয়।" আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম ঃ "না না রাজাসাহেব, তা কী করে হবে? আমি তো শুনেছি এক পয়সার সাবুদানা আপনার দুদিনের খাওয়ার পক্ষেও বেশি হয়ে যায়, অথচ দেড় সের চালের ভাত না হলে গরীবদের পেট ভরে না। তাহলেই দেখুন, আপনার খরচের চেয়ে গরীবদের খরচ কত বেশি।"

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন যাওয়ার সময় কয়েকটা গিনি রেখে আমাকে প্রণাম করলেন। আমি জেনেশুনেই বললাম ঃ "রাজসাহেব, এ কোন্ জিনিস আপনি আমার জন্য নিয়ে এসেছেন?" রাজা বললেন ঃ "স্বামীজী, শুধু হাতে সাধুদর্শন করতে নেই, তাই প্রণামী ব'লে খানকয়েক গিনি সঙ্গে করে এনেছি।" আমি বললাম ঃ "রাজাসাহেব, এ গিনি নিয়ে আমি কী করব? যদি খেতে যাই, আমার দাঁত ভেঙে যাবে! তবু কোনোরকমে যদি পেটে ঢোকাতে পারি, তাহলেও মহা অনর্থ ঘটবে। না রাজা, এ গিনি আপনি নিয়ে যান। পূর্বজন্মে এসব জিনিস আপনি অনেক দান করেছেন, তাই এ জন্মে অনেক ধন-দৌলতের মালিক হয়েছেন। তবে অন্নদান আপনি করেননি, তাই আপনার কপালে অন্ন জুটছে না, সাবুদানা খেয়ে আপনার দিন কাটাতে হচ্ছে। আর আপনার চাকরদের দেখুন, তারা রাশি রাশি ভাত খাচ্ছে। এরা যে আগের জন্মে অন্নদান করে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বজন্মের কর্ম এ জন্মে প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেয়। রাজাসাহেব, এই গিনি আপনি উঠিয়ে নিন, এর বদলে কিছু অন্নদান করুন। কোনো উর্বর ক্ষেত্র দেখে অন্ন রোপণ করে দিন, পরের জন্মে আপনার জন্যে প্রচুর অন্ন মজুত থাকবে। এতে কোনো সংশয় করবেন না।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আমার কথাবার্তায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি বললেন ঃ "স্বামীজী, আপনাকে দয়া করে একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধূলো দিতে হবে।" শুনে আমি হেসে বললাম ঃ "আরে ভাই,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তোমার দেহই তো তোমার বাসভবন, ঐ দেহতেই তো তুমি বাস করো, ওখানে অন্য কেউ ঢুকবে কেমন করে? আর ইট কাঠের তৈরি যে বাড়ির কথা বলছ, সে তোমার বাড়ি হতে যাবে কেন, সে তো ধর্মশালা। কত লোকজন সেখানে বাস করছে, সে তো তোমার বাড়ি নয়।"

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে সেদিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে সৎসঙ্গ হল। একদিন গাড়ি পাঠিয়ে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেই বছরই তিনি কাশীধামে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করে দেন।

☆ ☆ ☆

মহারাজ কথিত নিজ জীবনের কাহিনী

দুষ্টু ছেলে

আমার মন্ত্রশিষ্য হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে একবার নিয়ে গেল তার বাড়িতে বৈদ্যবাটিতে। ঠিক গঙ্গার ধারেই তার বাড়ি। সেদিন ছাদের উপর ঠাকুরঘড়ে আমি বসে আছি, দৃষ্টি আমার গঙ্গার দিকে। এমন সময় দেখলাম এক পল্লীরমণী গঙ্গাজল নেবার জন্যে ঘাটে এসেছে। তার কাঁখে এক মস্ত ঘড়া আর তার হাত ধরে সঙ্গে এসেছে চার-পাঁচ বছরের তার একটি শিশুপুত্র। জল ভরা হলে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরবে বলে মা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু ছেলেটা মায়ের হাত ধরবে না, সে কান্না শুরু করে দিল মায়ের কোলে চড়ে যাবে, কিছুতেই সে হেঁটে যাবে না। মা তাকে বোঝাতে লাগল, আমাকে ঘরা ভরতি জল নিয়ে যেতে হচ্ছে, তোমাকে এখন কোলে নেব কী করে? কিন্তু তাতেও ছেলের কান্না থামে না, সে বার বার জেদ করতে লাগল মায়ের কোলে সে উঠবেই। মা আর কী করে, এক পাশে ঘড়া নিয়ে আর এক পাশে ছেলেকে কোলে নিতে গেল। কিন্তু এমনই পাজী ছেলে যে তবুও সে মায়ের কোলে উঠবে না, বায়না ধরল ঘড়া ফেলে দিয়ে শুধু তাকেই কোলে নিতে হবে। মা অনেক করে বোঝাল, কিন্তু ভবী ভুলবার নয়, কিছুতেই সে কথা শুনবে না। মাকে সে অস্থির করে তুলল,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শেষে যখন দেখল মা তার কথায় কান না দিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন সে কাদার মধ্যে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। মা তখন রেগে গিয়ে ছেলেকে আরও বেশি কাদার মধ্যে ঠেলে দিল, তারপর বেশ কয়েক ঘা চড়-চাপড় মেরে ঘড়া নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল। ছেলেটা তখন সেই কাদার মধ্যে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে কাঁদছে, কিন্তু মা তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তখন সে বেচারা আর কী করে, সেই কাদা মাখা গায়েই কাঁদতে কাঁদতে সে মায়ের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। মা তখন তার সমস্ত ময়লা ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নিল।

এই যে দৃশ্য দেখলাম, এতে সৎসঙ্গের কী সুন্দর এক দৃষ্টান্ত মিলে গেল দেখো। পরমাত্মা আমাদের মা, আমরা তাঁর দুষ্টু ছেলে। মা এক হাতে তাঁর বিশ্বকাজে ব্যাপৃত থেকে আর এক হাতে আমাদের কোলে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই রয়েছেন, তবু আমরা বিষয়রূপ কাদা গায়ে মেখে তার মধ্যেই শুয়ে আছি। মা আর কী করেন, তিনি আরও বেশি করে সেই কাদার মধ্যেই আমাদের ডুবিয়ে দেন আর সেইসঙ্গে রোগ, শোক, দুঃখ, এইসব চড়-চাপড় মারতে থাকেন। দুষ্টু ছেলে জব্দ হয়ে তখন আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের শরণ নেয়। মা-ও তখন বিষয়রূপ সেই কাদা জ্ঞান-ভক্তিরূপ গঙ্গাজলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ছেলেকে কোলে তুলে নেন।

কিন্তু মায়ের জন্যে কাঁদতে হয়। না কাঁদলে শিশুপুত্রটিকেও মা স্তন্যপান করান না। যতক্ষণ সে খেলা নিয়ে মেতে থাকে ততক্ষণ মা ঘর-সংসারের কাজ করে যান, কিন্তু যেই ছেলে মায়ের জন্যে কান্না শুরু করে, অমনি তিনি ছুটে এসে ময়লা-মাটি ধুইয়ে তাকে কোলে তুলে নেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহারাজ কথিত নিজ জীবনের কাহিনী

মধুকর হয়ে যাও

আমি যখন হিমালয়ে ভ্রমণ করছিলাম, সেই সময় একদিন এক আশ্চর্য ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। আমার শিষ্য পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তখন আমার সঙ্গে ছিল আর ছিল দুজন মুটে, তারা আমাদের মালপত্র বহন করে আমাদের সঙ্গে চলছিল। আমরা ধীরে ধীরে চড়াইয়ের উপর উঠছি এমন সময় লক্ষ্য করলাম পূর্ণানন্দ আমাদের সঙ্গে নেই। আমি তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খানিকক্ষণ বাদে পূর্ণানন্দ এসে পৌঁছল, কিন্তু দেখি তার চোখ দুটো নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো লাল আর সে যেন স্থিরভাবে মাটিতে পা রাখতে পারছে না, কেবলই টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে মুটেদের জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "হ্যাঁরে, এর এরকম অবস্থা হল কেন বলতে পারিস?" মুটেরা পাহাড়ী লোক, পাহাড়ের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে তারা। তারা বলল ঃ "মহারাজ, এই সাধুজীর গায়ে পাহাড়ের বিষ লেগেছে। ঐ যে দূরে লাল লাল ফুল দেখছেন, ও ফুল হল কালকূটের, ওর গন্ধ শুঁকলেও মানুষ মরে যায়। তাড়াতাড়ি এই ব্রহ্মচারীকে কিছু টক খাওয়ানো দরকার।" আমার ঝোলাতে তেঁতুল ছিল, জলে গুলে তা খাইয়ে দিতে পূর্ণানন্দ সুস্থ হল।

এবার সেই কালকূটের ফুলের দিকে আমি চেয়ে দেখলাম। দেখি কি, ঐ বিষের যে ফুল, তার উপর মৌমাছিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে আমি তো অবাক। আমি ভাবতে লাগলাম, ভগবানের এ কী বিচিত্র লীলা ! এই ক্ষুদ্র মৌমাছির দল বিষ থেকেও অমৃত আহরণ করছে! দোষের ভাগ ত্যাগ করে গুণটুকুই কেবল গ্রহণ করছে! তখন আমার মনে হতে লাগল সামান্য এই মৌমাছি, তাদের কত গুণ। প্রথমত সবকিছু থেকে বেছে বেছে তারা শুধু মধুই সংগ্রহ করে। নিমের মতো তেতো ফুলই বলো, আর এই কালকূট বিষের ফুলই বলো, তা থেকেও তারা কেবল মধুটুকুই টেনে নেয়।

তারপর দেখো তাদের অধ্যবসায়। তিল তিল করে মৌচাকের মধ্যে তারা মধু সংগ্রহ করে রাখছে। সারা পৃথিবীতে যত মধু খরচ হয় সব এই ক্ষুদ্র কীটগুলিই যোগান দিয়ে চলেছে। আর এরা কত নিঃস্বার্থ। কতদিন ধরে, কত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিশ্রম করে এরা মধু জমিয়ে তোলে, নিজেরা খাবে বলে নয়, আপন ভোগের জন্য নয়। শেষে পরের জন্যে নিঃশেষে তা উজাড় করে দেয়। তাদের নিজেদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ নেই। একবার মৌচাকের দিকে তাকিয়ে দেখো, লক্ষ লক্ষ মৌমাছি চাকের মধ্যে কেমন মিলেমিশে রয়েছে, কারুর সঙ্গে কারুর ঝগড়াঝাঁটি নেই, একমনে যে যার কাজ করে চলেছে।

তাইতো তোমাদের বলি তোমরা মধুকর হয়ে যাও। মৌমাছির মতো সবকিছু থেকে দোষের অংশ ত্যাগ করে তোমরা গুণটুকুই শুধু গ্রহণ করতে শিখবে, তখন তোমাদের চিত্ত মধুচক্রে পরিণত হবে, তাতে পরম কল্যাণ হবে তোমাদের। তাই চিত্তশুদ্ধির এক সুগম পথ হল পরের দোষ অনুসন্ধান না করা, শুধু পরের গুণগুলি গ্রহণ করা। ভালো আর মন্দতে মেশানো এই সংসার। এমন কোনো জিনিসই সংসারে নেই যার সবটা দোষে ভরা বা আগাগোড়া গুণে গড়া। দোষ-গুণ সবকিছুতেই আছে। এখন এই মধুকরের দৃষ্টান্ত দেখো। ঐ ক্ষুদ্র কীট বিষ থেকেও কেমন অমৃত গ্রহণ করছে, কারণ তাই তার স্বভাব। আবার বিষাক্ত মক্ষিকার স্বভাব ঠিক উলটো। নোংরা ঘা, বিষাক্ত জায়গা সে পছন্দ করে আর তার খোঁজেই সে ঘুরে বেড়ায়। অমৃত ত্যাগ করে সে কেবল বিষকেই গ্রহণ করে। তাই বার বার তোমাদের বলছি তোমরা মধুকর হয়ে যাও, সকলের মধ্যে গুণ দেখতে চেষ্টা করো। চিত্তশুদ্ধির পক্ষে এর চেয়ে সহজ আর কোনো পথ নেই।

মহারাজ কথিত নিজ জীবনের কাহিনী

দেবতার অভিশাপ

ছেলেবেলা থেকেই আমি ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। সেই অল্প বয়সে একবার আমি হৃষিকেশ এসেছিলাম। সেই সময় আমার ভিক্ষে করবার নিয়ম ছিল, মুখে কারুর কাছে কিছু চাইতাম না, 'হর নর্মদে' বলে ডাক দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কেউ যদি কিছু দিত তা নিয়ে চলে যেতাম। একদিন রামঘাটে স্নান করে ঘাটের উপরে এক বেনের দোকানের সামনে আমি 'হর নর্মদে, হর নর্মদে বলে হাঁক দিয়েছি। ডাক শুনে বেনে তার দোকানের বাইরে এসে আমাকে দেখতে পেল, কিন্তু কিছুই দিল না। দিল না বললে ভুল হবে, আমাকে প্রাণভরে গালাগালি দিয়ে সে ভিতরে চলে গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দু-তিন-দিন আমার অন্ন জোটেনি, খিদেটা তখন বেশ জানান দিচ্ছে, বেনের এই গালাগালি তাই বড়ো বেশিরকম আমাকে আঘাত করল। কিন্তু সাধুর পক্ষে রাগ করা শোভা পায় না। তাই নিজেকে এই বলে বোঝালাম যে আমার প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আমি যখন কিছু নিইনে, তখন বেনের এই গালাগালিই বা আমি গ্রহণ করব কেন? ওতে তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই। দিক না সে গালাগালি, আমি না নিলেই হল, এই ভেবে আমি তা সহ্য করে গেলাম।

শীতকাল, রাত হয়েছে, ঠান্ডায় আমার সর্বশরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। বেনের দোকানের সামনে রাস্তার ধারে আসন পেতে বসে আছি, কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিনে। তখন আশপাশ থেকে কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালিয়ে বসলাম, তাতে শরীর একটু গরম বোধ হল। বেনে তখন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ভিতরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আমি আগুন জ্বালতেই সে কেমন করে টের পেয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে এমন অকথ্য গালাগালি শুরু করল যে আমাকে কানে আঙুল দিতে হল। প্রথমটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি কেন সে হঠাৎ আবার গালাগালি দিচ্ছে। পরে মনে হল হয়তো তার মনে ভয় ঢুকেছে যে আমার জ্বালা আগুনে তার ঘর পুড়ে যেতে পারে। যাই হোক, আমি তার এই গালিগালাজ হজম করে চুপচাপ বসে রইলাম, তার কথার পিঠে একটা কথাও বললাম না। বেনে তখন এক ডান্ডা নিয়ে তেড়ে এল আমাকে মারবে বলে। আমারও মাথায় তখন রাগ চড়ে গেল। ভাবলাম, ও যদি আমাকে এক ঘা মারে, আমি তাহলে উলটে ওকে দশ ঘা বসিয়ে দেব। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আরে ছি ছি, এ আমি কী করছি, আমি না সাধু। সাধু হয়ে ক্রোধের বশীভূত হব? যেমনি মনে হওয়া অমনি একটি কথাও না বলে আসন তুলে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। খানিকটা যেতেই রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো দেখা দিল।

দু-তিনদিন আহার জোটেনি, শরীর খুব দুর্বল, পথ চলবার আর শক্তি নেই, এমনি অবস্থায় এক বৈষ্ণব সাধুর ডেরায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমায় দেখে সাধুটি খুব খুশি হয়ে বললেন : "আপনার শরীরের যেরকম অবস্থা দেখছি তাতে আপনি দিনকয়েক এখানে থেকে যান। আপাতত আমি আপনার জন্যে রান্না করি, খেয়েদেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিন।" আমি তাঁকে বললাম : "আমার নিয়ম, তিন রাত্রি আমি কোথাও বাস করিনে, অপরের রান্না করা জিনিসও খাইনে।" বৈষ্ণব সাধু বললেন : "রান্না করা জিনিস নাইবা খেলেন, দুধ খেতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তো দোষ নেই।" সেইরকম ব্যবস্থাই হল। আমি স্নান করে পূজোপাঠ শেষ করলে পর বৈষ্ণব গরু দুইয়ে আমাকে দুধ এনে দিলেন, আমিও পরম তৃপ্তির সঙ্গে দুধটুকু খেয়ে নিলাম।

আমি ঠিক করেছিলাম দুপুরের রোদের তেজ কমে গেলে আমি এখান থেকে রওনা হব। আমি বৈষ্ণবের আশ্রমে বসে আছি এমন সময় এক আশ্চর্য কান্ড ঘটল। রাতের সেই বেনে হঠাৎ সেখানে এসে আমার দু পা জড়িয়ে ধরে বলল ঃ "ব্রহ্মচারীজী, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কাল আপনার সঙ্গে আমি কত দুর্ব্যবহার করেছি, যা-নয়-তাই কত কুকথা বলেছি আপনাকে, তাই আপনার কোপে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার শিশুপুত্রটি তার মায়ের পাশে ঘুমোচ্ছিল, ভোরবেলা দেখা গেল দেহে প্রাণ নেই। দয়া করে একবার আমার দোকানে চলুন, সেখানে আপনাকে আজ ভোজন করতেই হবে। আপনার রান্নার জন্যে যা-কিছু দরকার, চাল, ডাল, আটা, চিনি, ঘি, লকড়ি, সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনাকে অপমান করায় আমার একটা সর্বনাশ হয়েছে, আমার সেবায় আপনি সন্তুষ্ট না হলে না-জানি আরও কত সর্বনাশ ঘটবে।"

বেনের কথা শুনে আমি পরমেশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলাম। হে দেব, এ তোমার কী বিচিত্র লীলা! যে বেনে আমাকে মারবে বলে ডান্ডা নিয়ে তেড়ে এসেছিল, আজ সে তোমার হাতের মার খেয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল! ওর অন্যায় ব্যবহার আমি সহ্য করেছিলাম, কিন্তু তুমি তো তা সহ্য করলে না প্রভু। বেনের উপর তোমার আঘাত নেমে এল পুত্রশোকের রূপ ধরে।

বেনেকে মাটি থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললাম ঃ "ভাই, তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই। তুমি মনে কোনো গ্লানি রেখো না। কিন্তু আমার তো তোমার ওখানে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা ভিক্ষের জন্যে এক জায়গায় দুবার যাওয়ার আমার নিয়ম নয়।" বেনে কিছুতেই মানতে চায় না, ব্যাকুল হয়ে কাঁদে আর বলে ঃ "ব্রহ্মচারীজী, একান্তই যদি না যান তো এখানেই আপনি রান্না করে আপনি ভোজন সমাধা করুন।" আমি আর কী করি, তার কথাই মেনে নিতে হল। বেনে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এলে পর আমি রান্না করে নিজে খেলাম, বৈষ্ণব সাধু খেলেন আর বেনেও প্রসাদ পেল। একটা দিন বৈষ্ণবের কাছে কাটিয়ে পরদিন আমি গন্তব্যস্থলের দিকে পা বাড়ালাম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বালানন্দজীর ইষ্ট দর্শন

তপোবন পাহাড়ের গুহায় আসন পেতে বসেছি। তখন গভীর রাত। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম আজ আমি ইষ্টদর্শন করবই, তা যদি না হয় তো এই আসনেই দেহত্যাগ করব। আসনে বসে গভীর ধ্যানে ডুবে গেলাম, বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হল। ধ্যানস্থ অবস্থায় সমস্ত রাত কেটে যাবার পর ভোরের হাওয়ার স্পর্শে যখন আমার ধ্যানভঙ্গ হল, তখন হঠাৎ মনে হল আগুন লেগে গুহাটা যেন গরম হয়ে উঠেছে আর সেই আগুনের তাপে আমার দেহ যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমি চোখ খুলে দেখলাম আমার ব্রহ্মতালু লক্ষ্য করে ভয়ংকর এক অজগর সাপ আমার সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শুধু তার লেজটুকু আছে মাটি স্পর্শ করে। একদম খাড়া হয়ে ফণা বিস্তার করে সাপটা গর্জন করতে লাগল। মনে হল সে যেন এখনই আমাকে ছোবল মেরে বসবে। তার বিষাক্ত নিশ্বাসে সমস্ত গুহাটা আগুনের মতো তেতে উঠেছে। সাপটাকে দেখে আমার একটুও ভয় হল না, আমি একদৃষ্টে তার চোখের পানে তাকিয়ে প্রাণায়াম করতে লাগলাম।

প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর থেকে বাঁশির মতো একটা শব্দ বের হয়। সেই শব্দে মোহিত হয়ে সর্পরাজ ফণা সমেত তার সমস্ত দেহটা এদিকে ওদিকে দোলাতে লাগল। এই অবস্থাতেও তারও চোখ কিন্তু আমার দৃষ্টির প্রতি নিবদ্ধ। এইভাবে কিছুক্ষণ দুজনেই আমরা দুজনকে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আসনে বসবার আগে আমি সংকল্প করেছিলাম যে ইষ্টদেবের দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত এই আসন আমি ত্যাগ করব না, না পাই তো এই আসনে প্রাণত্যাগ করব। এখন মনে হল ইষ্টদেবই হয়তো ছল করে এই সাপের রূপ ধরে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন। অমনি আমি হাত জোড় করে 'শিবোহম্ শিবোহম্' বলে সাপকে প্রণাম করে শিবমহিমা স্তোত্র জোরে জোরে আবৃত্তি করতে লাগলাম। ভগবানের অপার মহিমার কথা কী আর বলব, যে সাপ আমাকে দংশন করবে বলে ফণা বিস্তার করে গর্জন করছিল, হঠাৎ সে ফণা গুটিয়ে চোখের নিমেষে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি আসন থেকে উঠে এধার-ওধার তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোথাও তার সন্ধান মিলল না। এতবড়ো এক অজগর সাপ যেন ভোজবাজির মতো নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। অথচ গুহার মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র নেই যে সেখান দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে পারে। এবার আর আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে এ কোনো সাধারণ সাপ নয়, আমার ইষ্টদেবই সর্পরূপে দেখা দিয়ে আমাকে ধন্য করে গেলেন। এই কথা মনে হতেই চোখের জল আর বাধা মানল না। বারে বারে মনে হতে লাগল, হে ইষ্টদেব, কেন তুমি সাপের মূর্তিতে আমাকে দেখা দিলে, কেন তোমার সত্য-শিব-সুন্দররূপে আমার কাছে এলে না? নিজের রূপে দেখা দিয়ে যদি আমাকে কৃপা করতে তাহলে যে আমি তোমার পা দুখানি জড়িয়ে ধরতে পারতাম। মন অমার এমন উদাস হয়ে গেল যে বেঁচে থাকতে আর ইচ্ছে হল না। কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে বিচার শুরু হল। মনে হল, এমন হতাশা তোমাকে পেয়ে বসল কেন? চরণস্পর্শ নাইবা হল, ইষ্টদেবের দর্শন তো তুমি পেয়েছ। আর চরণ স্পর্শ করে কি লাভ হত তোমার? তুমি তো নিষ্কাম সাধক, ইষ্টের কাছে কোনোকিছু চাইবার অধিকার তো তোমার নেই। ইষ্টদেবের কাছে কী চাইতে তুমি? তুমি সংকল্প করেছিলে ইষ্টকে দর্শন করবে। সে সংকল্প তোমার সিদ্ধ হয়েছে, এখন আনন্দ করো, আনন্দ করো। কেন মিছে কান্নাকাটি করছ?

এইভাবে বিচার করতে করতে আমার মনের সব ভার দূর হয়ে গেল। ইষ্টকে দেখব বলে সংকল্প করেছিলাম, তা আমার সিদ্ধ হয়েছে, এখন কেবল আনন্দ আর আনন্দ। কলিকালে ভগবান এমনি করেই ভক্তকে দেখা দেন। তিনি আসেন ছদ্মবেশে, কিন্তু প্রকৃত সাধক ঠিক তাকে চিনে নেয়। সাধকের কাছে ভগবান নিজেকে লুকোতে পারেন না। আমার এই দর্শনের সময় আমি আমার সর্পরূপী ইষ্টদেবের মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলাম। সাধারণ সাপের মধ্যে কেউ কি কখনো গোঁফ দেখেছ? কিন্তু এই সর্পরাজের মুখে আমি একজোড়া গোঁফ লক্ষ করেছি। আর তার চোখের দৃষ্টির মধ্যেও এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যা ভুল হবার নয়। এইসব চিহ্ন দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই সর্পরাজই হলেন আমার ইষ্টদেব সর্পভূষণ দেবাদিদেব শ্রীশংকরজী। প্রথমটা আমি তত খেয়াল করিনি, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি তার মধ্যে এমন অনেক চিহ্ন ছিল যাতে তাকে সাধারণ সাপ বলে ভুল করা চলে না। ইষ্টদেবের অন্তর্ধানের পর একে একে সেই চিহ্নগুলির কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi